আপরোর ইন ইন্ডিয়া

জুল ভার্ন অমনিবাস

সূচিপত্র

দু-হাজার মোহর পুরস্কার.....4
কর্নেল মানরো.....15
ইলোরার গুহায় আঁধারে.....27
লৌহদানব বেহেমথ.....36
ফল্গুনদীর তীর্থযাত্রী.....46
বারাণসীতে কয়েক ঘন্টা.....55
এলাহাবাদ.....61
কানপুর পেরিয়ে.....67
অগ্নিকুণ্ডলী.....77
ক্যাপ্টেন হুডের পরাক্রম.....89
এক বনাম প্রকাণ্ড তিন.....102
বহ্নিশিখা.....112
মাতিয়াস ফান খোইত.....122

ক্রাল.....141

তরাইয়ের রানী.....145

মাতিয়াস ফান খোইতের বিদায়.....164

বেতোয়ার পথে.....187

হুড বনাম ব্যাঙ্কস.....194

এক বনাম একশো.....205

লেক পুটুরিয়া.....221

মুখোমুখি.....229

কামানের মুখে.....235

বেহেমথ.....244

ক্যাপ্টেন হুডের পঞ্চাশ নম্বর বাঘ.....252

আপরোর ইন ইণ্ডিয়া

কানপুরের দানব

দু-হাজার মোহর পুরস্কার

জানা গিয়াছে যে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা নবাব ধুন্ধুপ বর্তমানে বম্বাই রাজ্যের কোনো স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। যে বা যাহারা তাঁহাকে জীবিত বা মৃত ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে বা তাহাদের দুই হাজার মোহর পুরস্কার দেওয়া হইবে... ১৮৬৭ সালের মার্চ মাসের ছয় তারিখে ঔরঙ্গাবাদের বাসিন্দারা এই বিজ্ঞপ্তিটি পড়লে। গোদাবরী নদীর তীরে নিরিবিলি একটা জীর্ণ বাংলো বাড়ির দেয়ালেও এই বিজ্ঞপ্তিটা টাঙানো ছিলো : হঠাৎ দেখা গেলো কোত্থেকে এক ফকির এসে বিজ্ঞপ্তিটির সামনে দাঁড়ালে; বড়ো-বড়ো হরফে ধুন্ধুপন্থের আগুনজ্বালা নাম ছাপা ছিলো, বম্বাইয়ের রাজ্যপালের নাম ছিলো ঘোষণাপত্রের তলায় : সেটাও ছিন্ন হলো মুহূর্তে।

কী চায় এই ফকির? সে কি ভেবেছে ওই রক্তরাঙা নামটা ছিঁড়ে ফেললেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি ওই অগ্নিগর্ভ মানুষটাকে ভুলে যাবে? একটা ছেড়া কাগজের মতো সময়ের ঘূর্ণিহাওয়া তাকে এতদূরে উড়িয়ে নিয়ে যাবে যে কোনোকালে কেউ আর তার সন্ধান পাবে না? না কি বিজ্ঞপ্তিটা নষ্ট করে ফেললেই ১৮৫৭ সালের এই অভ্যুত্থানের কথা মানুষ ভুলে যাবে?

এ-সব ভাবতে যাওয়াটাও পাগলামি ছাড়া আর-কিছু নয়। ক-টা সে ছিড়বে? দেয়ালে-দেয়ালে, গাছের গায়ে, স্তম্ভে-মিনারে—সর্বত্র রাশি-রাশি ঘোষণাপত্র ছড়িয়েছেন বম্বাইয়ের রাজ্যপাল। প্রাসাদ, মন্দির, সরাই—কিছুই বাদ যায়নি। তা ছাড়া উঁাড়া পিটিয়ে সারাক্ষণ

চেঁচিয়েছে নকিব নগর-গ্রামের পথে-পথে, যাতে দীনতম দরিদ্রটিও পুরস্কারের এই অঙ্ক জেনে লোভে পড়ে ধুন্ধুপকে ধরিয়ে দেয়।

সত্যি যদি ধন্ধুপন্থ বম্বাইয়ের আশপাশে কোথাও আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তাহলে এই বিপুল উদ্যোগে হয়তো তাকে ধরা পড়ে যেতেই হবে। তাহলে হাজার-হাজার ঘোষণাপত্রের মধ্যে মাত্র একটাকে ছিঁড়ে ফেলে ফকিরটি কোন পরমার্থ সাধন করলে? শুধু রোষ আর ঘৃণার তৃপ্তিসাধন, তা ছাড়া আর কী? বিরক্তিভরে ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকিয়ে সে এবার ঢুকে পড়লো শহরে, তারপর ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

গঙ্গার তলদেশে সমগ্র ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগের নাম দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ : বম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কতগুলি প্রদেশ নিয়ে দাক্ষিণাত্য গঠিত। আর সেই প্রদেশগুলির মধ্যে প্রধান-একটি হলো ঔরঙ্গাবাদ, একদা যা সমগ্র দক্ষিণাপথেরই রাজধানী ছিলো। সপ্তদশ শতকে মুঘল সম্রাট ঔরঙজীব যখন এখানে তার দরবার বসিয়েছিলেন তখন এখানে লোকসংখ্যা ছিলো এক লক্ষ! এখন হায়দরাবাদের নিজামের হয়ে ইংরেজরা এই প্রদেশ শাসন করে : লোকসংখ্যা এখন মাত্র হাজার পঞ্চাশ। এখানকার জল-হাওয়া আর স্বাস্থ্য ভালো, তা ছাড়া অতীত গরিমার প্রচুর জমকালো স্মৃতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে। গোদাবরীর তীরে রয়েছে ঔরঙজীবের মস্ত প্রাসাদ, শাহজাহানের বেগম মমতাজের স্মৃতিসৌধ, আর বিখ্যাত চার মিনার-মুঘল স্থাপত্যকর্মের উজ্জ্বল নিদর্শন।

ঔরঙ্গাবাদের মিশ্র জনসাধারণের মধ্যে এই ফকির সহজেই আত্মগোপন করতে পারলে। ভারতে পীর-ফকির বা সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা অসংখ্য, সয়ীদ কি মুসাফির কি মুশকিল-আসান কত যে ঘুরে বেড়ায় তার সীমাসংখ্যা নেই; ভিক্ষে তারা চায় না, তারা দাবি করে;

হিন্দু মুসলমান সকলেই সমভাবে তাদের শ্রদ্ধা করে। আমাদের এই ফকিরটি পাঁচ ফিট ন-ইঞ্চি লম্বা, বয়েস চল্লিশের বেশি নয়, সুন্দর কোনো মরাঠা হবে হয়তো–মুখ দেখে অন্তত তা-ই মনে হয় : সারা মুখে বসন্তের দাগ; স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গে। ক্ষিপ্র ও নমনীয়; ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে তার বাঁ হাতে একটা আঙুল নেই। চুল লাল, মাথায় পাগড়ি, গায়ে নামেমাত্র ডোরাকাটা পশমের জামা, কোমরে বস্ত্রখণ্ড বাঁধা, পায়ে জুতো নেই। বুকে দুটি উল্কি-কাটা, হিন্দু পুরাণের রসের দেবতার স্মারক উল্কি দুটি : নৃসিংহাবতার, আর ভয়ংকর শংকরের ত্রিনয়ন জ্বলজ্বল করছে। বুকে।

সেদিন সন্ধেবেলায় মস্ত সাড়া পড়েছে ঔরঙ্গাবাদে, বিশেষ করে তার বস্তি এলাকায়। আবালবৃদ্ধবনিতা–ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়, গোরা সেপাই, ভিখিরি, চাষী

সবাই হাত-পা নেড়ে পাঁচ মুখে কথা কইছে : কার ভাগ্যে শিকে ছিড়বে, কে পাবে এই বিশাল ইনাম, এই বিপুল পুরস্কার—এটা এখন তাদের চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার হেতু।

এদের মধ্যে এই ফকিরই বোধহয় কেবল ওই বিপুল পুরস্কারের প্রত্যাশা ও লোভ করছিলো না। নিঃশব্দে হাঁটছে সে ঔরঙ্গাবাদের সরু ঘিঞ্জি রাস্তায়, মাঝে-মাঝে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে লোকজনের কথাবার্তা, চোখের তারা দুটি কখনও জ্বলে উঠছে ধ্বক ধ্বক করে।

দু-হাজার মোহর ইনাম মিলবে ধুন্ধুপন্থকে দেখতে পেলে, বললে ভিড়ের মধ্যে উত্তেজিত একজনে।

দেখতে পেলে বোলো না, আরেকজন বললে, বলো যে ধরতে পারলে। দেখা আর ধরা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিশ।

তা ঠিক, রক্তপাত না-করে ধরা দেবার পাত্তর সে নয়।

কিন্তু এই-যে শুনলাম নেপালের জঙ্গলে সে মারা গেছে।

মিথ্যে জনরব মাত্র। ওর মতো ধূর্তলোক আর হয় না, মৃত্যুর খবর রটনা করে দিলে নিরাপদ হবে ভেবেই ওই গুজবটি ছড়িয়েছে।

বাঃ, শুনলুম যে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত হয়েছে—

ওটাও একটা ধাপ্পা, লোকের চোখে ধূলো দেবার ফন্দি।

এ-কথা শুনেও ফকিরের মুখের একটি পেশীও কুঞ্চিত হলো না। কিন্তু লোকটা যখন আরো বিশদ করে সব বললে, তখন শুনতে-শুনতে তার ভুরু কুঁচকে গেলো, আর চোখ দুটো ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলতে লাগলো।

১৮৫৯ সালে যে ধুন্ধুপন্থ তার ভাই বালাজি রাও আর গোণ্ডার রাজা দেবী বক্স সিংকে নিয়ে নেপালে একটা দুর্গম জায়গায় ছাউনি ফেলেছিলো, এ-খবর ঠিক। সেখানে সে যখন দেখলে যে চারপাশ থেকে ইংরেজ সেপাইরা তাদের ঘিরে ধরেছে, তখন তারা ভারত-চিন সীমান্তের দিকে চলে যেতে চেষ্টা করে। যাবার আগে রটিয়ে দিয়ে যায় যে তারা সবাই মারা গিয়েছে! রটনাটা লোকে যাতে সত্যি বলে মেনে নেয়, সেইজন্যে এমনকী

একটা মিথ্যে অন্ত্যেষ্টির অবতারণাও তারা করেছিলো। আসলে কিন্তু বাঁ-হাতের একটা আঙুল কেটে কবর দেয়—

এত-সব তুমি জানলে কী করে?

আমি যে সেখানে ছিলাম। ধুন্ধুপন্থের অনুচরেরা আমাকে বন্দী করেছিলো। দুমাস পর আমি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসি।

লোকটা যখন এতসব বলছিলো ফকির তখন একবারও তার উপর থেকে চোখ ফেরায়নি। বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠছিলো তার চোখ। বাঁ-হাতটা সে চট করে তার পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে ফেললে। নাকের বাঁশি দুটো ফুলে উঠলো একটু, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা গেলো ঝকঝকে দাঁতের সারি।

তাহলে ধুন্ধুপন্থকে তুমি চোখে দেখেছো? সে তোমার চেনা লোক? শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন জিগেস করলে।

হ্যাঁ, দেখেছি–ধুন্ধুপন্থের প্রাক্তন বন্দী জবাব দিলে।

মুখোমুখি দেখতে পেলে তাকে তাহলে চিনতে পারবে তুমি?

নিশ্চয়ই পারবো–

তাহলে, প্রশ্নকর্তার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ঈর্ষা ফুটে উঠলো, দু-হাজার মোহর ইনামের সম্ভাবনা দেখছি তোমারই সবচেয়ে বেশি।

হয়তো তা-ই, লোকটি বললে, অবশ্য যদি ধুন্ধুপ শেষকালে এই বম্বাইতেই এসে হাজির হয়ে থাকে—তবে সে এখানে এসেছে বলে আমার মনে হয় না।

এখানে সে খামকা আসবে কেন? আর এত দুঃসাহসই তার হবে কেন?

হয়তো আবার আরেকটি বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে চায়—হয়তো সেপাইদের মধ্যেই আবার আগের মতোই বিক্ষোভ ছড়াবে সে; কিংবা হয়তো মধ্যভারতের জনসাধারণকে খেপিয়ে তুলবে আবার।

তা সরকারি ফতোয়া যখন বেরিয়েছে যে সে এখানে এসেই হাজির হয়েছে, তখন তা-ই বোধকরি সত্যি।

তা-ই যেন হয়; ধুন্ধুপন্থ আমার মুখোমুখি এসে পড়ুক, ভগবান ব্রহ্মা যেন তা-ই করেন, প্রাক্তন বন্দীটি দাঁতে দাঁত চেপে বললে।

ফকির কয়েক পা পেছিয়ে গেলো, কিন্তু তাই বলে ধুন্ধুপন্থের প্রাক্তন বন্দীকে সে কখনও চোখের আড়াল করলে না। তখন কালো রাত নেমে এসেছে ঔরঙ্গাবাদে, তাই বলে পথের ভিড় কিন্তু একটুও কমেনি। ধুন্ধুপন্থ সম্বন্ধে অজস্র জনরব শোনা যেতে লাগলো। পরস্পরবিরোধী কয়েকটা খবর কেমন করে যেন উড়াল দিয়ে আসতে থাকে। ধুন্ধুপন্থকে নাকি শহরের মধ্যেই কোথায় দেখা গেছে। তিনি নাকি এখনও এদিকে এসে পোঁছোননি। আর্যাবর্ত থেকে নাকি বার্তা এসেছে যে তিনি মধ্যপথেই গ্রেফতার হয়ে গেছেন। রাত নটায় জানা গেলো তিনি শহরেরই জেলখানাতে কতগুলো ঠগির সঙ্গে কয়েদ হয়ে

আছেন, পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের আগেই নাকি তাকে তান্তিয়া টোপির মতো বিনাবিচারে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। দশটার সময় খবর এলো তিনি নাকি আবার পালিয়েছেন জেলখানা থেকে। লোকের মনে আবার ইনামের আশা জেগে উঠলো।

আসলে কিন্তু সবই গুজব : সত্যের লেশমাত্র নেই। ধুন্ধুপন্থের সন্ধান এখনও কেউ পায়নি। এখনও ওই ইনাম পেতে হলে বুকের রক্ত জল করে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

যে-লোকটা বলেছিলো ধুন্ধুপন্থকে সে স্বচক্ষে দেখেছে, তারই পুরস্কারটা পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। অন্তত বম্বাই প্রেসিডেন্সিতে তেমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, যারা স্বচক্ষে এই বিপুল অভ্যুত্থানের জননায়ককে দেখেছে। বরং সিন্ধিয়া, বুন্দেলখণ্ড, অযোধ্যা, আগ্রা, দিল্লি, কানপুর, লক্ষ্ণৌ এ-সব জায়গার কোনোটা হলে একটা কথা ছিলো। দশ বছর পরে, এখনও ধুন্ধুপন্থের অগ্নিগর্ভ নাম শুনলে সেখানকার লোক চমকে ওঠে। যদি নতুন করে বিক্ষোভের আগুন জ্বালবার জন্যেই তিনি চিনদেশে আশ্রয় নেবার প্রলোভন ত্যাগ করে ভারতে ফিরে আসেন, তাহলে দাক্ষিণাত্যই তার গুপ্তসংগ্রামের নিরাপদ ঘাঁটি হতে পারে-কারণ এখানে অনেকটা স্বাধীনভাবে সকলের অলক্ষে তিনি চলাফেরা করতে পারবেন। বম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজ্যপাল কী করে যেন এই মৎলব টের পেয়ে তক্ষুনি তার মাথার একটা দাম ধরে দিয়েছেন।

কিন্তু ধুন্ধুপন্থ সম্বন্ধে কতবারই যে কত জনরব উত্থিত হলো! কতবার তার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া গেলো। কতবার যে তিনি ইংরেজ গোয়েন্দা-বিভাগের চোখে ধুলো দিলেন! শেষকালে জনসাধারণের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মালে তিনি সত্যিই প্রলয়ের দেবতা রুদ্র-শংকরের প্রসাদ পেয়েছেন।

কিন্তু তবু ঔরঙ্গাবাদ কেমন করে যেন বিশ্বাস করে ফেললো যে তিনি আশপাশেই কোথাও আছেন। আর যারা এই সরকারি ফতোয়ায় বিশ্বাস করলে, তাদের ভিতর একজন হলো সেই হতভাগ্য বন্দী, ছ-মাস যাকে ধুন্ধুপন্থের নির্যাতন শিবিরে কয়েদ করে রাখা হয়েছিলো।

বেচারা এই পুরস্কারের ঘোষণা শুনে তক্ষুনি মনে-মনে ঠিক করে ফেললো যে তাঁকে ধরতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। পুরস্কারটাই একমাত্র কারণ ছিলো না তার কাছে– প্রতিশোধস্পৃহায় তার বুকের ভিতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছিলো। পরদিন সকালেই কোতোয়ালিতে গিয়ে সে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে ধুন্ধুপন্থের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে– মনে-মনে এ-কথা ঠিক করে সে রাত এগারোটার সময় গোদাবরীর তীরে তার ডেরার দিকে চললো। তার ডেরা আপাতত হলো একটা ডিঙি নৌকো-গোদাবরীর তীরে সেটা নোঙর-ফেলা। আধবোজা তার চোখ, ভুরু কুঁচকেননা, শহর ছাড়িয়ে সে চলে এলো নদীর দিকে। একমনে ভাবছিলো বলেই সে কখনোই লক্ষ করলে না যে আলখাল্লা ঢাকা এক ফকির তাকে ডালকুত্তোর মতো নিঃশব্দে ও সন্তর্পণে অনুসরণ করে আসছে। ছায়ার মতো ধাবমান সেই ফকির, একবারও তাকে চোখের আড়াল করছে না।

দূরে লোকজনের সাড়া মিলিয়ে গেলো। শহরতলির নিরিবিলি রাস্তায় এসে পড়লো চিন্তামগ্ন মানুষটি। ফকিরও তার পিছন ছাড়লো না : ভাঙা দেয়ালের আড়াল দিয়ে, গাছপালার ছায়ায় লুকিয়ে, ফকির তাকে অনুসরণ করে এলো। রাস্তা নিরিবিলি হলেও এত সাবধান হওয়া ফকিরের পক্ষে জরুরি ছিলো। কারণ একটু পরেই চাঁদ উঠলো, আর হালকা জ্যোৎস্নায় যখন আঁধার ছিড়ে-ছিড়ে গেলো ফকিরকে হয়তো তখন দেখে

ফেলতে পারতো লোকটা। এমনিতে খালি পায়ে হাঁটছিলো বলে তার পায়ের আওয়াজ অবশ্য শোনা যাচ্ছিলো না।

লোকটা কলের মতো নদীর পাড় ধরে তার নৌকোর দিকে এগুলো; এমন-সময় হঠাৎ খ্যাপা বাঘের মতো পিছন থেকে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। কেবল বিদ্যুতের একটা ঝলসানি দেখতে পেলে সে, একটা মালয়ী ছোরার উপর চাঁদের আলো ঝকঝক করে উঠলো! হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হলো ছোরাটা, ধপ করে পড়ে গেলো সে : নির্ভুল লক্ষ্য ফকিরের! অস্ফুট স্বরে কী যেন বলবার চেষ্টা করে লোকটা, কিন্তু কষ বেয়ে কেবল এক ঝলক তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়লো। ফকির দু-হাতে সজোরে তুলে ধরলে মুমূর্ষুর মুখ, আর নিজের মুখটা ফিরিয়ে নিলে জ্যোৎস্নায়।চেনো তুমি আমাকে, চিনতে পারো? ক্ষিপ্ত ও ক্ষুধিত বাঘের মতো ফকির গর্জে উঠলো।

সে! পুরো নামটা বলার ক্ষমতা তার ছিলো না—মাথাটা তার একপাশে হেলে পড়ে গেলো।

পরক্ষণেই গোদাবরীর জলে হারিয়ে গেলো মৃতদেহটা। কেমন করে মৃতদেহটা ডুবে যায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ফকির, তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে এলো শহরের নিশুতি রাস্তায়।

নগরতোরণের সামনে এসে দ্যাখে সমরবাহিনীর লোক কড়া পাহারা বসিয়েছে। শহর থেকে বেরুনো নিষেধ, শহরে ঢোকাও তাই। ফকির মনে-মনে কেবল বললে, ঔরঙ্গাবাদ থেকে আজ রাত্রেই আমাকে চলে যেতে হবে—যে করেই হোক।

ফিরে এলো সে। নগর-প্রাচীর ধরে এগিয়ে গেলো কিছুটা। তারপর উৎরাই

বেয়ে উঠলো প্রাচীরের কাছে। কিন্তু দেয়ালের গা একেবারে মসৃণ-না-আছে কোনো খাঁজ-কাটা, না-বা কোনো চোখা বা ঠেলে-বার-হওয়া পাথরের পিণ্ড; কোনো দড়ি বেয়ে হয়তো ওঠা যায়, কিন্তু তার কোমরবন্ধের কাপড়টি মাত্র কয়েক ফুট-পঞ্চাশ ফুট ওঠার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ফকির আশপাশে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো কী করা যায়।

দেয়ালের আশপাশেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে ঝুরি-নামা মস্ত-সব গাছপালা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে! ঘন পাতায় ঢাকা ডালপালাগুলো হাজার বাহু ছড়িয়ে দিয়েছে অন্ধকারে। লাফিয়ে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়তে পারলেই গাছ বেয়ে উঠে-যাওয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠবে।

ফকির আর এক মুহূর্তও ইতস্তত না-করে লাফিয়ে একটা ডাল ধরে ঝুলতেবুলতে গাছে উঠে পড়লো, তারপর একটা ডাল টেনে নামিয়ে ঠিক দেয়ালের উপর রাখলো—অতঃপর তার ভারে বেঁকে-যাওয়া ডালটা ধরে দড়ির সাঁকোর মতো ঝুলতেঝুলতে সে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলো। শূন্যে ঝুলছে সে ডাল ধরে, প্রায় তিরিশ ফুট নিচে মাটি, পা দুটি যেন কোনো ভর খুঁজছে-দেয়ালের শক্ত মসৃণ গা আর কত দূরে!

এমন সময় গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হলো একটা-আলোর একটা ঝলসানি চলে গেলো তার গা ঘেঁসে! তারপর আরো-কতগুলি বন্দুক গর্জে উঠলো একসঙ্গে। নিশ্চয়ই পল্টনের লোকেরা তাকে দেখতে পেয়েছে!

তার গায়ে কোনো গুলি লাগলো না, কিন্তু যে-ডালটা ধরে সে ঝুলে পড়েছিলো গুলির ঘায়ে সেটা ভেঙে পড়লো। ফকির টাল সামলাতে না-পেরে ডিগবাজি খেলো শুন্যে। অন্যকোনো মানুষ হলে এত উঁচু থেকে পড়ে কিছুতেই বাঁচতো না; কিন্তু ফকির মাটিতে পড়েই লাফিয়ে উঠলো, যেন ছিটকে গেলো সে তীরের মতো; ওই গুলিবৃষ্টির মধ্যে অক্ষত দেহে সে মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। ঔরঙ্গাবাদের বাইরে দুমাইল দূরে গোরা সেপাইরা ছাউনি ফেলেছিলো; সেই ছাউনি পেরিয়ে এলো সে অন্ধকারে গা ঢেকে, সন্তর্পণে। তারপর আরো-কিছুদূর এগিয়ে সে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালে, তার আঙুল-কাটা বাঁ-হাত বাড়িয়ে ধরলে সে শহরের দিকে, চাপা ক্রোধে গর্জন করে উঠলো : এবার যারা ধুন্ধুপন্থের কবলে পড়বে, তাদের এবার কোন শয়তান এসে বাঁচায় দেখবো! ইংরেজরা যেন জেনে রেখে দেয়, নানাসাহেবের শেষ তারা এখনও দ্যাখেনি!

নানাসাহেব! আগুনঝরা নামটা যেন রাতের অন্ধকারে সম্মিলিত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড চ্যালেঞ্জের মতো ফেটে পড়লো! কেউ যেন হাতের দস্তানাটা খুলে গোটা ইংরেজ বাহিনীকে উদ্দেশ করেই তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়ে দিয়েছে।

চলন্ত বাড়ির রহস্য
মঁসিয় মোক্লের-এর দিনপঞ্জি থেকে

কর্নেল মানরো

আমি, মোক্লের, ভারতে পৌঁছেছিলুম ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের ট্রেনে করে বম্বাই থেকে এলাহাবাদ হয়ে কলকাতা পৌঁছেছিলুম মার্চ মাসে। আমার মূল উদ্দেশ্য ছিলো : ভারত-দর্শন। বিশেষ করে গঙ্গার উপকূল ধরে উত্তরাপথের সেই প্রাচীন নগরগুলো পরিদর্শন করার ইচ্ছে ছিলো খুব : প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন সম্বন্ধে যাতে একটা পূর্ণ ধারণা করে নিতে পারি, সেই জন্যেই এই সশরীরে গমনের অভিলাষ, প্রত্যক্ষ দর্শনের উৎকাঙক্ষা।

এঞ্জিনিয়ার ব্যাঙ্কস-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো পারীতে—শুধু পরিচয় নয়, রীতিমতো বন্ধুতা ও ঘনিষ্ঠতাই হয়েছিলো দুজনের মধ্যে। পারীতেই আমরা ঠিক করেছিলুম যে কলকাতায় এসে তার সঙ্গে দেখা করবো আমি—সে ততদিনে সিন্ধিয়া, পঞ্জাব আর দিল্লির রেলপথ স্থাপন করার তত্ত্বাবধান সম্পূর্ণ করে ফেলবে। কার্যক্রম অনুযায়ীই তার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিলো কয়েক মাসের ছুটি পেয়েছিলো সে; আর তাই আমি যখন প্রাচীন ভারতের সন্ধানে বেরুবার প্রস্তাব করলুম, উৎসাহে ও উত্তেজনায় সে একেবারে লাফিয়ে উঠলো।

কলকাতায় আসতেই ব্যাঙ্কস তার স্থানীয় বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। তাদের একজন ক্যাপ্টেন হুড, অন্যজন কর্নেল মানরো।

সেদিন সন্ধেবেলায় এই কর্নেল মানরোর বাড়িতে বসেই আমরা আড্ডা দিচ্ছিলুম। কর্নেল মানরোর বাড়িটা কলকাতার সাহেব-পাড়ায় এক প্রান্তে, গড়ের মাঠের পাশে, যেদিকে গাড়ি-ঘোড়া বা লোকজনের তেমন ভিড় নেই-ফলে কলকাতার যাবতীয় হট্টগোল থেকে উদ্ধার পেয়ে আমরা ঈষৎ আলস্যভরে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলুম।

কর্নেল মানরোর বয়েস বোধহয় সাতচল্লিশ; তার এই বাংলো-বাড়িটা আসলে দেখাশোনা করে অবশ্য তার ডান হাত ও প্রধান অনুচর সার্জেন্ট ম্যাক-নীল : স্কটল্যাণ্ডের মানুষ, অনেক যুদ্ধেই সে মানরোর সঙ্গী হয়েছিলো—শুধু সার্জেন্ট হিশেবে নয়, তার প্রধান অনুচর হিশেবে। ম্যাক-নীলের বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ, সুগঠিত ও শক্তসমর্থ, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল বেশ সুশ্রী। কর্নেলের সঙ্গে-সঙ্গে সেও ভারতীয় পল্টন থেকে অবসর নিয়েছিলো, কিন্তু পুরোেনো অভ্যাসবশত এখনও সামরিক পোশাকই পরে থাকে সবসময়।

মানবরা আর ম্যাক-নীল দুজনেই পল্টন ছেড়েছিলেন ১৮৬০ সালে। কিন্তু দেশে ফিরে না-গিয়ে দু জনেই রাজধানী কলকাতার সাহের-পাড়ায় এসে একটা বাড়ি নিয়েছেন।

ব্যাঙ্কস যখন আমাকে মানরোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়, তখন একটা বিষয়ে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো : খবরদার! সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য কোরো না কিন্তু—আর, কিছুতেই এবং কখনও, নানাসাহেবের নামটাও উচ্চারণ কোরো তার সামনে।

কর্নেল এডওয়ার্ড মানরো স্কটল্যাণ্ডের মানুষ হলেও তাঁর পূর্বপুরুষ প্রায় একশো বছর আগে ভারতে এসেছিলেন। সার হেক্টর মানরো ১৭৬০ সালে বাঙালি পল্টনের বড়োকর্তা

ছিলেন : সার হেক্টর অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম ছিলেন : তাঁর আমলে একবার একটা ছোটোখাটো বিক্ষোভের সূত্রপাত হতেই তিনি একদিনে আটাশজন বিক্ষোভকারীকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন—১৮৫৭ সালে বারেবারে যে-ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিলো।

৫৭-র অভ্যুত্থানের সময় সার জেমস উট্রামের অধীনে কর্নেল মানরো প্রথমে কানপুর, পরে লক্ষ্ণৌ অবরোধে অংশ নিয়েছিলেন। ১৮৫৮ সালে কর্নেল মানরো নাইটকম্যাণ্ডার হন, কিন্তু তার স্ত্রী কোনোদিন নামের আগে লেডি কথাটা ব্যবহার করতে পারেননি। ৫৭ সালের ২৭ শে জুন কানপুরে যে-সমস্ত বিদেশীর মৃত্যু হয়, তার স্ত্রী ছিলেন তাদেরই একজন। সার এডওয়ার্ড (বা কর্নেল মানরো) তার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, স্ত্রীর মৃত্যুতে স্ত্রীর অকাল নিধনের জন্যে জীবনে তার একটাই লক্ষ্য হয়ে উঠেছিলো—যেহেতু নানাসাহেব ছিলেন বিদ্রোহের নেতা, সেইজন্যে যেমন করে হোক তাকে কোতল করতেই হবে। এটাই যেন তার জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো–সেইজন্যেই, যাতে কায়মনোবাক্যে নানাসাহেবের সন্ধান করতে পারেন, সমরবিভাগ থেকে তিনি অকালে স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন। সার্জেন্ট ম্যাক-নীলও সেইসঙ্গে কর্মে ইস্তফা দিলে, আর প্রভুর সঙ্গে নানাসাহেবের সন্ধানে গোটা ভারতবর্ষ চষে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু নানাসাহেব কেবল এই দুজনের চোখেই ধুলো দেননি, সমগ্র গোয়েন্দাবিভাগকে পর্যন্ত নাজেহাল করে দিয়েছিলেন। কেউ তার খোঁজ পেলে না। তিন বছর একটানা খোঁজবার পর হঠাৎ যখন জনরব উঠলো যে নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে প্রাণত্যাগ করেছেন, তখন সার এডওয়ার্ড আর সার্জেন্ট ম্যাক-নীল কলকাতায় এসে নিরিবিলিতে একটা বাংলোবাড়ি ভাড়া করে অবসর জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু এতদিন কেটে গেলেও সিপাহী বিদ্রোহের কথা উঠলেই তার বুকের ক্ষত যেন আবার নতুন হয়ে ওঠে, হাত মুঠো হয়ে

যায়, চোখের তারা ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। বাড়ি ছেড়ে বেরোন না তিনি কখনও, এমন বই তিনি স্পর্শও করে দ্যাখেন না যাতে ঘুণাক্ষরেও ১৮৫৭-র কোনো উল্লেখ আছে।

এত-সব আমাকে বলেছিলো ব্যাঙ্কস। কয়েকদিন ধরে বম্বাইতে যে-গুজবটা শোনা যাচ্ছিলো যে নানাসাহেব নাকি হঠাৎ সেখানে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন, তা সম্ভবত সার এডওয়ার্ডের কানে পৌঁছোয়নি—পৌঁছুলে তিনি হয়তো তক্ষুনি আবার নবোদ্যমে বেরিয়ে পড়তেন। এখন তার বন্ধু আর সঙ্গী বলতে আছে ব্যাঙ্কস আর ক্যাপ্টেন হুড। তারাই রোজ দেখা করতে যায় তার সঙ্গে; দু-বেলা গল্পগুজব করে আড্ডা দেয়, আর সার এডওয়ার্ডের বেদনাকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

ব্যাঙ্কস আসলে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের নির্মাতা, কাজ শেষ করে এখন প্রায় এক বছরের ছুটি পেয়েছে; পরের বছর কলকাতা-মাদ্রাজ বা বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত লম্বা মস্ত-এক রেলপথ বসানো হবে, তারই প্রাথমিক খশড়া শেষ করছে। তার মাথার মধ্যে সবসময়েই কলকজার ঘটাং-ঘটাং বেজে চলেছে। কতযে অদ্ভুত পরিকল্পনা তার মাথায় জাগে, তার কোনো ঠিক নেই। এই মুহূর্তে সে-যে কোনো-একটা অদ্ভুত আবিষ্কার নিয়ে তন্ময় তা তার সঙ্গে আড্ডা দিতে-দিতেই বুঝতে পারলুম। কিছুই খুলে বললে না, বোঝা গেলো হঠাৎ একদিন এক নাম না-জানা কল হাজির করে সবাইকে তাজ্জব করে দিতে চায়।

ক্যাপ্টেন হুড আসলে তারই বন্ধু। ১৮৫৭র বিদ্রোহের সময় সে সমরবিভাগে ছিলো : অযযাধ্যা আর রোহিলখতে গিয়েছিলো সে, পরে মধ্যভারতে গোয়ালিয়র অভিযানের সময় সার হিউ রোজকে সাহায্য করেছিলো। হুডের বয়েস তিরিশের বেশি নয়, ছেলেবেলা

থেকেই ভারতে আছে, বিখ্যাত মাদ্রাজ ক্লাবের সে সদস্য। তামাটে তার চুল আর দাড়ি, আর যদিও সে ছিলো গোরা বাহিনীতে—কিন্তু আসলে ভারতবর্ষই যেন তার দেশ-এবং সব দিক দিয়েই সে সম্পূর্ণ ভারতীয়—এই বিচিত্র ও বিপুল দেশকে সে মাতৃভূমির মতো ভালোবাসে। শুধু তা-ই নয়, তার মতে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সে নাকি এখানেই, এখানেই, এখানেই। পাহাড়ে চড়ার খুব শখ, ভালো শিকারি, আর দুর্ধর্ষ পথিক। এখনও হিমালয়ে ওঠবার সুযোগ তার হয়নি, কিন্তু হিমালয়ই তার শেষ স্বপ্ন। ওই তুষারমৌলির ধবল শৃঙ্গই নাকি তার সাফল্য ও সার্থকতার ঝকমকে মুকুট হবে।

ব্যাঙ্কস আর হুড অনেকবার সার এডওয়ার্ডকে নিয়ে দেশ-ভ্রমণে যাবার প্রস্তাব করেছে, কিন্তু কর্নেল অবিচল। সেদিন সন্ধেবেলায় আবার কথাটা উঠলো—সূত্র অবিশ্যি ছিলুম আমি আর ব্যাঙ্কস। আমরা যে উত্তরাপথ ভ্রমণ করার সংকল্প নিয়েছি, সে-কথা শুনে হুড বললে, হেঁটে না-বেড়ালে আর কী মজা! রেলে গিয়ে মজা নেই। ব্যাঙ্কস আবার হন্টন কি অশ্বতরের বিরোধী। ফলে পাল্কি বা চতুর্দোলা ছাড়া আর কীসে যাওয়া যায়?

দূর-দূর, ব্যাঙ্কস বললে, ও-সব আদ্যিকেলে বাহনে আবার কেউ বেরোয় নাকি!

কেন, তোমার ওই ঝমরঝম ঘটাংঘট রেলগাড়ির চেয়ে এখানকার গোরুর গাড়ি ঢের ভালো, হুড জানিয়ে দিলে।

হ্যাঁ, একটা চারচাকার গাড়ি তারা এমনভাবে টেনে নিয়ে যায় যে মনে হয় চিনসমুদ্রে টাইফুন উঠেছে-ব্যাঙ্কস বললে।

তা হয়তো সেকেলে লোকজনের মনে হয়, কিন্তু তাহলেও ছন্দ আর দোলার জন্য চতুর্দোলাই ভালো–তোমার রেলগাড়ির চেয়ে তো ভালো—

চতুর্দোলা! পাল্কি! ব্যাঙ্কস হেসে উঠলো, কফিন বলো না কেন ওটাকে—ভিতরে তো মড়ার মতোই শুয়ে থাকতে হয়।

কিন্তু আরাম কত! শুয়ে বসে যেতে পারবে-প্রত্যেক স্টেশনে তোমাকে কেউ কাঁচা ঘুম থেকে তুলে টিকিট দেখতে চাইবে না—তাছাড়া তোমার ও-সব এক্সপ্রেস ট্রেনের চেয়ে অনেক নিরাপদও বটে!

সবচেয়ে ভালো হয়, আমি বললুম, কেউ যদি নিজের বাড়িটা নিয়েই বেড়াতে বেরুতে পারে!

শামুক কোথাকার! ব্যাঙ্কস হেসে উঠলো!

বন্ধু-হে, আমি বললুম, শামুক ইচ্ছেমতো তার ভোলা থেকে বেরুতে আর ঢুকতে পারে—আর তার ওই খোলার বাড়ি নিয়েই বিশ্বভ্রমণে বেরোয়। তা শামুক হতে পারলে মন্দ হতো নাকি! চলন্ত বাড়ি-নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে পারছে ইচ্ছেমতো-আমার তো মনে হয় যানবাহনের উন্নতির একেবারে চূড়ান্ত স্তরে না-পৌঁছুলে তা আর সম্ভব হবে না!

কর্নেল মানরো এতক্ষণে মুখ খুললেন।একথা ঠিক। যদি বাড়িতে বসে-বসেই দেখতে পাই দিগন্ত ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে, কেবলই বদলে যাচ্ছে পারিপার্শ্বিক কি জলহাওয়া, তাহলে.....

তাহলে আর নতুন জায়গায় গিয়ে ডাকবাংলো খুঁজে মরতে হবে না—হুড বললে, কে জানে বাপু অচেনা ডাকবাংলোয় অসুবিধে কত, ঠিকমতো স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে কি না, তার উপর হ্যাঙ্গামের অন্ত আছে? স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে এসো—যত রাজ্যের হ্যানোত্যাননা! অথচ নিজের বাড়িটা চলতে পারলে যখন খুশি যেখানে খুশি দিব্যি খুটি গাড়া যেতো। বৈঠকখানা, খাবার ঘর, রান্নাঘর, লাইব্রেরি, শোবার ঘর তো আছেই-সঙ্গে নিজের পছন্দসই বাবুর্চি আছে। আহা-তেমন দিন যদি আসে, বুঝলে ব্যাঙ্কস, তেমন দিন এলেই বুঝবো যে সত্যি-সত্যি সভ্যতার অগ্রগতি হলো। তোমার ও-রেলগাড়ির চেয়ে একশোগুণ ভালো, এ-কথা মানবে তো?

মানবো না কেন, খুব মানি। তবে এর চেয়েও ভালো বাহনের পরিকল্পনা করা যায়, সেটাও বলি এই সঙ্গে।

এর চেয়েও ভালো?

নিশ্চয়ই। তুমি বলেছো যে রেস্তোরাঁ-কার, স্লিপিং-কার-ওলা ট্রেনের চেয়েও তোমার চলন্ত বাড়ি ঢের ভালো—আচ্ছা, তা না-হয় মানলুম। কিন্তু লোকে তো ব্যাবসাসূত্রেও কত জায়গায় যায়, তার বেলা? অত-বড়ো বাড়ি নিয়ে তো তুমি সব জায়গায় যেতে পারবে না। ফলে তুমি তোমার আকল্প জানালে এক স্থপতিকে-খুদে মাপের একটা বাড়ি তৈরি করে দেবার জন্যে, আর সে তোমার ভাবনাকে কাজে তরজমা করলে—তুমি একটা বাড়ি পেয়ে গেলে, যার ভিত মাটির তলায় শিকড় গেড়ে বসেনি–এখানে-ওখানে তাকে সরিয়ে নেয়া যায়। সব আরামের ব্যবস্থাই আছে তাতে, সব রাস্তারই উপযোগী হলো সেটি,

সরুগলিতে আটকে যাবার ভয় নেই। ধরো, আমাদের বন্ধু কর্নেল মানরোর জন্যই এ-রকম একটা সচল বাড়ি বানানো হলো; তিনি আমাদের আমন্ত্রণ করলেন তার বাড়িতে করে আর্যাবর্তে বেড়িয়ে আসার জন্যে-শামুকদের মতোই অনেকটা-কিন্তু তার চেয়েও ভালো-খোলার সঙ্গে জন্মসূত্রেই চির-আটক নয়। ঠিকঠাক সব ব্যবস্থা হলো—তোমার বাবুর্চি, রান্নাঘর—কিছুই বাদ গেলো না। যাত্রার দিন ঠিকঠাক। এমন সময়-হা-হতোস্মি!-এ-বাড়ি টেনে নিয়ে যাবে কে?

কেন? গোরু-ঘোড়া-খচ্চর?

ডজন-ডজন গোরু-ঘোড়া লাগবে তো তাহলে—

তাহলে হাতি-হ্যাঁ, হাতিই টেনে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া হাতি হচ্ছে আভিজাত্যের প্রতীক, একেবারে দিগ্বিজয়ী রাজার মেজাজ এনে দেবে। একদল হাতি থাকবে, দিব্যি হেলতে-দুলতে গজেন্দ্রগমনে এগুবে বাড়িটা। কেমন, চমৎকার হবে না?

হুঁ, চমৎকার দেখাবে বটে, কিন্তু—

আবার কিন্তু!—

এই কিন্তুটা বেশ বড়োই! ওই হস্তীযুথের মতোই প্রকাণ্ড!

তোমাদের এঞ্জিনিয়ারদের কারবারই আলাদা। কেবল একটার পর একটা বাধার কথা তোলো—

সে-বাধা আবার জয়ও করে ফেলি, ব্যাঙ্কস জানালে মৃদুস্বরে।

তাহলে তোমার নিজের কিন্তুটাই জয় করে দেখি!

করবো তো বটেই। শোনো তবে! শুনলেন তো মানরো, ক্যাপ্টেন হুড কতকত বাহনের নাম করলে—কিন্তু তারা প্রাণী বলে তাদের অসুখ-বিশুখ হতে পারে, কখনও ক্লান্ত হয়েই পড়বে-বা—আর তাদের খাদ্য-সেটা জোগাবে কে? আসলে চলন্ত বাড়ি ব্যাপারটা তখুনি সম্ভব হবে, যখন এটা বাষ্পে বা স্টীমে চলবে।

আর রেললাইন দিয়ে ঘটাং-ঘটাং ঘটঘট করে এগুবে? হুড কেবল কাঁধ ঝকালে। ব্যাঙ্কস যে এ-কথা বলবে তা আমি জানতুম।

না, রেললাইন লাগবে না। তক্ষুনি বললে ব্যাঙ্কস, লাগবে কেবল একটা উঁচু জাতের ট্র্যাকশন-এঞ্জিন–

শাবাশ! হুড তারিফ করে উঠলো, তোমার ওই চলন্ত বাড়ি যদি রেললাইনের কয়েদি না-হয়, তাহলে আমি ওই স্টীমের কথায় রাজি আছি।

কিন্তু ব্যাঙ্কস, আমি বললুম, তোমার এঞ্জিনেরও খাদ্য চাই গোরু-ঘোড়া হাতির মতো—সে-খাদ্য না-পেলে তোমার ওই কলকারখানাও বিকল হয়ে পড়বে।

একটি স্টীমের ঘোড়া অনেকগুলো সত্যিকার ঘোড়ার চেয়ে বলশালী, বললে ব্যাঙ্কস, আর এই অশ্বশক্তি যত-ইচ্ছে বাড়িয়ে তোলা যায়। স্টীমের ঘোড়ার অসুখ নেই, অবসাদ নেই,

রোদে-বৃষ্টিতে, জলে-ঝড়ে সব অবস্থায় সব জায়গায় সে সমানভাবে এগুতে পারে। বুনো জানোয়ারের ভয় নেই তার, সাপে তাকে কাটতে পারবে না, পোকামাকড় হুল ফোঁটাতে পারবে না; বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নেই, একটানা সে যেতে পারবে, চাবুক লাগবে না, ধমকাতে হবে না, তাড়া দিতে হবে না। অর্থাৎ রান্না করে খেতে না-চাইলে আসল ঘোড়ার চেয়ে সব দিক থেকেই ভালো এই স্টীমের ঘোড়া। একটু কেবল তেল লাগবে-কলকব্জা শড়গড় রাখার জন্যে, আর লাগবে কিছু কাঠ বা কয়লা। আর জানোই তো, মোক্লের, ভারতে বন-জঙ্গলের অভাব নেই—কাজেই কাঠের জন্যে তোমাকে একটুও হন্যে হতে হবে না!

বেড়ে বলেছো, চমৎকার। ক্যাপ্টেন হুড বললে, স্টীমের ঘোড়া জিন্দাবাদ! আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ভারতের দীর্ঘ পথ ধরে চলেছে এক সচল প্রাসাদ-তার নির্মাতা ব্যাঙ্কস নামে এক মস্ত এঞ্জিনিয়ার-জঙ্গল কুঁড়ে সে চলেছে, বাঘ সিংহ ভাল্লুক তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারছে না, আর আমরা দেয়ালের আড়ালে বসে তোফা শিকার করে যাচ্ছি। আঃ, ভাবতেও আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে, ব্যাঙ্কস। আহারে! যদি আর পঞ্চাশ বছর পরে আমার জন্ম হতো!

কেন? পঞ্চাশ বছর পরে জন্মাতে চাচ্ছো কেন?

কারণ পঞ্চাশ বছর পরেই তো তোমার স্বপ্ন সত্যি হবে—তখন আমরা বাষ্পেচলা বাড়ি পাবো

চলন্ত বাড়ি তো কবেই বানিয়েছি আমি, ব্যাঙ্কস মৃদুস্বরে জানালে।

বানিয়েছে? তুমি?

ক–বে! দেখলে বুঝবে যে তোমাদের সব কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

তাই নাকি? হুড চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, তাহলে আর দেরি কেন? এসো, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।

ব্যাঙ্কস, তাকে শান্ত হতে বলে, সার এডওয়ার্ড মানরোর দিকে ফিরে তাকালে। সার এডওয়ার্ড, যদি আজ থেকে এক মাসের মধ্যে একটা কলে-চলা বাড়ি এনে আপনার হাতে সমঝে দিই, তাহলে মোরে, হুড আর আমার সঙ্গে আপনি উত্তরাপথ বেড়াতে যেতে রাজি আছেন তো?

ব্যাঙ্কসের গলার আগ্রহ দেখে মানরো খানিকক্ষণ একটু সীরিয়াসভাবে ভাবলেন। রাজি আছি! ব্যাঙ্কস, যত টাকা লাগে দেববা—কেবল হুড যা কল্পনাও করতে পারেনি, তেমনি একটা কলে-চলা বাড়ি এক মাসের মধ্যে এনে দাও আমাদের-আমরা তাহলে সারা ভারত ঘুরে বেড়াবো।

অমনি হুড তিনবার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। নেপালে শিকারটা এবার তোফা জমবে!

ঘরের ভিতর এই শোরগোল শুনে ম্যাক-নীল অবাক হয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে।

ম্যাক-নীল, মানরো বললেন, আমরা এক মাসের মধ্যেই উত্তরাপথ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বো। তুমি সঙ্গে যাবে তো?

আপনি গেলে, নিশ্চয়ই যাবো, ম্যাক-নীল তার চিরকেলে শান্ত গলায় জানালে।

–মঁসিয় মোক্রের-এর দিনপঞ্জি আপাতত শেষ–

ইলোরার গুহায় আঁধারে

শুধু সত্যি নয়, তার চেয়েও বেশি। মরাঠা রাজকুমার ধুন্ধুপন্থ—পেশোয়া বাজি রাওএর সেই দুর্দান্ত দত্তকপুত্র, যিনি হয়তো সিপাহী অভ্যুত্থানের একমাত্র জীবিত নেতাকিনা শেষ পর্যন্ত নেপালের দুর্গম অঞ্চল ত্যাগ করে পরম দুঃসাহসে ও স্পর্ধায় আবার ভারতে প্রবেশ করেছেন! শুধু দুঃসাহস নয়, ঔদ্ধত্য। বিপদের সঙ্গে তার বন্ধুতা–সে কি আজকের? তীক্ষ্ণতম গোয়েন্দাটির চোখে অনায়াসে তিনি ধুলো দিতে পারেন, তোয়াক্কা রাখেন না কোনোকিছুর; কোনো ভয়ডর নেই। শেষ অব্দি দাক্ষিণাত্যে তিনি এসেছেন নতুন করে বিক্ষোভের বীজ বপন করার জন্যে যে-বণিকগোষ্ঠী ভারত দখল করে বসে আছে, এই ডাকাবুকো মানুষটি তাদের মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী। কেনই বা হবেন না? বাজি রাও-এর উত্তরাধিকার কি তার উপরেই বর্তায়নি? অথচ ১৮৫১ সালে পেশোয়া যখন মারা গেলেন, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি তখন তাকে বার্ষিক আট লাখ টাকা বৃত্তি দিতে সরাসরি অস্বীকার করে বসলো। এটা একটা কারণ বটে, কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থই নেই। ছত্রপতি শিবাজির স্বপ্ন হানা দেয় তার চোখে বার-বার, আর সেই স্বপ্নই সর্বস্ব!

কিন্তু এখন—এখন নানাসাহেব কীসের প্রত্যাশা করবেন? বিদ্রোহ দমিত হয়েছে–তাও আজ আট বছর হলো; কম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার ক্রমশ ইংরেজ সরকারের হাতে চলে যাচ্ছে : জনশ্রুতি, রানী ভিক্টরিয়া নাকি ভারতেশ্বরী হবেন। পুরোনো পল্টন ভেঙে আবার নতুন করে ফৌজ গড়া হয়েছে : সেই মহা-অভ্যুত্থানের কোনো চিহ্ন মাত্র নেই। তাহলে কি সারা হিন্দুস্থান-জোড়া এক জাতীয় বিপ্লবের স্বপ্ন

দেখছেন নানাসাহেব-যে-অভ্যুত্থান শুধু আর সেপাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, দেশের আপামর জনসাধারণ ও আবালবৃদ্ধবনিতা যাতে প্রচণ্ড অংশ নেবে? কে জানে?

ঔরঙ্গাবাদে তার উপস্থিতি যে চাপা থাকেনি এটা তো স্পষ্ট বোঝা গেলো তার মাথার উপর দামের লেবেল এঁটে দেয়ায়। আরো সাবধান হতে হবে তাকে, আরো হুঁশিয়ার...

সেই রাত্রে নানাসাহেব আর এক ঘণ্টা সময়ও নষ্ট করলেন না। এই অঞ্চল তার নখদর্পণে; ঠিক করলেন পঁচিশ মাইল দূরে ইলোরার গুহায় গিয়ে এক্ষুনি অনুচরদের সঙ্গে দেখা করবেন।

ঘুটঘুটে কালো রাত। ছদ্মবেশী ফকির প্রথমে ভালো করে লক্ষ করে নিলে কেউ তার পাছু নিয়েছে কিনা, তারপর শাহসুফির স্মৃতিভবন মাজারটি পেরিয়ে, দৌলতাবাদের কেল্লার পাশ দিয়ে সমতল এলাকা ছেড়ে, ফকির এক বন্ধুর পাহাড়ি এলাকায় এসে পড়লো। উৎরাই এবার, কিন্তু তাই বলে নানাসাহেবের গতি রুদ্ধ হলো না। আজ রাতেই পঁচিশ মাইল পথ পেরিয়ে ইলোরায় পৌঁছুতে হবে। সূর্য যখন উঠলো, তখন নানাসাহেব রঞ্জাগ্রামে ঔরংজীবের সমাধি পেরিয়ে গেছেন। তার খানিকবাদেই তিনি সেই বিখ্যাত গুহায় গিয়ে পৌঁছুলেন। পাহাড়ের গা কেটে-কেটে এই তিরিশটা গুহা বানানো হয়েছে; পাথর কেটে ২৪টা চৈত্য বা বিহার বানিয়েছিলো এখানে স্থপতিরা, তারপর বাকিটুকু ভাস্করদের দান। এদের মধ্যে কৈলাস নামে একশিলা মন্দিরটি সবচেয়ে অবাক করে দেয় : ২০ ফুট উঁচু, ৬০০ ফুট পরিধি-ওলা একটা একা-পাথরের গা কেটে এই চৈত্য নির্মিত হয়েছে। স্তম্ভ, তেকোণা চূড়ো, বর্তুল গম্বুজ—সব-কিছুর ভিত্তি যেন অতিকায় একদল হস্তীযূথ। আর তারপর পাথরের গায়ে তারা কাজ করেছে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে।

কীসের সঙ্গে তুলনা হবে এর? মিশরের বিস্ময় পিরামিড ছাড়া আর-কোনো-কিছুর সঙ্গেই কি এর কোনো তুলনা চলে?

কেউ থাকে না এখন এই মন্দিরে; সময় এর মধ্যেই তার হাত বাড়িয়েছে এর দিকে, এই একহাজার বছরের পুরোনো বিস্ময়ের দিকে।

নানাসাহেব ইলোরায় পৌঁছুলেন সকলের অগোচরে; গভীর গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন তিনি সন্তর্পণে, তার পরে একটি বিরাট হস্তীমূর্তির আড়ালে এক ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আসলে এটা একটা নালা-বৃষ্টির জল যাতে এই নালা দিয়ে বাইরে বয়ে যেতে পারে, এইজন্যেই এটা তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখন এটা শুকনো ও ফাঁকা, বিষণ্ণ আঁধার ছাড়া আর-কিছু নেই এখন এই সুড়ঙ্গের মধ্যে। একটু এগিয়ে গিয়ে নানাসাহেব কি-রকম অদ্ভুতভাবে একবার শিশ দিয়ে উঠলেন, অমনি অন্ধকার ভেদ করে তেমনি আরেকটি শিশের শব্দ শোনা গেলো, আর অন্ধকারের মধ্যে দূরে একজায়গায় আলো জ্বলে উঠলো। প্রতিধ্বনির বিদ্রূপ নয়, এই কথাই বোঝালো যেন এই আলো। পরক্ষণেই একটা ছোটো লণ্ঠন হাতে একটি ভারতীয় এসে দাঁড়ালে।

বাতি নিভিয়ে ফ্যালো এক্ষুনি? চাপা স্বরে বলে উঠলেন নানাসাহেব।

ধুন্ধুপন্থ, তুমি? লোকটি বাতি নিভিয়ে ফেললে।

হ্যাঁ, আমিই। কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে, পরে সব কথা বলবো। মনে রেখো, খাওয়াদাওয়া কথাবার্তা সবই অন্ধকারে সারতে হবে আমাদের। আমাকে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

লোকটা তাঁর হাত ধরে নিয়ে যেতে লাগলো। ভিতরে এক জায়গায় কিছু খড় আর শুকনো পাতা বিছোনো : এতক্ষণ সে সেখানেই শুয়ে ছিলো, নানাসাহেবের সংকেতে জেগে গিয়েছে। নানাসাহেবকে ওই পত্রশয্যায় বসিয়ে রেখে সে খাবার আনতে গেলো। খাবার অতি সামান্যই : চাপাটি, শুখা মাংস আর ডাবের জল।

নানাসাহেব যতক্ষণ খেলেন, কোনো কথাই বললেন না; বড্ড ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত ছিলেন; কিন্তু তার সমস্ত তেজ যেন চোখের তারায় জ্বলজ্বল করে উঠলো অন্ধকারে, যেন এই জ্বলন্ত চোখ দুটো কোনো তেতে-ওঠা ক্রুদ্ধ বাঘের। লোকটি সারাক্ষণ চুপ করে রইলো; নানাসাহেবকে বিরক্ত করতে চাইলে না। এ আর-কেউ নয়, বালাজি রাও, নানাসাহেবেরই ভাই, বয়েসে এক বছরের বড়; দেখতে একেবারে একরকম–নানাসাহেব কে, আর কে-যে বালাজি রাও-লোকেরা অনায়াসে ভুল করে বসতে পারে, আগে থেকে না-জানলে। দৈহিক মিল মানসগঠনে ও কৌশল-রচনায় নৈপুণ্যের ফলেই যেন আরো সম্পূর্ণ হয়েছে। বৈদেশিক শক্তির প্রতি তীব্র ঘৃণা, বুদ্ধিতে, আর নির্মমভাবে সংকল্প সাধনে তারা যেন দুই দেহে আসলে একই মানুষ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই দুজন সবসময় একসঙ্গে ছিলেন। আগুন যখন নিভে গেলো, দুজনেই একসঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন নেপাল-সীমান্তে। আর এখন দুজনেই আবার একই মশাল নিয়ে ভারতে ফিরে এসেছেন : লক্ষ্য, এক, সার্থকতাও এক, এবং একইভাবে প্রস্তুত দুজনে।

খাওয়ার পর নানাসাহেব কিছুক্ষণ তার হাতে মাথা রেখে চুপ করে রইলেন। বালাজি রাও-এর ঘুম পাচ্ছিলো। কোনো কথা না-বলে তিনিও চুপ করে রইলেন।

হঠাৎ ধুন্ধুপ মাথা তুলে ভাইয়ের হাতটি চেপে ধরলেন, কথা যখন বললেন মনে হলো গমগমে আওয়াজ বেরিয়ে এলো কোনো গভীর গহ্বর থেকে : আমার নামে হুলিয়া

বের করেছে ওরা! যে আমার মাথা নিয়ে যেতে পারবে, তাকে দু-হাজার মোহর ইনাম দেবে বলে ঘোষণা করেছে।

মুহূর্তে বালাজি রাও সচকিত হয়ে উঠলেন, তোমার মাথার দাম তার চেয়েও অনেক বেশি, ধুন্ধুপ। দু-হাজার মোহর তো আমার মাথারই দাম হবে না। কুড়ি হাজার মোহর দিয়ে যদি আমাদের ধরতে পায়, তাহলেই তাদের ভাগ্য বলতে হবে।

আর তিনমাস পর ২৩ শে জুন পলাশির যুদ্ধের স্মৃতি উদ্যাপিত হবে। আমাদের জ্যোতিষীরা বলেছিলো, পলাশির যুদ্ধের একশো বছর হলে-১৮৫৭ সালে ব্রিটিশরা হার স্বীকার করবে, সূর্যবংশের পুনরভ্যুদয় হবে তখন। একশোর জায়গায় একশো নয় বছর কেটে গেছে, অথচ ভারত এখনও যত বদমায়েশ বিদেশীর পদানত রয়ে গেলো।

বালাজি রাও বললেন, ১৮৫৭ তে হেরে গেলেও তার দশ বছর পরে আমাদের জয় হবেই। ১৮২৭, ৩৭, ৪৭-প্রতি দশ বছর পর-পর বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে ভারতে। এ-বছরও আবার আগুন লাগবে চারধারে!

লরেন্স বেঁচে নেই, বার্নার্ড, হোপ, নাপিয়ের, হাডসন, হ্যাভলক-কেউ বেঁচে নেই আর। কিন্তু ক্যামবেল আর রোজ এখনও বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে-আর আছে ওই কর্নেল মানরো-ওরই পূর্বপুরুষ একদিন কামানের মুখে বিদ্রোহীদের উড়িয়ে দিয়েছিলো। ও-ই ঝাঁসির রানীকে নিজের হাতে বধ করেছে। একবার আমার হাতে পড়লে আমি তাকে

দেখিয়ে দেবো সেকেন্দ্রাবাদের হত্যাকাণ্ড, বেগম মহলের রক্তপাত, বেরিলি, ঝাসি, মেবার, দিল্লি-কিছুকেই আমি ভুলে যাইনি। শুধু বারুদের স্কুপে আগুন ধরাতে হবে একবার, তারপর আমি পেতে চাই তাকে মুখোমুখি।

মানরো শুনেছি পল্টন থেকে অবসর নিয়েছে, বালাজি রাও বললেন।

আগুন জ্বলে উঠলেই আবার সে এসে যোগ দেবে। কিন্তু আমরা যদি আর আগুন জ্বালাতে না-পারি, তাকে আমি তাই বলে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না। কলকাতায় তার বাংলায় গিয়ে আমি তার রক্ত দেখবো।

তা না-হয় হলো—কিন্তু এখন?

এখন কাজ শুরু হবে। সারা দেশ-জোড়া অভ্যুত্থান হবে এটা। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী-গরিব, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই যাতে অংশ নেয়, যাতে একযোগে সব গ্রাম-নগর দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে-সেই চেষ্টাই করতে হবে আমাদের। আমি দক্ষিণাপথের নানা অংশ ঘুরে এসেছি—শুকনো বারুদের স্কুপের মতো প্রতীক্ষ করছে সব জায়গা, কখন একটা ফুলকি এসে পড়ে। এখন শুধু দিনক্ষণ স্থির করে একযোগে সর্বত্র যাতে বিদ্রোহ শুরু হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

নানাসাহেব বুকের উপর হাত ভাঁজ করে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন; যেন কোনো আলোকদৃষ্টির বলে সমস্ত ভবিষ্যৎ তার সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে, তার দৃষ্টি থেকে তা-ই মনে হয়। বালাজি রাও কোনো কথা বললেন না। এই ভয়ংকর হৃৎপিণ্ডে যখন

আগুনের ফুলকি এসে পড়ে, তখন কেমন করে মুহূর্তে শিখা জ্বলে ওঠে, বালাজি রাও সারাক্ষণ তা-ই দেখতে ভালোবাসেন।

নানাসাহেব যেন তার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন : আর-সবাই কোথায়?

তারা আগেকার পরিকল্পনা মতো অজন্তার গুহায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আর আমাদের ঘোড়াগুলো?

ইলোরা বড়োগামির রাস্তায় রেখে এসেছি।

কালোগনি আছে সেখানে?

হ্যাঁ, ধুন্ধুপন্থ। সবাই প্রস্তুত।

তাহলে এক্ষুনি রওনা হতে হবে। সূর্যোদয়ের আগেই আমাদের অজন্তায় পৌঁছুতে হবে। নানাসাহেব বললেন, সাতপুরা পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছুতে হবে আমাদের, যাতে ব্রিটিশের গোয়েন্দাদের আমরা প্রতিরোধ করতে পারি। তারপর ভীল আর গোর্তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে আমাদের-যাতে বিন্ধ্যপর্বতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠতে পারে।

বলতে-বলতে দুজনে হস্তীগুম্ফা থেকে বেরিয়ে এলেন। ইলোরা থেকে অজন্তার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলকিন্তু নানাসাহেব তো এখন আর পায়ে হেঁটে যাবেন না–বিশ্বস্ত ভৃত্য

কালোগানি ঘোড়াগুলো নিয়ে মাইল খানেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করছে। তার জন্যে।

জিনের উপর উঠে বসেই তিনজনে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ইলোরা ছেড়ে আসার পনেরো ঘণ্টা পরে এক সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্য দিয়ে সেই সপ্তবিংশতি মন্দিরের জগৎবিখ্যাত উপত্যকায় প্রবেশ করলেন নানাসাহেব। তখন কালো রাত নেমে এসেছে চারপাশে; চাঁদ ওঠেনি—কিন্তু লক্ষ তারায় ঝিকমিক করে উঠেছে আকাশ : ঝোঁপের আড়াল দিয়ে তিনজনের ঘোড়া টগবগ করে ছুটে চললো। হাওয়া থেমে আছে, গাছের পাতা স্তব্ধ, রাতটা থমথমে-ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া দূর থেকে কেবল এক চঞ্চল ঝরনার কলরোল কানে আসে! আস্তে-আস্তে ঝরনার আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে উঠলো : সাত কুণ্ডের প্রপাত পেরিয়ে ধুলো উড়িয়ে তিনজনে আরো এগিয়ে এলেন, যেখানে কনুইয়ের মতো মোচড় খেয়ে এগিয়েছে গিরিখাত। নিচে বৌদ্ধ স্থাপত্যের আশ্চর্য সমৃদ্ধি তাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হয়ে গেলো।

এই রহস্যময়, গরীয়ান ও চমকপ্রদ মন্দিরগুলো নানাসাহেবের নখদর্পণে। কতবার যে গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ চক্ষু এড়াবার জন্যে এইসব গুফার সুড়ঙ্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। তাই কোনো আলো লাগলো না...অন্ধকারেই অনায়াসে তিনি এগিয়ে যেতে পারলেন।

তারপর অজন্তায় ঢোকবার মুখে জঙ্গলে পৌঁছে নানাসাহেব সংকেত করতেই উপরে গাছের ডালপালা থেকে লুকোনো মুখগুলো উঁকি মারলে। জনাকুড়ি হবে তারা সংখ্যায় : সাপের মতো পিছলে নেমে এলো নানাসাহেবের সশস্ত্র অনুচরেরা।

চলো!

ধুন্ধুপন্থ তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, জানতে না-চেয়েই তারা পায়ে-পায়ে অনুসরণ করলে অশ্বারোহীদের। বিশ্বস্ত তারা, নানাসাহেবের জন্যে দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তারা উৎসর্গ করেছে, ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দূর-দূরান্তরে ছুটে যেতে পারে তারা।

ছোটো দলটা উত্তরমুখো এগুলো–সাতপুরা পাহাড়ের গিরিখাতের দিকে। সকালবেলা নাগপুরের উপরে তারা বম্বাই-এলাহাবাদ রেলপথের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো।

আর তখনই হঠাৎ বাঁশি বাজিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে এলো কলকাতা এক্সপ্রেস।

নানা লাগাম টেনে ঘোড়া থামালেন, চলন্ত ট্রেনটির দিকে হাত বাড়িয়ে প্রচণ্ড গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন : ছুটে গিয়ে বড়োলাটকে জানিয়ে দাও নানাসাহেব এখনও বেঁচে আছে। তাকে বোলো যে শিগগিরই রক্তের স্রোতে ভেসে যাবে এই রেলপথ–সারা হিন্দুস্থান রক্তে রাঙা হয়ে যাবে।

–চলন্ত বাড়ির রহস্য —
–মঁসিয় মোক্লের-এর দিনপঞ্জি থেকে আবার–

লৌহদানব বেহেমথ

পাঁচই মে সকালবেলায় কলকাতা থেকে চন্দননগর যাবার রাস্তায় হঠাৎ এক দৃশ্য দেখে সব লোকে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

সকালবেলায় ভারতের রাজধানীর রাস্তায় অদ্ভুত একটি শকট বেরুলো, যা দেখে চারপাশে কৌতূহলী ও বিস্মিত জনতার ভিড় জমে গিয়েছিলো। কারণ ওই শকটটি টেনে আনছিলো এক অতিকায় হাতি; অতিটি উচ্চতায় কুড়ি ফুট আর লম্বায় তিরিশ : তার চালচলনের মধ্যে এমন-একটা অদ্ভুত ভঙ্গি ছিলো যা দেখে রাস্তার লোকে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। তার শুঁড়টি বাঁকানো, আর শূন্যে-তোলা; মস্ত কাস্তের মতো তার দাঁত দুটি মুখ থেকে বেরিয়ে আছে; পিঠে জমকালো একটি হাওদা, অনেকটা কোনো স্তম্ভতলের মতে-মিনারের মতো ছাত তার, কাচের জানলা বসানো চারদিকে। আর এই হাতিটি দুটি আস্ত বাড়ি-না, চলন্ত বাংলো-টেনে নিয়ে আসছে-বাড়িগুলোর তলায় চারটে করে চাকা; চাকার তলার দিকটাই কেবল দেখা যায়, কারণ উপরের দিকটা শক্ত খোলে ঢাকা। দুটো বাংলোই শেকল দিয়ে এমনভাবে আটকানো যাতে চলার সময় কোনো অসুবিধেই না-হয়। কিন্তু কেমন করে একটা মাত্র হাতি অনায়াসে অমন দুটো বাংলো টেনে নিয়ে যাচ্ছে? তাজ্জব ব্যাপার! কলের মতো পা ফেলে-ফেলে সে আসছিলো প্রথমে, একটু পরেই গতি আরেকটু বৃদ্ধি পেলো—কিন্তু কোথাও কোনো মাহুত দেখা গেলো না, অঙ্কুশের কোনো বালাই-ই নেই যেন।

মাঝে-মাঝে গর্জে উঠছে হাতিটা, ভারতীয় অরণ্যে যে-বৃংহিত প্রায়ই শোনা যায়। আর একটু পরে-পরেই শুঁড়ের ভিতর থেকে ভলকে-ভলকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। অথচ, তবু এটা নাকি হাতি। সবুজ-কালো রঙের আঙ্গুরের তলায় ইস্পাতের কাঠামোটা ঢাকা, চোখ দুটো—আসলে দুটি বাতি–সত্যিকার চোখের মতো। আর যেখানে তার হৃৎপিণ্ড থাকার কথা সেখানে রয়েছে স্টীম এঞ্জিন।

অর্থাৎ এটাই সেই চলন্ত বাড়ি–ব্যাঙ্কস তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে।

প্রথম বাড়িটায় রয়েছি আমরা-কর্নেল মানরো, ক্যাপ্টেন হুড, ব্যাঙ্কস আর আমি। আর দ্বিতীয়টায় ভৃত্যমহল-সার্জেন্ট ম্যাক-নীলের তত্ত্বাবধানে। ব্যাঙ্কস তার কথা রাখতেই মানরোও তার প্রতিশ্রুতি রাখলেন, আর তাই কলকাতার রাস্তায় এই অদ্ভুত বাড়িটা পাঁচই মে সকালবেলায় ভ্যাপসা গরমের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে।

কিন্তু, তাই বলে স্টীম এঞ্জিনটা হাতির মতো দেখতে হলো কেন? চতুষ্পদ কোনো শকটের কথা কেউ কখনও ভেবেছিলো? সত্যি-বলতে, প্রথম দেখে আমরাও সবাই তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলুম। শেষকালে ব্যাঙ্কসের কথায় সব পরিষ্কার হয়ে গেলো।

তোমরা কেউ ভূটানের রাজাকে চেনো? ব্যাঙ্কস বলেছিলো আমাদের।

আমি চিনি, বলেছিলো হুড, বরং বলা ভালো, চিনতুম—কারণ দু-মাস আগে রাজা মারা গেছেন।

মরবার আগে রাজা বেঁচে ছিলেন—বেঁচে ছিলেন মানে অন্য-সকলের চেয়ে আলাদাভাবে বেঁচে ছিলেন। জাকজমক ভালোবাসতেন রাজা, লোককে জাকজমক দেখাতে ভালোবাসতেন। কোনো মর্জি হলে তক্ষুনি তা পূর্ণ করা চাই—তার জন্যে যত টাকা লাগে, লাগুক। অদ্ভুত সব পরিকল্পনা খেলতো তার মাথায়-রাজকোষে অঢেল অর্থ না-থাকলে কবেই সেজন্যে তাকে ফতুর হয়ে যেতে হতো কে জানে! একদিন তার মাথায় হঠাৎ একটা অদ্ভুত গাড়ির কথা খেলে গেলো–সেটা নাকি দেখতে হবে হাতির মতো। সঙ্গে সঙ্গে তার একটা কাল্পনিক ছবি এঁকে আমার উপর সেটা বানাবার ভার দিয়ে দিলেন। বানানো হলো ইস্পাতের একটি কাঠামো, হুবহু হাতির মতো দেখতে–তার ভিতরে বয়লার, কলকজা ও ট্র্যাকশন-এঞ্জিনের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বসালুম আমি। হাতির শুঁড়টা ইচ্ছেমতো বোম টিপে ওঠানো-নামানো যায়-সেটা হলো চিমনিপায়ের তলায় চাকা বসানো, আর স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে সেগুলোর যোগ রইলো; চোখে রইলো বৈদ্যুতিক মশালের ব্যবস্থা-বাস, হস্তিগাড়ি বানানো সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। ভেবো

যে চট করে বানাতে পেরেছিলুম আমি—কাজটা অত সহজ নয়; প্রথমত প্ল্যানটা আমার ছিলো না, ছিলো এক খেয়ালি রাজার-তাই তার মর্জিমতো বানাতে গিয়ে নানা মুশকিলে পড়তে হয়েছিলো আমাকে। এই অতিকায় খেলনাটির জন্যে কত রাত যে নিঘুম কেটেছে, তার ঠিক নেই। রাজাও এত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই আমার কারখানায় এসে কাণ্ড দেখতেন। কিন্তু কাজটা একেবারে সম্পূর্ণ হবার আগেই তিনি মারা গেলেন—নিজের আবিষ্কারটা আর ব্যবহার করতে পারলেন না। তার বংশধররা আবার তেমন খেয়ালি নয়, তার উপর কুসংস্কারে ভরা, তারা গাড়িটাকে ভাবলে কোনো পাগলের প্রলাপ, বিভ্রম। তারা গাড়িটাকে বেচে দিতে পারলে বাঁচে। তাই আমি নামমাত্র দামে কর্নেল মানবোর টাকায় এটা কিনে নিলুম। এখন এই রইলো চলন্ত

বাড়ি বা হস্তিগাড়ি তোমাদের তাবে-আশি অশ্বশক্তি এঞ্জিনটার-আশি হস্তিশক্তির কথা না-হয় না-ই তুললাম।

শাবাশ, ব্যাঙ্কস, তুখোড়! বাহবা! হুড তারিফ করে উঠেছিলো, আমাদের মধ্যে এমন-একজন এঞ্জিনিয়ার আছে যে আসলে আবার শিল্পীও-যে আসলে লোহা আর ইস্পাতের কবিই বরং—তা কে জানতো!

রাজার মৃত্যুর পর গাড়িটা যখন আমার অধীনে এলো, তখন কেন যেন হাতিটাকে ধ্বংস করে ফেলার মতো বুকের জোর পাইনি। তাই গাড়িটাকে আমি কোনো সাধারণ চেহারা দিইনি।

ঠিকই করেছো! কী চমৎকার হবে ভাবো তো, হুড সোল্লাসে বলেছিলো, যখন আমাদের হাতি নেপালের জঙ্গলে ধুপ-ধুপ পা ফেলে যাবে—সত্যি, রাজা ছাড়া এমন ভাব কারু মাথায় আসে।

তক্ষুনি আমাদের অভিযানের ছক কেটে ফেলা হয়েছিলো—ঠিক হয়েছিলো পাঁচই মে আমরা ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে।

এই ফাঁকে ব্যাঙ্কসের চলন্ত বাড়ির কলকজার কথা সংক্ষেপে সেরে নিই। তার পেটের মধ্যেই গাড়ির সব যন্ত্রপাতি পোরা হয়েছে—সিলিণ্ডার, পিস্টন, পাম্প, বয়লার-সবকিছু। পিছনের দিকে রয়েছে জল আর জ্বালানি। বয়লার আর জ্বালানি-খুপরির মাঝখানের জায়গাটিতে রয়েছে জ্বালানিকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলার জন্য একটি জ্বালানিবাহী যন্ত্র। বয়লার আর জ্বালানি-খুপরি বসানো সেরা জাতের ইস্পাতের স্পিঙের উপর, যাতে বন্ধুর

রাস্তাতেও তাদের উপর বেশি চোট না-পড়ে। চাকাগুলো নিরেট; যাতে পিছলে না-যায়, সেই জন্যে যথেষ্ট সাবধানে বানানো হয়েছে। এঞ্জিনের ক্ষমতা যদিও স্বাভাবিক ক্ষেত্রে আশি অশ্বশক্তি—কিন্তু প্রয়োজন হলে তাকে বাড়িয়ে দেড়শো অশ্বশক্তিতে নিয়ে গেলেও বিস্ফোরণের বা বয়লার ফেটে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর সব কলকজার বাইরে ইস্পাতের ঢাকনা বসানোযাতে রাস্তার ধুলোবালি ভিতরে ঢুকতে না-পারে।

বাড়িগুলো প্যাগোড়ার মতো দেখতে, মিনার নেই—কিন্তু গম্বুজের গায়ে নানা কাজ করা। সামনে পিছনে প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন শোনগড়ের প্যাগোড়াই হঠাৎ পা গজিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। এই সঙ্গে এ-কথা বলাও ভালো যে এই আশ্চর্য বাড়িটা আবার জলেও ভাসতে পারে। কারণ বাড়িগুলোর নিচের দিক হালকা একটা ইস্পাতের নৌকোর মতো তৈরি—আর হাতির পেটে স্টীমারের যন্ত্রপাতিও ঢোকানো হয়েছে। হাতির পাগুলো যেন স্টীমারের চাকা—; ফলে ভারতের মতো বিচিত্র দেশে বেড়াবার পক্ষে জলে-ডাঙায় সমানভাবে চলে এমনি একটা উভচর গাড়ি পেয়ে আমরা সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। ভূটানের রাজাকে ধন্যবাদ, কারণ কোনো খেয়ালি কবি ছাড়া এমন যানের কথা আর কার মাথায় আসতো? বাংলো দুটি মাত্র আঠারো ফিট প্রশস্ততাই তেমন একটা জায়গা জুড়ে যাবে না। ভিতরটা ইওরোপীয় কেতায় সাজানো; যাতে কারু বিন্দুমাত্র অসুবিধে না-হয়, ব্যাঙ্কস সেদিকে সবসময় সজাগ লক্ষ রেখেছিলো।

কলকাতায় এসে আমি উঠেছিলুম স্পেনসার হোটেলে—সেটাই নাকি কলকাতার সবচেয়ে ভালো হোটেল। পাঁচই মে সকালবেলা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম আমি। ততদিনে

কলকাতা আমার বেশ চেনা হয়ে গেছে। সকালবেলায় বেড়াতে বেরুতুম, সন্ধেবেলায় স্ট্রাণ্ডে গঙ্গার হাওয়া খেতুম—দুপুরবেলাটা অবশ্য গরমে কাহিল হয়ে পড়তে হতো। এসপ্লানেড, গড়ের মাঠ, ফোর্ট উইলিয়াম, গঙ্গার ধারে শ্মশানঘাট, কলকাতার হাটবাজার, হুডার সাহেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বটানিক্যাল গার্ডেন, কালীঘাটের মন্দির, চৌরঙ্গির অদ্ভুত বাড়িগুলো, লাটসাহেবের বাড়ি, টাউন হল, হুগলির ইমামবাড়া, খিদিরপুর ডক–কিছুই আমি দেখতে বাকি রাখিনি!

হোটেল থেকে বেরিয়ে পাল্কিগাড়িতে করে কর্নেল মানরোর বাংলোয় গিয়ে হাজির হয়ে দেখি ক্যাপ্টেন হুডের তুলকালাম ফুর্তির আর শেষ নেই। শেষকালে যে কর্নেল মানররা তার নির্জনবাস ছেড়ে সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছেন, এই আনন্দেই সে আটখানা।

টং করে যাবার ঘণ্টা পড়লো। স্টীম চাপাননা হয়েছে পূর্ণ মাত্রায়। এঞ্জিনচালক বসে আছে তার আসনে, রেগুলেটরে হাত দিয়ে। তীব্র সুরে বাঁশি বেজে উঠলো এঞ্জিনের।

চলো, বেহেমথ, চলো! হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললে ক্যাপ্টেন হুড।

আর সত্যি, বেহেমথ ছাড়া আর কী-ই বা নাম হতে পারে এই আশ্চর্য শকটের। বেহেমথ কথাটা হিব্রু থেকে নেয়া, আর হিব্রুরা শব্দটা ধার করেছে মিশরি পেহেমেউ কথা থেকে, যার মানে হলো অতিকায় জলহস্তী।

আমাদের এঞ্জিনচালকের নাম স্টর; বয়েস ৪০ হবে; স্টর একজন ইংরেজ, কয়েক মাস আগেও সে গ্রেট সাদার্ন রেলপথে কাজ করতো-ব্যাঙ্কস তাকে অত্যন্ত চালাক চতুর ও কর্মঠ দেখেই বেহেমথের চালক হিশেবে নিযুক্ত করেছিলো। ফায়ারম্যানের নাম কালু,

আসলে সাঁওতাল—ধকল আর তাপ সইতে পারে বলে রেল কম্পানিতে তারা ফায়ারম্যানের কাজ পায়, লোহিত সাগরে যেমন আরবরা স্টীমারের কয়লা জোগানোর চাকরি নেয়। তা ছাড়া গৌমি নামে কর্নেল মানরোর এক গুখা ভৃত্য ছিলো। বেঁটে-খাটো, ক্ষিপ্র, চটপটে আর বিশ্বস্ত-আগে গুর্খা রাইফেলসের সেপাই ছিলো— এখনও পলটনি উর্দি গা থেকে নামায়নি;-ম্যাক-নীলের মতো গৌমিও মানরোর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। ক্যাপ্টেন হুডেরও এক বিশ্বস্ত অনুচর ছিলো—ফক্স নামে এক অল্পবয়েসী ইংরেজ, প্রাণখোলা আর চটপটে—সবদিক থেকেই তারুণ্যে ভরপুর। হুডের মতো, সেও খুব ভালো শিকারী—সেই জন্যেই হুডের সে এত ভক্ত। হুডের সঙ্গে অনেকবার শিকারে গেছে সে এ-পর্যন্ত সে বাঘ মেরেছে সাঁইত্রিশটি, আর ইড মেরেছে তার চেয়ে মাত্র তিনটি বেশি। এছাড়া ছিলো একটি নিগ্রো বাবুর্চি-নিকষ নিগ্রো ঠিক নয়, দোআঁশলা, ফরাশি রক্তও আছে তার ধমনীতে-নাম সিয় পারাজার। ভালো রান্না করতে পারে বলে তার গর্বের আর শেষ নেই।

সবমিলিয়ে আমাদের বাহিনীর সদস্য দশজন : সার এডওয়ার্ড মানরো, ব্যাঙ্কস, হুড, আমি—মোক্লের, ম্যাক-নীল, স্টর, কালু, গৌমি, ফক্স আর মঁসিয় পারাজার। ফ্যান আর নাইজার নামের শিকারি কুকুর দুটির কথাও অবিশ্যি উল্লেখ করা উচিত—তাদের যথাযথ স্বীকৃতি না-দিলে হুড আবার রেগে উঠবে।

হুগলি নদীর বাম তীর ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো বেহেমথ। হুগলি গঙ্গার পশ্চিম দিকের শাখা। গঙ্গা আসলে অদ্ভুত নদী : সমস্ত উত্তরাপথের সমৃদ্ধির উৎস সে, কিন্তু হুডের মতে এমন খেয়ালি, বদমেজাজি ও পাগল নদী নাকি খুব কম আছে-কখন যে দিক বদলাবে-কোথায় যে তার নতুন শাখা বেরুবে, তা নাকি কেউ বুঝতে পারে না। আগে নাকি

রাজমহল আর গৌড়-দুই-ই ছিলো গঙ্গার তীরে, অথচ এখন তারা জলের অভাবে নাকি শুকিয়ে মরে।

শুনে বললুম, তাহলে তো কলকাতার কপালেও অনেক দুঃখ আছে!

কে জানে–হুড বললে।

না, না, ব্যাঙ্কস বললে, আজকাল আর ও-সব হবে না। আমরা এঞ্জিনিয়াররা আছি কী করতে-খাল কেটে সর্বত্র জল নিয়ে যাবো!

হুড কিন্তু ততক্ষণে নিজের বিষয় পেড়ে ফেলেছে, বাংলা দেশের নদীর কথা বলতেই আমার সুন্দরবনের কথা মনে পড়ে যায়। আহা, রোদে পিঠ দিয়ে কুমিরগুলো কেমন শুয়ে আছে চড়ায়। আর কী সুন্দর বাঘ : রাজার মতো–তেমনি অহংকারী, উদ্ধত আর মেজাজি!

আমাদের সব কথা হচ্ছিলো চলন্ত বেহেমথের খাবার-ঘরে বসে; ছোটোহাজরি সেরেছি আমরা একটু আগে-ফক্স দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবার টেবিল সাফ করছে তখন।

ফক্স! হুড ডাক দিলে।

বলুন, ক্যাপ্টেন!

সুন্দরবনেই তো তুমি সাঁইত্রিশ নম্বরটাকে মেরেছিলে!

হ্যাঁ ক্যাপ্টেন-ক্যানিং থেকে দু-মাইল দূরে। সেদিন সন্ধেবেলায়–

বাস, বাস্, তাহলেই হবে। সাঁইত্রিশ নম্বরের সব কথাই আমি জানি। তোমার আটত্রিশ নম্বরটির ইতিহাস জানবার জন্যই আমার কৌতূহল জাগছে।

আটত্রিশ নম্বরটি তো এখনও মারিনি, ক্যাপ্টেন?

মারোনি, কিন্তু একদিন মারবে তো। সেদিন আমিও আমার একচল্লিশ নম্বরটিকে শিকার করবো, ফক্স।

লক্ষ করার বিষয় হুড বা ফক্স-কেউ এর মধ্যে একবারও বাঘ কথাটি উচ্চারণ করলে না। দরকারই বা কী? নম্বর দিয়ে বললেই তারা পরস্পরের কথা বুঝে নিতে পারে।

একটা নাগাদ বেহেমথ চন্দননগর পৌঁছুলো। সারা বাংলা দেশে এই জায়গাটাই কেবল ফরাশিদের সম্পত্তি এখন। এককালে খুবই সমৃদ্ধ ছিলো, এখন চারধারে কেবল ক্ষয়েরই চিহ্ন। লোকজনও তেমন নেই। এলাহাবাদের রেলপথ এখান দিয়ে গেলে হয়তো আবার শহরটা একটু জীবন্ত হতো। কিন্তু ফরাশি অঞ্চল বলে রেলপথ পাতা হয়েছে ঘুরিয়ে–চন্দননগরের বাইরে দিয়ে।

আমরা ঠিক চন্দননগরের ভিতরে ঢুকিনি। শহরের তিন মাইল দূরেই আস্তানা গেড়েছিলুম। এর পরে দু-দিন ধরে একটানা চললে আমরা বর্ধমান পৌঁছুবো—তাই এখানে একটু বিশ্রাম করে নেবার পরিকল্পনা ছিলো।

মে মাসের নয় তারিখে বর্ধমানের প্রধান তোরণের কাছে পৌঁছুলুম আমরা; সেই দিনটা বর্ধমানের যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থান দেখে নিয়ে পরদিন রামগড়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়লুম। এই পথ দিয়ে যাবার ফলে আমরা অবশ্য মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের কি পাটনা দেখতে পেলুম না, কিন্তু বারাণসীর উদ্দেশে রায়গড় হয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি পৌঁছুবো বলে আমরা এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম।

পনেরোই মে আমরা রামগড় পেরিয়ে গেলুম-আঠারোই মে ছোেট্ট শহর চিত্রায় থামলো বেহেমথ।

পথে তেমন-কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটেনি। গরম ছিলো প্রচণ্ড, কাজেই ছায়ায়-ছায়ায় দিবানিদ্রার চেয়ে আরামপ্রদ আর কী ছিলো! সন্ধেবেলায় গরম কমলে আমরা সবাই মিলে আড্ডা দিতুম—কেবল কর্নেল মানরো আর সার্জেন্ট ম্যাক-নীল আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেন না–চুপ করে বসে-বসে কী যেন ভাবতেন। হয়তো বেহেমথ ক্রমশ বিদ্রোহের ঘটনাস্থলের দিকে এগুচ্ছে বলেই স্মৃতি জেগে-ওঠার ফলে কর্নেল মানরো অমন গুম মেরে গেছেন। কে জানে!

ফল্গুনদীর তীর্থযাত্রী

এখন যাকে বিহার বলে, আগে তার নাম ছিলো মগধ। বৌদ্ধ ধর্মের উজ্জ্বল দিনে মগধ ছিলো দিব্যভূমি, এখনও বহু মঠ আর বিহার তার সাক্ষী। তারা বানিয়েছিলো বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিহার; দেশবিদেশ থেকে সবাই পড়তে আসতো; জাতপাতের ভেদ ছিলো না। কিন্তু কয়েকশো বছর ধরে বৌদ্ধ শ্রমণদের জায়গা নিয়েছে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ; তারা বানিয়েছে টোল, চতুষ্পাঠী, সেখানে সবাই নয়—অধ্যয়নের অধিকার শুধু ব্রাহ্মণদের। গঙ্গাস্নান, জগন্নাথ মন্দিরের উৎসব, কাশীযাত্রা—এইসব পূণ্যকর্মের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখানেও নানা অনুষ্ঠান হয়।

আমাদের বাষ্পেচলা বাড়ি (ওরফে বেহেমথ) এখন বিহারে এসে পড়েছে। প্রচণ্ড গরম; তপ্ত হাওয়া জানলার বাইরে স্বচ্ছ শিখার মতো কেঁপে কেঁপে ওঠে; কখন আষাঢ় আসবে, সেই স্বপ্নে বুক বেঁধে পড়ে থাকে মাঠঘাটপ্রান্তর, মোহ্যমান মানুষজন।

১৯ শে মে দুপুরবেলায় আমরা চিত্রা শহর ছাড়লুম, আর পরদিন রাত্রে এসে পৌঁছুলুম গয়ার কাছে—সারাদিন দুর্দান্ত গরম গেছে, তাপমান যন্ত্রে ১০৬ ডিগ্রিও পেরিয়ে গিয়েছিলো, তাই আমরা নদীর ধার দেখে ছায়ায়-হাওয়ায় আস্তানা করলুম। নদীটির নাম ফল্গু; গঙ্গার মতো ফল্গু নদীতেও সবসময় পুণ্যার্থীদের ভিড় লেগেই থাকে।

শহর থেকে মাইল দু-এক দূরে গাছপালার ভিড়ের মধ্যে আমাদের বাড়ি দুটো, থুড়ি, গাড়ি দুটো, থামানো হয়েছিলো। সেখানে তারপর সারা দিন বিশ্রাম। পরদিন সকালে

চারটে নাগাদ আমরা গয়া শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লুম-দুপুরবেলার রোদের তাতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই এত ভোরে বেরিয়ে পড়েছিলুম আমরা-আমরা, মানে ব্যাঙ্কস, ক্যাপ্টেন হুড আর আমি। কর্নেল মানরো বেহেমথেই থেকে গেলেন।

গয়া হিন্দুদের খুব নামজাদা তীর্থস্থান; রাস্তায়-ঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড়ে চলার উপায় নেই, সারা বছরই এমনি মারাত্মক ভিড় থাকে এখানে। তবু এরই মধ্যে দিয়ে কোনোমতে পথ করে নিয়ে আমরা গিয়ে একে-একে বোধিম, বিষ্ণুমন্দির ও আবো-সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখে এলুম। লোকজনের ভিড়ে কোনোখানেই তিষ্ঠোবার জো নেই। অবশেষে সব দেখেশুনে আমরা এলুম ফল্গু নদীর তীরে, যেখানে নদীর জলে গয়ার পাথর ধুয়ে যাচ্ছে। সেখানে যা ভিড় তা অবর্ণনীয় : নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, চাষী-জমিদার, শৌখিন বাবু আর গরিব রায়, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, পারিয়া, ব্রাহ্মণ, সবল রাজপুত, কাহিল বাঙালি, জোয়ান পঞ্জাবি আর সুদর্শন সিন্ধি-কেউ পাল্কিতে, কেউ বলদে-টানা গাড়িতে, কেউ উটের পিঠে এসে এখানে হাজির হয়েছে। ভারতের কোনো অঞ্চল বাদ পড়েনি। তাবু ফেলেছে কেউ, কেউ ডালপালা দিয়ে কুটির বানিয়ে নিয়েছে, কেউ-বা তার গাড়ির ভিতরেই আশ্রয় নেবে দরকার হলে।

উঃ, কী ভিড়। হুড বলে উঠলো।

আজ আর ফল্গু নদীর জল খাওয়া যাবে না, ব্যাঙ্কস সব দেখে-শুনে মন্তব্য করলে।

জিগেস করলুম, কেন?

কারণ এর জলকে পবিত্র বলে মনে করে হিন্দুরা—দলে-দলে গিয়ে এরা আজ স্নান করবে; আর কাদা করবে সবখানে, টলটলে জলও ঘোলা করে দেবে; গঙ্গায় যেমন করতো। কলকাতায় দ্যাখোনি?

আমরা কি ভাটির দিকে নাকি? আমাদের ডেরার দিকে আঙুল দেখিয়ে হুড আঁৎকে ওঠার ভঙ্গিতে বললে।

না, না, তার কাচুমাচু ভঙ্গিতে ব্যাঙ্কস হেসে উঠলো, আমরা অনেক উপরে রয়েছি–ঘোলাজল ওখানে পৌঁছুবে কী করে?

এই ভিড়ের মধ্য দিয়েই আমরা অতি কষ্টে এগিয়ে চললুম। ছাই-মাখা সাধু, নগ্ন সন্ন্যাসী, আলখাল্লা-ঢাকা ফকির, ভাং খেয়ে বুদ-হয়ে থাকা ভক্ত-দেখে আমার বিস্ময়ের আর শেষ থাকে না। কোথাও দেখলুম শিবের ভক্তরা তীর দিয়ে হাত-পা বিধছে ক্রমাগত, আর সেই হাত-পা দিয়ে বেরুনো রক্ত জিভ দিয়ে চেটে খাচ্ছে বিষাক্ত সাপেরা। দেখে আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেলো। নিশ্বাস রোধ হয়ে আসে প্রায়। তাড়াহুড়ো করে চলে আসবো, ব্যাঙ্কস আমাকে হাত ধরে থামালে যাচ্ছো কোথায়? পুজোর সময় হলো—দেখে যাই!

তার কথা শেষ হবার আগেই ভিড়ের মধ্যে এক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হলো, ডান হাত তুলে সে বাড়িয়ে ধরলো উদয়সূর্যের দিকে, আর প্রথম আলোকরেখা বেরিয়ে এলো গয়ার মস্ত শিলাতলের উপর থেকে। সেটাই বুঝি সংকেত ছিলো, অমনি দলে-দলে নরনারী পুণ্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। সমবেত মন্ত্রোচ্চারণের কোলাহল উঠলো ফল্গু নদী

থেকে, আর তারই মধ্যে স্নানার্থীরা দিব্য জলে যেন এই মরদেহ ও অমর আত্মা ধুয়ে-মুছে দেবতার সান্নিধ্যের জন্য তৈরি হয়ে নিলে। কারণ জল থেকে উঠেই তারা কৈলাসে যাবে দেবসন্নিধানে।

আমরা আর দেরি না-করে আমাদের আস্তানায় ফিরে এলুম। ছোটোহাজরি তৈরি ছিলো : খাবার টেবিলে বসে আমরা এই কল্পনাতীত দৃশ্যের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে রোদের তেজ বাড়তে লাগলো ক্রমশ, আর চারপাশ যেন এই গরমে ধুকতে লাগলো। যেন আমাদের সব ইন্দ্রিয়কে ভোতা ও নিস্তেজ করে সূর্যের প্রখর রথের চাকা চলে গেলো আমাদের উপর দিয়ে।

সারাদিনে আর-কোনো ঘটনাই ঘটলো না। পরদিন সকালে রওনা হবো বলে ঠিক ছিলো, তাই স্টর, কালু আর গৌমি জ্বালানি আর জলের ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছিলো সন্ধেবেলায়। তারা সব ব্যবস্থা করে ফিরে এলো।

দিনের বেলা আবহাওয়া ছিলো শুকনো, কিন্তু রাতের বেলা ছেড়া-ছেড়া মেঘ ঝুলে রইলো আকাশে, আর্দ্রতা এত বেড়ে গেলো যে ঘেমে-নেয়ে আমাদের কষ্ট যেন শতগুণ বেড়ে গেলো। রাত নটার সময়েই আমরা আচ্ছন্নের মতো গিয়ে শুয়ে পড়লুম—সব কেমন যেন ঝিম ধরা অথচ তবু কিন্তু ঘুম আসছিল না।

হঠাৎ রাত একটা নাগাদ দূরাগত মর্মর শুনতে পেলুম আমি বিছানায় শুয়ে-শুয়ে। ভাবলুম, বুঝি বৃষ্টি হবে, তাই বজ্রবিদ্যুতের আনাগোনা শুরু হলো। কিন্তু তা তো নয়। গাছের একটা পাতাও কাপছে না, সব থম মেরে আছে, হাওয়া মোটেই নেই। উঠে আমি জানলা

দিয়ে বাইরে তাকালুম। অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না—অথচ সেই দূরাগত ধ্বনি তখনও কানে আসছে। ফল্গু নদীর জল শান্ত নিস্তরঙ্গ; আকাশে বজ্রবিদ্যুতের কোনো চিহ্ন নেই। কীসের শব্দ তাহলে এটা? বুঝতে পারলুম না। কিন্তু অবসাদে তখন এমন অবস্থা যে বাইরে বেরিয়ে ভালো করে সন্ধান করার মতো মনোবল নেই। আমি আচ্ছন্নের মতো চুলতে লাগলুম-এবং মাঝে-মাঝে তার ভিতর কেবল সেই রহস্যময় আওয়াজ কানে আসতে লাগলো, আর-কিছুই না।

ঘণ্টা দুয়েক পর অন্ধকার যখন ফিকে হয়ে আসছে, তখন হঠাৎ আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম। বাইরে বারান্দা থেকে কে যেন এঞ্জিনিয়ারকে ভাক দিচ্ছে : মিস্টার ব্যাঙ্কস!

কী চাই?

আপনি দয়া করে একবার বাইরে আসবেন? স্টরের গলা।

আমি গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালুম। কর্নেল মানরো বারান্দাতেই ছিলেন, হডও পরক্ষণে এসে হাজির।

কী ব্যাপার? ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

একবার কেবল তাকিয়ে দেখুন ওদিকে, স্টর বললে।

তখন এতটা আলো হয়েছে যে নদীর পাড় আর সামনের রাস্তা আবছা মতো দেখা যায়। তাকিয়ে দেখি কয়েকশো সাধু-সন্ন্যাসী রাস্তার উপর শুয়ে আছে।

এরা তো কালকের সেই তীর্থযাত্রী দেখছি! হুড বললে।

জিগেস করলুম, কিন্তু এরা এখানে কী করছে?

হয়তো সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করছে-তারপর সূর্যের পুজো করবে আর-কি! বললে হুড।

উঁহু, আমার তা মনে হয় না, বললে ব্যাঙ্কস, তাই যদি উদ্দেশ্য হবে তো গয়া ছেড়ে অ্যাম্বুরে এখানে আসবে কেন? আমার ঘোরতর সন্দেহ হয় যে তারা এখানে এসেছে

বেহেমথকে দেখতে, বাধা দিয়ে বললে হুড, কারণ বেহেমথ যথারীতি তাজ্জব করে দিয়েছে তাদের। তারা হয়ত শুনেছে যে মস্ত একটা হাতি-অতিকায় এক হাতি–এত-বড়ো যে কেউ কোনোদিন অমনটি দ্যাখেনি—এসেছে এখানে, তাই তারা হাতিটাকে তারিফ করতে এসেছে।

ব্যাঙ্কস মাথা নাড়লে, তারিফ করতে এসে থাকলেই সবদিক থেকে মঙ্গল!

কেন? আবার কীসের ভয় জিগেস করলেন মানরো।

হয়তো রাস্তা আটকে বসবে এরা—কে জানে!

যা-ই করো, অতি সাবধানে। খুব হুঁশিয়ার! এ-সব সাধু-সন্ন্যাসীর গায়ে যেন আঁচড়টি নালাগে!

কালু! ব্যাঙ্কস হাঁক পাড়লে, আগুন জ্বেলেছো?

হ্যাঁ, সাহেব!

ভালো করে স্টীম চাপিয়ে দাও।

তখন সাড়ে-তিনটে বাজে। ক্রমশ পুবদিক আলো হয়ে উঠছে। বেহেমথের শুঁড় থেকে পেঁচিয়ে কালো ধোঁয়া উঠছে, মাঝে-মাঝে গর্জন করে উঠছে বেহেমথ। কিন্তু সমবেত জনতা তাকে কিংবদন্তির ঐরাবত বলেই মেনে নিলে। দলে-দলে এগিয়ে আসতে লাগলো তারা সামনে কিছুটা ভয়ে, কিছুটা সম্ভ্রমের সঙ্গে—আর এসে, হাতির পায়ের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে রইলো।

চারটের সময় পুরো স্টীম পাওয়া গেলো, থরথর করে কাঁপতে লাগলো বেহেমথ। ব্যাঙ্কস নিজেই স্টরের সঙ্গে হাওদায় গিয়ে বসলে। সে নিজেই চালাবে বেহেমথকে। বারান্দা থেকে মানরো চেঁচিয়ে উঠলেন, সাবধান, ব্যাঙ্কস; এদের গায়ে যেন আঁচড়টিও না-লাগে।

উত্তরে বেহেমথ তীক্ষ্ণ স্বরে শিটি দিলে, আর তারও উত্তরে সেই বিপুল ভিড় সমস্বরে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠলো।

পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও! ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে বললে। চাকাগুলো অর্ধেক ঘুরে এলো, বেহেমথের শুঁড় দিয়ে এক ঝলক শাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এলো। মুহূর্তে ভিড় দু-ভাগ হয়ে গেলো! বেহেমথ কয়েক পা এগিয়ে গেলো।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলুম, সাবধান ব্যাঙ্কস, দেখে-বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে পেলুম জনা দশ-বারো বিষম ভক্ত রাস্তায় শুয়ে পড়েছে চিৎপাত হয়ে-উদ্দেশ্য এই অতিকায় শকটের চাকার তলায় পিষে-যাওয়া।

মানরা চেঁচিয়ে তাদের বললেন, সরো-সবো, সরে দাঁড়াও!

কী আহাম্মক এগুলো! বেহেমথকে কি এরা জগন্নাথের রথ পেয়েছে যে দেবতার রথের তলায় মরে গিয়ে স্বর্গে যেতে চায়, হুড রেগে উঠলো!

ব্যাঙ্কসের ইঙ্গিতে কালু স্টীম বন্ধ করে দিলে। সেই ভক্তরা যে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠবে কোনো কালে, তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। এদিকে ভিড় তাদের চেঁচিয়ে খুব উৎসাহ দিচ্ছে শুয়ে থাকতে! ব্যাঙ্কস কিরকম বিমূঢ়, লজ্জিত আর অসহায় বোধ করলে।

হঠাৎ কী-একটা ফন্দি খেলে গেলো তার মাথায়। বয়লারের তলায় যে কতগুলো পাইপ ছিলো, তা দিয়ে হুঁশহুঁশ করে স্টীম ছেড়ে দিলে সে তাদের লক্ষ্য করে, আর সেই সঙ্গে বাঁশির তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ বারেবারে জনতার কোলাহল চিরে দিলে।

এটাই কিন্তু কাজে লাগলো। গরম বাষ্প পিচকিরির মতো গায়ে পড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো তারা চাচাতে-চাচাতে। রথের তলায় চাপা পড়তে কোনো ভয় নেই তাদের, কিন্তু এ-রকমভাবে মিছেমিছি ঝলশে আধপোড়া হয়ে যেতে চায়নি তো তারা।

ভিড় সরে দাঁড়ালো, বেহেমথ এগিয়ে গেলো কয়েক পা, তারপর রাস্তা ফাঁকা দেখে বাষ্পের মেঝের মধ্য দিয়ে সেই স্তম্ভিত জনতার চোখের সামনে থেকে বেহেমথ কোন দূরে মিলিয়ে গেলো।

বারাণসীতে কয়েক ঘন্টা

এখন কেবল খোলা বড়ো রাস্তা পড়ে আছে আমাদের চলন্ত বাড়ির সামনে; সাসারাম হয়ে গঙ্গার ডান তীর ধরে একেবারে বারাণসী পর্যন্ত নিয়ে যাবে আমাদের এই রাস্তা। রোটাসের কাছে পেরিয়ে এলুম শোন নদী—আরা আর দিনাজপুরের কাছে এসে সব শাখা নিয়ে যে গঙ্গায় এসে মিশেছে। গাজিপুরের গোলাপবন, মুঘলসরাইয়ের রেলপথ, পঁয়ত্রিশ মাইল দূরের গোমতীর অধিত্যকার জৌনপুর—সব পেরিয়ে এলো বেহেমথ।

বারাণসী গঙ্গার বাম তীরে; এখানে নয়, এলাহাবাদে আমাদের গঙ্গা পেরুতে হবে। বাইশে মে রাত্রে বেহেমথ গঙ্গার তীরে শিবির ফেলেছিলো, তেইশে সকালবেলায় ঠিক ছিলো—আমরা বারাণসী দেখতে যাবো। তীরে অনেকগুলো নৌকো নোঙর-করা, ঠিক ছিলো এরাই আমাদের নিয়ে যাবে।

এ-সব জায়গায় আগে অনেকবার ঘুরেছেন কর্নেল মানরো, তাই তার আর দেখার কিছু ছিলো না; তবু প্রথমে তিনি ঠিক করেছিলেন আমাদের সঙ্গেই প্রাচীন শহরে বেড়াতে যাবেন, কিন্তু পরে ম্যাক-নীলকে নিয়ে গঙ্গার তীর ধরেই বেড়াতে যাবেন বলে ঠিক করলেন। হুড আগে কিছুদিন বারাণসীতে ছিলো, এই সুযোগে সে তার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলো। ফলে আমি আর ব্যাঙ্কসই কেবল বারাণসীর ঘিঞ্জিগলি, বিপুলবপু ধর্মের ষাঁড়, জীর্ণ মন্দির আর বিখ্যাত ঘাটগুলো দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লুম।

অন্য-সব প্রধান নগরের মতো বারাণসীতেও ১৮৫৭ সালে বিক্ষোভের আগুন জ্বলেছিলো, আর সেই বিদ্রোহ কেমন করে কর্নেল মানরো ও ম্যাক-নীল কঠোর ও নির্দয়ভাবে দমন করেছিলেন, নৌকোয় বসে-বসে সেই কাহিনীই আমাকে শোনাচ্ছিলো ব্যাঙ্কস। হয়তো কর্নেল মানরো বিক্ষোভের কোনো চিহ্নমাত্র দেখতে চান না বলেই শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন না, ব্যাঙ্কস তার ধারণা ব্যক্ত করলে।

আমাদের নৌকো তখন ধীরে ভেসে চলেছে, আর বাম তীরে বারাণসী তার জীর্ণ গোল গম্বুজ, শ্যাওলাজমা প্রাসাদ, ত্রিশূল-বসানো মন্দির আর স্নানার্থী-ভিড়-করা ঘাট সমেত উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। এই প্রথমবার কাশী দেখতে যাচ্ছো তুমি, ব্যাঙ্কস বললে, কিন্তু আশা কোরো না যে এই পুরোনো শহরটিতে তিনশো বছরের পুরোনো স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখতে পাবে। কিংবা পাবে শুধুমাত্র নিদর্শনই। কিন্তু তাতে অবাক হয়ো না। কতবার যে আগুন আর তরবারি খেলা করেছে এই শহরে, তার ইয়ত্তা নেই। বিদেশীরা লুঠতরাজ করেছে, আগুন জ্বালিয়ে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। কিন্তু তাহলেও কাশী তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেকবে, বলে রাখলুম। এ-রকম শহর তুমি আগে কখনও দ্যাখোনি।

নাপোলির নীল জলের মতো জল এখানকার। দূরে, নৌকো থেকেই তাকিয়ে দেখলুম, অদ্ভুত-সব বাড়িঘর জলের উপর ঝুঁকে আছে, একেবারে জলের থেকে উঠে গেছে কতগুলো বাড়ির সিঁড়ি। দেখতে পেলুম চৈনিক ধরনে নির্মিত একটি ভাঙাচোরা বুদ্ধমন্দির-গম্বুজ, বুরুজ আর মিনার-বসানো; দেখতে পেলুম মসজিদ আর মন্দির–মন্দিরের চুড়োয় শিবলিঙ্গ বসানো, মসজিদের গম্বুজে আরব্য লতাপাতার কাজ। ঘাটেঘাটে স্নানার্থীর ভিড় : অনেকটা যেন ফল্গু নদীর স্নানের দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি।

অবশেষে আমাদের নৌকো মণিকর্ণিকা ঘাটে এসে থামলো। ঘাটের পাশে কত জ্বলন্ত চিতা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে; সেই চিতার আগুন আর ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে সন্তর্পণে এসে আমরা শহরে পা দিলুম।

সারাটা দিনই কেটে গেলো শহর দেখতে। দেখলুম শহরের বিরাট স্তম্ভ ও স্মৃতিমন্দিরগুলি, আরব্য বাজারের মতো অন্ধকার-ভরা ঘিঞ্জি দোকানবাড়ির সারি; সূক্ষ্ম মশলিন, রেশমি কিংখাব, জরি-করা রেশমি বসন— এই সবই এখানে সবচেয়ে বেশি বেচাকেনা হয়; রাস্তাগুলি ঘিঞ্জি, আর দিনের বেলাতেও অন্ধকার—ধর্মের ষাঁড় ছাড়া কোনোদিন যে সূর্যের আলো এখানে এসে ঢোকে তা মনে হয় না। আর তারই মধ্যে দিয়ে বেহারারা হুম-হুম করে আমাদের পাল্কি বয়ে নিয়ে চললো। এই গরমে আমাদেরই কষ্ট হচ্ছিলো, কিন্তু তাদের মুখে কোনো নালিশ নেই। তা তারা না-হয় পাল্কি বওয়ার জন্যে টাকা পাবে, কিন্তু যে-বাঙালিটি সেই থেকে ফেউয়ের মতো আমাদের পাছু নিয়েছে, তার ধূর্ত ও তীক্ষ্ণ চোখে আর যা-ই থাক, অর্থলাভের কোনো আশা নেই। সে কেন এমনভাবে অনুসরণ করছে . আমাদের? মণিকর্ণিকা ঘাটে যখন নামি, তখন আমি ব্যাঙ্কসের সঙ্গে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছিলুম, আর সেই সময় আমি হঠাৎ জোরে কর্নেল মানরোর নাম বলে ফেলি। এই বাঙালি লোকটা তখন ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলো–হঠাৎ মানরোর নাম শুনে সে যেন চমকে ওঠে। তখন আমি সেদিকে তেমন নজর দিইনি, কিন্তু এখন এই পাছু-নেয়া টিকটিকিটিকে দেখতে-দেখতে সেই কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেলো। কে সে? আমাদের বন্ধু, না শত্রু? জানি না। শুধু এটুকু জানি মানরোর নাম শুনেই সে আমাদের পাছু নিয়েছে। আর তাইতেই মনে হয় সে আদৌ আমাদের বন্ধু নয়, দুশমন।

আমাদের পাল্কি তখন ঔরঙজীবের সেই মসজিদের কাছে গিয়ে থেমেছে–আগে এখানে নাকি ছিলো এক বিষ্ণুমন্দির, কিন্তু ঔরঙজীব সেই মন্দিরের ধ্বংসস্তূপেই তার এই বিরাট মসজিদ রচনা করেছিলেন। মিনারের উপরে কাউকে উঠতে দেয়া হয় না, কারণ এর মধ্যেই দুটি মিনার পিসার স্তম্ভের মতো হেলে পড়েছে—কোনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা না-থাকলে যে-কোনো দিন ধ্বসে পড়তে পারে।

মসজিদের ভিতর থেকে বেরিয়েই আবার দেখি সেই বাঙালিটি বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিলে। কিন্তু সন্দেহ আরো পাকা হবার আগে আমি ব্যাঙ্কসকে এ-বিষয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম না।

বিশ্বেশ্বর মন্দির, মণিকর্ণিকা ঘাট, আকবরের তৈরি সেই বিখ্যাত মানমন্দির, বানরবহুল দুর্গাকুণ্ড—সব দেখে যখন আবার আমরা নৌকোয় উঠতে যাবে, তখন আবার দেখি সেই বাঙালিটি আমাদের পিছু-পিছু আসছে। সেও কি নৌকোয় করে ওপারে . যাবে নাকি? কোথায় আমাদের শিবির, তা-ই কি সে দেখতে চায়। ব্যাপারটা তো বড় গোলমেলে ঠেকছে।

ফিশফিশ করে বললুম, ব্যাঙ্কস, ও-লোকটা নিশ্চয়ই একটা টিকটিকি। সারা রাস্ত লোকটা শুধু আমাদের পিছু-পিছু এসেছে।

ব্যাঙ্কস বললে, আমিও তাকে লক্ষ করেছি; তুমি কর্নেলের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা যে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিলো তা আমার নজর এড়ায়নি।

কিন্তু তাকে এড়াবার–

না, এ-সম্বন্ধে আমাদের কিছুই করার নেই। বরং আমরা যে তাকে সন্দেহ করেছি তা যেন ও জানতে না-পারে—আর তাছাড়া লোকটা তো এইমাত্র উধাও হয়ে গেলো।

ওই বাঙালিটির ছোট্ট ডিঙিটা ততক্ষণে সত্যি গঙ্গার অত নৌকো ও বজরার আড়ালে মিলিয়ে গিয়েছিলো। ব্যাঙ্কস আমাদের নৌকোর মাঝির দিকে ফিরলে; উদাসীনতার ভান করে বললে, ওই লোকটাকে তুমি চেনো?

না তো, এই তাকে প্রথম দেখতে পেলাম আমাদের মাঝি বললে।

রাত নেমে এলো আস্তে-আস্তে। নানা রঙের লণ্ঠন-জ্বলা নৌকোর সারি; মাঝিদের গলায় গান; বাম তীরে ঝলমল করে উঠলো হাউই, আতশবাজি ও রংমশাল : সব মিলিয়ে যেন স্বপ্নের মতো মনে হলো বারাণসীর গঙ্গাকে। এই আশ্চর্য রঙের ঝরনা ক্ষণিকের জন্যে আলো করে তোলে কালো আকাশ, তারপর আবার অন্ধকার ছড়িয়ে যায় সবখানে।

শিবিরে ফিরে এসে দেখি কর্নেল মানরো আর সার্জেন্ট ম্যাক-নীল ততক্ষণে ফিরে এসেছেন। ব্যাঙ্কস ম্যাক-নীলকে জিগেস করলে তাদের অনুপস্থিতির সময় বিশেষ-কিছু হয়েছে কিনা।

না তো, উত্তর দিলে ম্যাক-নীল।

কোনো সন্দেহ-জাগানো লোককে আশপাশে ঘুরঘুর করতে দ্যাখোনি এখানে?

না। কেন, আপনি কি কোনো-কিছু আশঙ্কা করছেন নাকি

বারাণসীতে একটা লোক আমাদের পিছন নিয়েছিলো, বললে ব্যাঙ্কস, লোকটাকে দেখে আমার মোটেই ভালো লাগেনি।

টিকটিকি? কোথাকার লোক সে?

লোকটা বাঙালি। কর্নেল মানরোর নাম শুনেই লোকটা আমাদের পাছু নেয়–

আমাদের সঙ্গে তার আবার কী দরকার? কী চায় সে?

জানি না, ম্যাক-নীল। তবে আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। কড়া নজর রাখতে হবে আশপাশে।

হুঁ! ম্যাক-নীল বললে, তাহলে তা-ই করবো।

এলাহাবাদ

বারাণসী থেকে এলাহাবাদের দূরত্ব বড়জোর আশি মাইল। চব্বিশে সকালেই আমরা এলাহাবাদের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়লুম, ঘণ্টায় তিন-চার মাইল মাত্র বেগে, অর্থাৎ বেহেমথ যথার্থই গজেন্দ্রগমনে চলছিলো তখন। আসলে কলকাতায় আমাদের দিন যেমন কাটতো, এই চলন্ত বাড়িতেও তেমনিই কাটছে : ছোটোহাজরি, মধ্যাহ্নভোজ, দিবাতন্দ্রা, সান্ধ্যভোজ—সবই একইভাবে হচ্ছিলো নিত্য, কেবল দিগন্ত বদলে যাচ্ছিলো। তার মধ্যে; দৈনন্দিন কাজ ছিলো রোজই একরকম, শুধু পারিপার্শ্বিক কেবলই বদলেবদলে যাচ্ছে।

কাশিম-সুলেমানের সমাধিস্তম্ভ, চুনার দুর্গ, মির্জাপুর সব পেরিয়ে আমরা যখন যমুনা ও গঙ্গার সংগমস্থলে এসে পৌঁছলুম তখন ২৫ শে মে সন্ধে সাতটা। নদী পেরুতে অবশ্য খুব অসুবিধে হলো, সারি-সারি নৌকো দিয়ে ভাসা সেতু চলে গেছে এপারওপার, টিকিয়ে-টিকিয়ে তারই উপর দিয়ে চলে এলো বেহেমথ : এলাহাবাদে আর নাঢুকে আমরা শহরতলিতেই সে-রাতটা কাটিয়ে দেবো স্থির করলুম।

পরের দিন আমরা সবাই বেরুলুম শহর দেখতে। ঠিক ছিলো এলাহাবাদ থেকেই আমরা উত্তরমুখো এগুবো নাকবরাবর। কানপুর-লক্ষ্ণৌ যাতে পথে না-পড়ে, মানরো যাতে কিছুতেই অস্বস্তিতে না-পড়েন, সেদিকে আমরা লক্ষ রাখবার চেষ্টা করছিলুম।

বিখ্যাত খশরুবাগ আর আকবরের প্রকাণ্ড কেল্লাটা ছাড়া এলাহাবাদে সেই অর্থে বিশেষ কিছু দেখার ছিলো না, যদিও তার ভূদৃশ্য ছিলো অতীব সুন্দর। বেড়াতে বেরিয়ে আমি

আর ব্যাঙ্কস এবার প্রথম থেকেই সাবধানে লক্ষ করছিলুম কেউ আমাদের অনুসরণ করছে কিনা। কিন্তু না, এখানে সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়লো না।

আমরা আলাদা-আলাদা দলে বেরিয়েছিলুম। আগের মতোই আমি আর ব্যাঙ্কস গিয়েছিলুম শহর দর্শনে, মানরো আর ম্যাক-নীল আশপাশে ঘুরে বেড়াতে, আর হুড গিয়েছিলো ক্যানটনমেন্টে তার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে এসে দেখি মানরো আগেই ফিরে এসে আমাদের অপেক্ষা করছেন। তার চোখের তারা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, যেন কোনো বিষম প্রতিজ্ঞায় জ্বলে উঠেছে। হঠাৎ কী-যে হলো আমরা কিছুই বুঝতে পারলুম না। ম্যাক-নীল তখনও ফেরেনি; মানরো তাকে নাকি কোথায় জরুরি কাজে পাঠিয়েছেন। কাজেই কিছু যে জিগেস করে জানবো, তারও উপায় ছিলো না।

খাবার টেবিলে মানরো সাধারণত দু-চারটে কথা বলতেন। কিন্তু আজ তিনি রইলেন অস্বাভাবিক গম্ভীর। বোঝা গেলো তিনি ম্যাক-নীলের প্রতীক্ষ করছেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে না-পেরে হুড জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের দিকে তাকালে; কিন্তু আমরা কীই বা জানি যে বলবো।

অস্বাভাবিক স্তব্ধতার মধ্যে আমাদের সান্ধ্যভোজ শেষ হলো; তারপর হঠাৎ মানরো বলে উঠলেন, ব্যাঙ্কস, হুড-আর আপনিও মঁসিয় মোক্লের-দয়া করে আমার সঙ্গে একটু ক্যান্টনমেন্ট অব্দি যাবেন?

তক্ষুনি আমরা তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। খানিক দূর যাবার পর হঠাৎ মানরো। রাস্তার পাশে একটা থামের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। থামটার গায়ে একটা সরকারি ফতোয়া আঁটা।

এটা পড়ে দ্যাখো-মানরো বললেন।

ফতোয়াটা আসলে দু-মাস আগের সেই বিজ্ঞপ্তি, যাতে বম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজ্যপাল নানাসাহেবের মাথার মূল্য নির্ধারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়েছিলেন নানাসাহেব নাকি বম্বাইতে হাজির হয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিটা দেখে ব্যাঙ্কস আর হুড তাদের হতাশা চাপতে পারলে না। এই দু-মাস তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে খবরটা চেপে রাখার, কিন্তু কে জানতো যে হঠাৎ তা এমনিভাবে খোদ মানরোরই চোখে পড়ে যাবে।

ব্যাঙ্কস, সার এডওয়ার্ড বললেন, তুমি এই বিজ্ঞপ্তিটার কথা জানতে?

ব্যাঙ্কস কোনো কথা বললে না।

দু-মাস আগেই তুমি জানতে পেরেছিলে যে নানাসাহেব বম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এসে হাজির হয়েছে, অথচ আমাকে সে-কথা একবারও বললানি!

ব্যাঙ্কস ভেবে পেলে না এ-কথার উত্তরে কী বলা যায়।

হুড বললে, জানতুম কর্নেল, যে এমন একটা বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। কিন্তু আপনাকে সে-কথা বললে কী হত? নানাসাহেব যে সত্যি-সত্যি বম্বাই এসেছে, তা আপনি জানতেন কী করে? মাঝখান থেকে আপনার মনে কষ্ট দিয়ে কী লাভ হতো?

ব্যাঙ্কস, মানবোর মুখ যেন মুহূর্তে মন্ত্রবলে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, নানাসাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার অধিকার যে কেবল আমারই আছে, এ-কথা কি তুমি ভুলে গেছো? আমি যে কলকাতা ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে বেরিয়েছি তা তো কেবল এইজন্যই যে নেপালের কাছাকাছি যেতে পারবো{ নানাসাহেব মারা গেছে, এ-কথায় আমার মোটেই কোনোদিন বিশ্বাস হয়নি। তার মৃত্যুর খবরটা সত্যি না মিথ্যে, তা আমি নিজে যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলুম!

ব্যাঙ্কস এতক্ষণে মুখ খুললে। আপনাকে কেন ও-কথা বলিনি, জানেন সার এডওয়ার্ড? নানাসাহেব যে বম্বাই এসেছে এ-কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করিনি।

কর্নেল মানরো এ-কথা শুনে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আমি ম্যাক-নীলকে এলাহাবাদের গবর্নরের কাছে পাঠিয়েছি এ-সম্বন্ধে সব তথ্য জোগাড় করে আনার জন্যে 1 নানাসাহেব সত্যি বম্বাই এসেছে কি না, তা আমরা এক্ষুনি জানতে পাবো।

ধরুন যদি জানা গেলো যে সত্যি সে বম্বাই এসে হাজির হয়েছে, তখন? তখন আপনি কী করবেন? ব্যাঙ্কস উৎকণ্ঠায় ভরে গিয়ে জিগেস করলে।

তাহলে এক্ষুনি আমি বম্বাই চলে যাবো।

এই আপনার স্থির সিদ্ধান্ত? কিছুতেই নড়চড় হবে না?

কিছুতেই না। তোমরা বরং আমাকে ছাড়াই বেহেমথকে নিয়ে এগোও–আমি আজ রাতেই বম্বাইয়ের ট্রেন ধরবো।

কিন্তু একা নয়, কর্নেল। আমরাও আপনার সঙ্গে থাকবে। ব্যাঙ্কস বলে উঠলো।

নিশ্চয়ই—আমরা আপনাকে একা যেতে দেবো না, কর্নেল, হুড জানালে।

কর্নেল মানরো, আমি বললুম, আপনি আমাকেও বন্ধু হিশেবে সঙ্গে নেবেন তো?

নিশ্চয়ই, মঁসিয় মোক্লের। আজ রাতেই আমরা সবাই মিলে এলাহাবাদ ছাড়বো-, ব্যাঙ্কস আমাকে জানালে।

তার আর দরকার হবে না, পিছনে কার গম্ভীর গলা শোনা গেলো।

সবাই এক সঙ্গে পিছন ফিরে তাকালাম। দেখি সার্জেন্ট ম্যাক-নীল হাতে একটা খবর-কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই যে, এটা পড়ে দেখুন, মানরোর দিকে কাগজটা বাড়িয়ে ধরলো সে, আপনাকে এটা দেখাতে বললেন গবর্নর।

সার এডওয়ার্ড পড়ে শোনালেন : বম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজ্যপাল এতদ্বারা ৬ই মার্চের বিজ্ঞপ্তিটি খারিজ করিয়া জানাইতেছেন যে গতকল্য সাতপুরা পর্বতে ইংরেজ বাহিনীর সহিত একটি ক্ষুদ্র কিন্তু প্রচণ্ড সংঘর্ষে ধুন্ধুপ ওরফে নানাসাহেব নিহত হইয়াছেন। লক্ষ্ণৌ এবং কানপুরের বাসিন্দারা মৃতদেহটি শনাক্ত করিয়াছে। মৃতদেহের বাম হাতের একটি

অঙ্গুলি ছিন্ন : নকল অন্ত্যেষ্টির সময় উহা কর্তিত হইয়াছিল। এ-বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নাই যে নানাসাহেবের নিকট হইতে ইংরেজদের আর-কোনো ভয় নাই।

পড়তে-পড়তে মানরোর গলা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেলো। কাগজটা তার হাত থেকে খসে পড়ে গেলো। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম। নানাসাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে আর-কোনো সংশয়ই নেই।

মানরো একটু চুপ করে থেকে শেষটায় গম্ভীরভাবে ব্যাঙ্কসকে বললেন, উত্তরে যাবার আগে একবার কানপুর হয়ে যাওয়া যায় না।

আপনি কানপুর যেতে চান?

হ্যাঁ, শেষবারের মতো কানপুর হয়ে যেতে চাই আমি, তারপর উত্তরদিকে যাবো আমরা-উত্তরদিকে।

কানপুর পেরিয়ে

একদা অযযাধ্যা ছিলো ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রদেশগুলির অন্যতম; এখন তার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ কমেছে বটে, কিন্তু সমৃদ্ধি রয়েছে আগের মতোই। জেনারেল উট্রামের চক্রান্তের ফলে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ শেষ পর্যন্ত যখন ১৮৫৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন, তখন থেকেই বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিলো। তাই কয়েকমাস পরেই লক্ষ্ণৌ আর কানপুর প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়েছিলো। লক্ষ্ণৌ অযোধ্যার রাজধানী, কিন্তু কানপুর এই প্রাচীন রাজ্যের একটি প্রধান নগর।

বিপুল নীলখেত পেরিয়ে গঙ্গার ডান তীর ধরে আমরা কানপুর পৌঁছলুম ২৯শে মে সকালবেলায়। কানপুরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার, আয়তন মাইল পাঁচেক। শহরে একটি সামরিক ক্যানটনমেন্ট আছে—প্রায় সাত হাজার লোক থাকে সেখানে। কানপুর অত্যন্ত পুরোনো শহর হলে কী হবে, সেই অর্থে কোনো দ্রষ্টব্য স্থান এখানে নেই। তবু তিরিশে মে সকালবেলায় আমরা আমাদের শিবির ছেড়ে শহরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম : ব্যাঙ্কস, ক্যাপ্টেন হুড আর আমি, আর তদুপরি সঙ্গে রয়েছেন সার এডওয়ার্ড মানরো ও সার্জেন্ট ম্যাক-নীল।

আর যেতে-যেতেই ব্যাঙ্কস আমাকে কানপুরের বিক্ষোভের কথা শোনালে। কেমন করে মিরাট আর দিল্লির বিদ্রোহের কথা পৌঁছুতেই কানপুর বারুদের মতো ফেটে পড়লো, কেমন করে কানপুরের দীর্ঘ অসন্তোষ ও রোষ বিদেশীদের বিন্দুমাত্র ক্ষমা করেনি, কেমন করে বিবিঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো নারী ও শিশুদের—যাদের মধ্যে একজন

ছিলেন লেডি মানরো ও তার মা, আর কেমন করেই বা জেনারেল হ্যাভলকের বাহিনীর আগমন-সংবাদ পেয়ে বিবিঘরের বন্দীদের উপর নতুন করে নিগ্রহ ও অত্যাচার শুরু হয়। রক্ত-রাঙা সে-সব দিন; শুনতে-শুনতে যেন অনুভব করলুম নিয়তির কোনো রক্তরাঙা সংকেত বিপদ জ্ঞাপন করে ভেসে উঠলো আমার সামনে। ব্যাঙ্কস আরো বলেছিলো যে কর্নেল মানরো যখন দু-দিন পরে কানপুর পৌঁছুলেন তখন কোনোই চিহ্ন দেখলেন না তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ির। আর তারপর থেকেই মানুষটা যেন কেমন হয়ে গেলেন, নানাসাহেবের উপর প্রতিশোধ নেয়া ছাড়া আর-কোনো কাজই যেন তার করার রইলো না।

এই কানপুরে পৌঁছেই মানবরা প্রথমে গেলেন তাঁদের বাংলোবাড়ির দিকে, যেবাড়িতে লেডি মানরো তার শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছেন একদা, সে-বাড়িতেই বিক্ষোভের সময় সেই প্রবল ভীষণ রণরোলের মধ্যে অস্বস্তিতে ও আশঙ্কায় তিনি দিন কাটিয়েছিলেন। শহরতলির ধারেই এই বাড়িটা, ক্যানটনমেন্টের খুব কাছে। কিন্তু এখন ভাঙাচোরা ইটকাঠ ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে; সমস্তই জীর্ণ, পরিত্যক্ত ও বিমর্ষ–যেন একটা হানাবাড়ি; আগাছা গজিয়েছে চারপাশে, দেখাশোনা না-করার ফলে সমস্তটাই যেন কোনো চিরস্থায়ী দুঃখের প্রতিভাস এনে দেয়। আর এই ভগ্নস্তূপের মধ্যেই মানরো নীরবে ঘুরে-ঘুরে বেড়ালেন ঘণ্টাখানেক, যেন হারানো দিনগুলো আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছেন তিনি বারে-বারে, কিন্তু তাঁর হাত এড়িয়ে সেগুলো যেন বারে-বারেই পালিয়ে যাচ্ছে। শেষটায় যেন এক হ্যাচকা টানে নিজেকে তিনি ছিনিয়ে আনলেন সেই স্মৃতিজাগা ভাঙাচোরার মধ্য থেকে, দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন বিবিঘরের দিকে—যেখানে, শোনা যায়, লেডি মানরোকে নাকি শেষ দেখা গিয়েছিলো। আর সেইখানে শোকে ও বেদনায় মোহ্যমান ও আর্ত মানুষটির মুখে যেন সান্ত্বনাহীন কোনো আকুলতা ফুটে উঠলো। শেষটায় আমরা অনেক

চেষ্টার পরে সার এডওয়ার্ডকে ওই ভয়ংকর জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলুম। কিন্তু তার আগে একবার একটা বড় পাথরের গায়ে আমার চোখ পড়লো, কে যেন সঙিনের খোঁচায় সেই পাথরের গায়ে ছোট্ট কিন্তু অগ্নিগর্ভ একটি কথা খোদাই করে গেছে; সারা রাস্তা এই কথাগুলো আমার মনে হানা দিলে : কানপুর মনে রেখো।

শিবিরে যখন ফিরে এলুম, তখন এগারোটা বাজে। সবাই কী-রকম স্তব্ধ হয়ে আছে, যেন একটা চাপা শোকের ছায়া সকলেরই মুখে। তাড়াতাড়ি এখন কানপুর ছাড়তে পারলে যেন বেঁচে যায় সবাই। কিন্তু বেহেমথের এঞ্জিনের দু-একটা ছোটোখাটো মেরামতির কাজ বাকি ছিলো, সেগুলো সারতে-সারতে একদিন লেগে যাবে। ফলে বাকি দিনটুকু আমার আর কিছুই করণীয় ছিলো না, সেইজন্যেই আমি ঠিক করলুম একাই গিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে ঘুরে আসবো। কারণ ব্যাঙ্কস ঠিক করেছিলো কিছুতেই আর লক্ষ্ণৌ হয়ে যাবে না—সেখানে গেলে সার এডওয়ার্ড মানরো হয়তো আরো-বিমর্ষ হয়ে পড়বেন বিদ্রোহের যাবতীয় স্মৃতি দেখে।

দুপুরবেলায় একটি লোকাল ট্রেন ধরে আমি অযোধ্যার এই রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়লুম। সপ্তদশ শতকের সব স্থাপত্য, হিন্দু, চৈনিক, আরব্য ও ইওরোপীয় স্থাপত্যের মিশোলই লক্ষ করা যায় প্রধানত। কাইজারবাগ, ফরিদাবাগ, সেকেন্দ্রাবাদ, হজরত গাউজের বুলভার, কৈফিয়াতুল্লার কেল্লা-এইসব বিখ্যাত জায়গাগুলো সরেজমিন দেখে আমি কানপুর ফিরে এলুম।

পরদিন ৩১শে মে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো।

অবশেষে, বললে ক্যাপ্টেন হুড, সত্যিকার যাত্রা শুরু হলো আমাদের–এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ তো নিছকই কেবল ফাঁকা আওয়াজ-আসল মজা তো জঙ্গলে, সেখানে বাঘ-সিংহ-হাতি-গণ্ডার-গণ্ডায় গণ্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছে...

ওর কথায় কান দিয়ো না, মোক্লের, ব্যাঙ্কস বললে, উত্তর-পশ্চিমে আরো কতগুলো খুব নামজাদা শহর আছে—দিল্লি, আগ্রা, লাহোর....

ও-সব ছোটো-ছোটো খুপরিগুলো আবার নামজাদা হলো কবে থেকে? হুড বলে উঠলো, আসল জায়গা তো নেপালের জঙ্গল, ভয়ংকর তরাই-এ-সব। অন্তত আমার মতে তো আজকেই আমাদের সত্যিকার যাত্রা শুরু হলো। বলে, সে চেঁচিয়ে হাঁক পাড়লে, ফক্স!

এই-যে, ক্যাপ্টেন! ফক্স এসে হাজির হলো।

ফক্স! সব বন্দুক, রাইফেল, রিভলভারগুলো সাফসুফ করে রেখে দাও, যাতে ঘোড়া টিপলেই গুলি বেরোয়!

তৈরিই তো আছে সব-টোটাভরা, গুলিভরা, তেল-দেয়া...

সব তৈরি?

সব।

সব আরো-তৈরি করে রাখো তাহলে।

তা-ই করবো তাহলে!

ভেবো না, ফক্স! শিগগিরই তোমার ওই অসমাপ্ত উজ্জ্বল তালিকায় আটতিরিশ নম্বরটি যোগ হয়ে যাবে।

আটতিরিশ নম্বর! হঠাৎ ফক্সের চোখের তারা আলো হয়ে উঠলো। তার জন্যে আমি যে-ছোট্ট গোলাটা তুলে রেখেছি, সে-সম্বন্ধে তার নালিশ করার কিছুই থাকবে না।

যাক। সব ঠিকঠাক করে রাখো!

ফক্স একেবারে গোড়ালি ঠুকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে চলে গেলো আবার তার বন্দুকের ঘরে!

অযোধ্যা আর রোহিলখণ্ডের পশ্চিম দিয়েই নেপালের উদ্দেশে যাচ্ছিলুম আমরা; পথে নদীনালা বর্জন করার জন্যে একটু ঘুরতে হবে বটে, কিন্তু তাতে বেহেমথের জ্বালানি জোগাড় করার অনেক সুবিধে হবে—কারণ এদিকটায় বন-জঙ্গল নেহাৎ কম নেই।

এখানে বলা ভালো যে কানপুর ছাড়ার পর থেকেই কর্নেল মানবরা আবার অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন; আগের মতোই কথা বলেন খাবার টেবিলে, আমাদের আড্ডা ও তর্কাতর্কিতে যোগ দেন—অথচ এটাও ঠিক যে ভিতরে ভিতরে নেপালের অরণ্যদেশ তাকে যেন চুম্বকের মত টানছিলো। মাঝে-মাঝে আমার বিষম সন্দেহ হতে নানাসাহেবের নিধনসংবাদ তিনি মোটেই বুঝি বিশ্বাস করেননি; অবশ্য এ-সম্বন্ধে তিনি কিছু মুখ ফুটে বলতেন না বলে আমরাও কোনো উচ্চবাচ্য করতুম না।

জুন মাসের তিন তারিখে আচমকা ভীষণ গরম পড়লো; এমন অসহ্য গরম এর আগে কিন্তু কখনোই পড়েনি। রাস্তার দু-ধারে যদি মস্ত-সব গাছপালা মাঝে-মাঝে ছায়া না-ছড়িয়ে দিতো, তাহলে সেই হাওয়াহীন লু-বওয়া গরমে আমরা বোধহয় জ্যান্তই ঝলসে যেতুম। হয়তো এত গরম বলেই জন্তুজানোয়াররা এমনকী রাত্তিরেও তাদের ডেরা ছেড়ে বেরোয় না—অন্তত কোনো শিকার না-পেয়ে হুড গজগজ করে যা বললে, তার সারমর্ম প্রধানত ছিলো তা-ই।

পরদিন সকালবেলায় পশ্চিম দিগন্ত কেমন যেন অস্বচ্ছ ও ঝাঁপসা দেখালো, আর তারপরেই আমরা সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখলুম, লোকে যাকে মরীচিকা বলে—আকাশের গায়ে যেন ফুটে উঠলো কোনো মিনার-গম্বুজওলা আশ্চর্য প্রাসাদের সারি, যা আসলে নিছকই দৃষ্টিরই বিভ্রম ছাড়া আর-কিছু নয়। এখানকার মরীচিকায় খেজুরকুঞ্জের ছায়াঘেরা টলটলে দিঘিজল দেখা যায় না, বরং দেখা যায় এইসব আকাশপ্রাসাদ, আর নীল-নীল মেঘের চুড়ো। আর সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচ-ছশো বছর আগেকার মধ্যযুগের কথা মনে পড়ে গেলো আমার। এই বিভ্রমকে এমনই সত্যি ঠেকে, এইসব মস্ত কেল্লাকে এমনই চেনা ঠেকে যে মনে হয় আমরা বুঝি মধ্যযুগের-ইওরোপের কোনো বীরপুরুষের দুর্গপ্রাকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর বেহেমথ যত সেদিকে এগিয়ে গেলো, ততই সেই আকাশেজেগে-ওঠা প্রাসাদনগরী ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো; পূর্ব দিগন্ত থেকে উঠলো সবিতা, আর সাত ঘোড়ার, রথ যত ছুটে আসতে লাগলো তত তার পায়ের তলায় গুড়িয়ে গেলো সেই প্রতিসরিত মায়ানগর।

এর মানে কী, বুঝতে পারছো তো, মোক্লের? ব্যাঙ্কস বললে, ঋতু পরিবর্তনের পূর্বাভাস। আবহাওয়া বদল হবে এবার। শিগগিরই বর্ষা শুরু হবে। আমার মনে হয় দু-এক দিনের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঘ দেখতে পাবো আমরা।

ব্যাঙ্কস ভুল বলেনি। সন্ধেবেলাতেই পশ্চিম দিগন্ত মেঘে ও বাষ্পে অস্পষ্ট ও আবছা হয়ে গেলো; বিদ্যুৎ-ভরা এই কালো-মেঘ দেখতে-দেখতে এগিয়ে আসে মৌশুমিতাড়িত হাওয়ার সঙ্গে, আর তুলকালাম প্রচণ্ড ঝড় চারপাশে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয়।

সারাদিন ধরে এই বাষ্পমেঘময় আবহাওয়ারই বিষম প্রস্তুতি চলেছিলো; ঘুরেঘুরে হলুদ বালির স্তম্ভ উঠে যাচ্ছিলো আকাশে, আর আলো পড়ে সেই ঘূর্ণমান বালুস্তম্ভ ঝলসে উঠছিলো বারে-বারে, মনে হচ্ছিলো আমরা যেন কোনো নিরীহ ও নির্দোষ অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়ে চলেছি, যা পোড়ায় না কিছুই, শুধু যেন চারপাশ আলো করে দেয়।

সন্ধে সাতটা নাগাদ একটি ঝুরিনামা ছায়াঢাকা অশ্বত্থকুঞ্জের কাছে এসে বেহেমথ থামলো। এইখানেই ছায়ায় রাত কাটানো হবে বলে ঠিক করা হলো। পরদিনও যদি এ-রকম বিষম গরম পড়ে, তাহলে আস্ত দিনটাই কাটানো হবে এখানে, পরে রাতের বেলায় অপেক্ষাকৃত কম গরমের মধ্যে আবার রওনা হওয়া যাবে।

ক্যাপ্টেন হুডের মৎলব কিন্তু ছিলো অন্যরকম।ফক্স! গৌমি! এখন তো মাত্র সাতটা বাজে-অন্ধকার ঘন হবার আগেই—এসো, জঙ্গল থেকে একটু ঘুরে আসি। আপনিও আসবেন না কি, মঁসিয় মোক্লের?

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই ব্যাঙ্কস বলে উঠলো, হুড, তুমি বরং আজ আর শিকারের খোঁজে না-ই বা বেরুলে। লক্ষণ মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার। ঝড় এসে গেলে শেষকালে কিন্তু ফিরে আসতে বিস্তর বেগ পাবে। বরং কাল যদি আমরা এখানে থাকি, তখন না-হয় বেরিয়ো—

বাধা দিয়ে হুড বললে, কিন্তু কাল তো দিনের আলো থাকবে। রাতের অন্ধকার ছাড়া কি আর শিকার কখনও জমে নাকি?

তা আমি জানি, হুড। কিন্তু আজকের রাতটা কেন যেন মোটেই সুবিধের ঠেকছে

আমার। তবু যদি যেতে চাও তাহলে বেশি দূরে যেয়ো না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বনের মধ্যে ঘুটঘুট্টে অন্ধকার হয়ে যাবে তখন হয়তো ফেরবার পথ গুলিয়ে ফেলবে।

না, না, তোমার অযথা ভয়ের কিছু নেই। এখন তো মাত্র সাতটা বাজে–আমি দশটার মধ্যেই ফিরে আসবো, কথা দিচ্ছি।

ফক্স আর গৌমিকে নিয়ে তক্ষুনি ক্যাপ্টেন হুড বেরিয়ে পড়লো; আর অমনি পরক্ষণেই গাছের আড়ালে তাদের আর দেখা গেলো না। সারা দিনের গরমে আর ধকলে আমি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম যে আমি আর তাদের সঙ্গে গেলুম না।

বেহেমথের এঞ্জিনের আগুন কিন্তু নিবিয়ে ফেলা হলো না; কোনো জরুরি অবস্থা দেখা দিলে যাতে চটপট রওনা হয়ে পড়া যায়, সেইজন্যে ব্যাঙ্কস এঞ্জিনকে সম্পূর্ণ নিবিয়ে ফেলতে নিষেধ করেছিলো।

বেশ সুন্দর সন্ধেটা। আমরা একটা ছোট্ট ঝরনার ধারে গিয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগলুম। পশ্চিমের জ্বলন্ত সূর্য ছায়া ফেলেছে ঝরনার জলে; আর অদ্ভুত এক গাঢ়নীল রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে আকাশ; ঘন বাষ্পমেঘে-ঢাকা একটা পুরু পর্দা যেন ঝুলে আছে পৃথিবীর উপর; হাওয়া নেই, তবু ওই মেঘগুলো ক্রমেই ধীরে এগিয়ে আসছে অলক্ষিতে—যেন কোনো আপন চলার ছন্দেই গভীর গম্ভীর বেগে তারা ধাবমান।

আটটা পর্যন্ত ঝরনার ধারে শুয়ে-বসে আড্ডা দিলুম আমরা, কেবল ব্যাঙ্কস মাঝেমাঝে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলো। শেষকালে যখন অশ্বত্থ গাছের তলায় অন্ধকার জমাট বেঁধে নিরেটকালো হয়ে গেলো, তখন আমরা উঠে পড়লাম। সেই ঝুলন্ত ঘন মেঘ তখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে। আকাশ এত গম্ভীর শান্ত যে কেমন থমথমে ঠেকছে। একটাও পাতা কাপছে না–সব স্থির, অনড় ও নিষ্কম্প। কেমন যেন একটা ভয়-ধরানো ভাব আছে চারপাশে—এই গুম-হয়ে থাকাটা যেন কোনো অচিকিৎস্য ব্যাধির লক্ষণ; যেন ছিলা টান করে বসে আছে সমস্ত আবহাওয়া—হঠাৎ টংকার দিয়ে উঠবে।

আর, সত্যিই, টংকার আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী। ফুলে ফেঁপে উঠছে মেঘমালা, যেন কোনো উদ্যত অতিকায় জন্তু পেশী টান করে নেবার আগে আড়মোড়া ভেঙে নিচ্ছে। ছেঁড়া-ছেড়া মেঘগুলো একটা-আরেকটার দিকে চুম্বকের টানে এগিয়ে যাচ্ছে-তারপর একসময় একটানা নিকষ কালো মেঘ ছাড়া মাথার উপর আর-কিছু রইলো না।

সাড়ে-আটটার সময় সেই কালো পর্দা চিরে ফেঁড়ে টুকরো-টুকরো করে বিদ্যুতের শিখা লকলক করে উঠলো; গুনে-গুনে ঠিক পয়ষট্টি সেকেণ্ড পরে বাজ ফেটে পড়লো ভয়ংকর, আর তার গম্ভীর গুমগুমে আওয়াজ যেন আমাদের লক্ষ্য করে ভীষণ বেগে গড়িয়ে এলো।

ষোলো মাইল দূরে-ঘড়ি থেকে চোখ তুলে বললে ব্যাঙ্কস, ঝড় শুরু হলো। কিন্তু একবার যখন খ্যাপা হাতির মতো শিকল খুলে বেরিয়েছে তখন দেখতে-না-দেখতে

এখানে এসে পড়বে। আর দেরি নয়, এক্ষুনি ভিতরে চলো সবাই।

কিন্তু ক্যাপ্টেন হুড? তার কী হবে? সার্জেন্ট ম্যাক-নীল জিগ্যেস করলে।

বই তো তাকে ডাক দিয়েছে, বললে ব্যাঙ্কস। বুদ্ধিমানের মতোই সে বাজের হুকুম তামিল করবে বলেই আশা করি।

আমরা বেহেমথের বারান্দায় এসে বসলুম।

অগ্নিকুণ্ডলী

হিন্দুস্থানও ব্রাজিলের মতো এই গর্ব করতে পারে যে তারও ঝড়, বৃষ্টি, কালো মেঘের কোনো তুলনাই হয় না। অন্তত রাগি, বদরাগি একটি ঝড় যে আশু আসন্ন, সে-বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিলো না। তাপমান যন্ত্রও তা-ই বললে। হঠাৎ অন্তত দুইঞ্চি নেমে গিয়েছে পারদের স্তম্ভ।

হুডদের জন্যে ভারি দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার, মানরো বললেন, ঝড় আসছে, রাত্রিও আসন্ন, অন্ধকারও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শিকারিরা অনেক সময় খেয়াল না-করেই শিকারের পিছু-পিছু অনেক দূরে চলে যায়। ওরা ফিরে আসতে পারবে তো?

হুড একটা আস্ত পাগল! বললে ব্যাঙ্কস, কোনো যুক্তির কথায় ওকে কর্ণপাত করানো ভগবানেরও অসাধ্যি। যাওয়াটাই ওর অন্যায় হয়েছে।

বললুম, কোনোভাবে ওদের কোনো সংকেত করতে পারি না আমরা?

নিশ্চয়ই পারি। এক্ষুনি আমি বৈদ্যুতিক মশাল জ্বেলে দিচ্ছি, বললে ব্যাঙ্কস।

ম্যাক-নীল জিগেস করলে, আমি ক্যাপ্টেন হুডের খোঁজে বেরুবো?

না-না, মানরো বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, অন্ধকারে এই বনজঙ্গলে ওদের তো খুঁজে পাবেই না, মাঝখান থেকে নিজেই আবার হারিয়ে যাবে।

ব্যাঙ্কস বোতাম টিপতেই বেহেমথের মস্ত চোখ দুটো মশালের মতো আলো হয়ে উঠলো, আর সেই আলো পড়ে অশ্বথ বনের সামনেটা থেকে অন্ধকার যেন লাফিয়ে ভয় পেয়ে সরে গেলো। অনেক দূর থেকেই এই আলো হুডের চোখে পড়া উচিত।

হঠাৎ এমন সময় প্রবল পরাক্রান্ত হাওয়া এলো সবেগে, বাঁকিয়ে দিলে গাছের ডগা, নুয়ে পড়লো ডালপালা সমেত ঝকড়ামাথা অশ্বথবন, নুয়ে পড়লো আর লাফিয়ে উঠলো স্প্রিঙের মতো, আর সেই স্তম্ভের মতো সারি-সারি অশ্বথের মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া বেজে উঠলো যেন কোনো গম্ভীর আকুল অগ্যান।

ঝড় এলো এতই আচম্বিতে যে মনে হলো যেন ফেটে পড়লো বিস্ফোরণের মতো। ঝরে পড়লো রাশি-রাশি হলুদপাতা, মরা ডাল-হাওয়া তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এলো আমাদের শকট পর্যন্ত। আমরা তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিলুম। কিন্তু তখনও বৃষ্টি পড়লো না।

টাইফুন যে! ব্যাঙ্কস যেন আরো আতঙ্কিত হয়ে উঠলো, স্টর! কালু কোথায়?

শেষ জ্বালানিটুকু চুল্লিতে ফেলছে এখন কালু।

ঝড় থেমে গেলে আমাদের কাঠ কুড়িয়ে নিতে হবে-হাওয়া যেন বিনি মাইনের কাঠুরের মতো সব কেটেকুটে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে-আমাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলে। যা-ই হোক, তুমি চুল্লিটা সব সময় গনগনে করে রেখো—যাতে চট করে রওনা হতে পারি।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অনবরত, আর বারে-বারে গর্জে উঠছে বাজ। গরম হাওয়া বয়ে যাচ্ছে জোরে, যেন কোনো গনগনে উনুনের ঢাকা খুলে বেরিয়েছে সে। মাঝে-মাঝে বারান্দায় এসে আমরা অশ্বত্থবনের দিকে তাকাচ্ছি-আঁকাবাঁকা ডালপালাগুলো যেন ঝলসে-ওঠা আকাশের গায়ে আঁকা কোনো ভীষণ চিত্রকরের এক অফুরান স্তব্ধ কালো আর্তনাদেরই প্রতিভাস।

হুডের জন্যে আমাদের দুর্ভাবনা ক্রমশ বেড়েই চললো। রাত যখন নটা, শুরু হলো মুষলধারে বর্ষণ। আর সেই আকাশভাঙা বাদলের মধ্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিহাওয়া রাশিরাশি ঝরাপাতা উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে কোনো প্রকাণ্ড খ্যাপার মতো। প্রতি মুহূর্তে ছিঁড়ে যাচ্ছে মেঘ, অবিরাম বিদ্যুতের শাসানি আর গর্জনে। আমরা ভিতরে এসে বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলুম। বাইরের বিদ্যুৎজ্বলা চীৎকৃত আলোর ঠিক উলটো যেন আমাদের বৈঠকখানা, শান্ত স্নিগ্ধ এক অন্ধকার ছেয়ে আছে সারা ঘরে।

হুডদের জন্যে আমাদের উদ্বেগ আর অস্বস্তি ক্রমশই বেড়ে উঠছিলো। এই ঝড়ের মধ্যে গাছতলায় আশ্রয় নিলেও তো তাদের রেহাই নেই। গাছ ভেঙে পড়তে পারে, বাজ ফেটে পড়তে পারে তাদের উপর।

আর এ-কথা আমার মনে জেগে উঠতেই ভীষণ শব্দ করে প্রচণ্ড বজ্রপাত হলো–ঠিক যেন আমাদের মাথার উপর এবার; আর পরক্ষণেই একটা পোড়া গন্ধে সারা ঘর ভরে গেলো।

বাজ পড়লো। ম্যাক-নীল আতঙ্কে ভরে গেলো! কাছেই!

স্টর! কালু! পারাজার! ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে ডাক দিলে।

তিনজনে ছুটে এসে ঢুকলো আমাদের ঘরে; ব্যাঙ্কস অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালো দেখবার জন্যে। দ্যাখো! দ্যাখো! চেঁচিয়ে উঠলো সে।

রাস্তার ঠিক বামপাশে, প্রায় দশ হাত দূরে, একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছ মাটিতে উলটে পড়ে গেছে। তার মস্ত ডালপালাগুলো পড়েছে আশপাশের গাছপালার গায়ে, আর প্রবল হাতে কে যেন ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে গাছটার, সেই ঝুরি আর ছাল হাওয়ায় এঁকেবেঁকে যাচ্ছে ভীষণ সাপের মতো। সোজাসুজি পড়েছে বাজটা, আর একেবারে চিরে, টুকরো করে ফেলেছে অত-বড়ো গাছটাকে।

বড্ড বেঁচে গেলো আমাদের স্টীম হাউস, বললে ব্যাঙ্কস, এখানেই থাকতে হবে আমাদের, ফাঁকায়—ওই গাছপালার তলায় গিয়ে আশ্রয় নেয়ার চেয়ে এখানেই আমরা অনেক বেশি নিরাপদ?

ব্যাঙ্কসের কথা শেষ হবার আগেই চীৎকার শোনা গেলো পিছনে। তবে কি ডরা ফিরে এলো?

স্টর বললে, এ তো পারাজারের গলা।

সত্যি, বাবুর্চি পারাজারেরই গলা; পিছনের অলিন্দ থেকে চেঁচিয়ে ডাকছিলো সে আমাদের। তক্ষুনি হন্তদন্ত হয়ে আমরা ছুটে গেলুম। গিয়ে কী দেখলুম! দেখলুম : আমাদের থেকে প্রায় দুশো হাত দূরে ডান দিকে অশ্বত্থ বনে আগুন ধরে গিয়েছে। এর মধ্যেই উঁচু ডালপালাগুলো যেন কোনো জ্বলন্ত পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু তা-

ই নয়, সেই আগুন উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতে-করতে এগিয়ে আসছে আমাদের এই স্টীম হাউসেরই দিকে। সর্বনাশ আসন্ন। এই ক-দিন এই জ্বলন্ত প্রখর তাপ আর শুকনো গরম হাওয়া গাছপালার আর্দ্রতা শুষে নিয়েছে, গাছপালা ঘাসবন আর ঝোপঝাড় এতই শুকনো ও দাহ্য হয়ে উঠেছে যে মুহূর্তে এই বিপুল বনও বুঝি আদিম সর্বভুক। অগ্নিদেবতার জঠরে চলে যাবে। অগ্নিকুণ্ডলীর দ্রুত অগ্রসর দেখে এটা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হলো না যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের গোটা শিবির ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এই ভীষণ বিপদের সামনে পড়ে আমাদের স্তম্ভিত মুখ থেকে কোনো কথাই বার হচ্ছিলো না। শেষকালে মানরো শান্ত গলায় বললেন, ব্যাঙ্কস, এই বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করার ভার তোমার উপর।

ব্যাঙ্কস বললে, উদ্ধার আমাদের পেতেই হবে। এই দাবানল নেভাবার ক্ষমতা যখন আমাদের নেই, তখন এই অগ্নিকুণ্ডের ত্রিসীমানা থেকে চম্পট দিতে হবে আমাদের।

আর ক্যাপ্টেন হুড? তার কী হবে? জিগেস করলে ম্যাক-নীল।

এখন তাদের জন্যে কিছুই করার উপায় নেই। এক্ষুনি যদি তারা এখানে এসে পৌঁছোয়, তাহলে তাদের ফেলে রেখেই আমাদের রওনা হয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু তাদের ফেলে চলে-যাওয়া আমাদের উচিত হবে না, ব্যাঙ্কস, বললেন মানরো।

ফেলে চলে-যাওয়া নয়—প্রথমে বেহেমথকে এই আগুনের খপ্পর থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরে তাদের আমরা খুঁজে বার করবো।

ব্যাঙ্কসের কথা যে যুক্তিযুক্ত, এ-কথা অস্বীকার করতে পারলেন না মানরো। তা-ই করো তাহলে।

স্টর! এক্ষুনি এঞ্জিনে গিয়ে বোসো! কালু-স্টীম চাপিয়ে দাও হাতির শুঁড় দিয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে এলো।

ততক্ষণে দাবানল প্রায় পঞ্চাশ হাত এগিয়ে এসেছে। এত বড়ো-বড়ো গাছগুলোকে। যেন মুহূর্তে জঠরে পুরে দিচ্ছে ওই সর্বগ্রাসী আদিম দেবতা। বন্দুকের গুলির মত শব্দ করে ফুটছে ডালপালা, আগুনের তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে চারপাশে–আর গাছ থেকে গাছে, লাফিয়ে চলে যাচ্ছে আগুন।

ব্যাঙ্কস বললে, আর সময় নেই। এক্ষুনি রওনা হতে হবে।

মানরো বললেন, ইশ, যদি হুডরা ফিরে আসতো!

সিটি বাজাও-বাঁশি বাজাও। চেঁচিয়ে বললে ব্যাঙ্কস, হয়তো বাঁশির শব্দ শুনতে পাবে তারা!

গর্জে-ওঠা বাজ, বৃষ্টির ঝমঝম, শব্দ-করে-ফুটে-ওঠা ডালপালার আওয়াজ ছাপিয়ে বাঁশির তীক্ষ্ণ-প্রবল চীৎকারে হাওয়া বারেবারে কেঁপে উঠলো। নিশ্চয়ই অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছেছিলো সেই বাঁশির শব্দ। কিন্তু হুড, ফক্স বা গৌমির কেননা চিহ্নই নেই কোথাও।

ব্যাঙ্কস, মানরো অস্থিরভাবে বলে উঠলেন, আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো, ব্যাঙ্কস!

অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় ব্যাঙ্কস বললে, বেশ, আর তিন মিনিট কেবল অপেক্ষা করবো আমি যদিও ওই তিন মিনিটে কিন্তু পুরোপুরি আগুনের পাল্লায় চলে যাবে বেহেমথ!

দু-মিনিট কেটে গেলো। আগুনের হলকা পৌঁছুলো বারান্দায়; ইস্পাতের খোল গরমে তেতে যেন লাল হয়ে উঠেছে। আরো-অপেক্ষা-করা নিছক পাগলামি ছাড়া আর-কিছু নয়।

স্টর! এঞ্জিন চালিয়ে দাও!

আরে! ম্যাক-নীল চেঁচিয়ে বলে উঠলো।

ওই তো ওরা! বলে উঠলেন কর্নেল।

রাস্তার ডান দিক থেকে ক্যাপ্টেন হুড আর ফক্সকে দেখা গেলো; গৌমিকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে তারা।

মারা গেছে নাকি?

না। ঠিক ওর পাশেই বাজ পড়েছিলো—বন্দুকটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে চুরমার, বাঁ-পা-টা একেবারে অবশ হয়ে গেছে।

ব্যাঙ্কস, বেহেমথ ওই বাঁশি না-বাজালে আমরা বোধহয় কিছুতেই ফিরে আসতে পারতুম না!

শিগগির করো! জলদি! ব্যাঙ্কস চাচালে।

হুড আর ফক্স লাফিয়ে উঠলো আমাদের এই অদ্ভুত গাড়িতে, আর গৌমি প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়লেও তখনও সংজ্ঞা হারায়নি–ধরাধরি করে তাকে এনে তার কামরায় শুইয়ে রাখা হলো।

তখন প্রায় সাড়ে-দশটা বাজে। ব্যাঙ্কস আর স্টর হাওদায় গিয়ে বসলো; আর, .তিন আলোর ঝলকানির মধ্যে এগিয়ে চললো বেহেমথ, দাবানল, বেহেমথের বৈদ্যুতিক মশাল, আর বিদ্যুৎজ্বলা আকাশ—এই তিনরকম আলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো আমাদের অতিকায় ইস্পাতি হাতি, তার শুঁড় থেকে বেরিয়ে এলো কালো ধোঁয়ার সর্পকুণ্ডলী।

দু-এক কথায় হুড তার অভিযানের বর্ণনা দিলে। কোনো বন্য জন্তুর দেখাই তারা পায়নি, চিহ্নমাত্রও না। এদিকে ঝড় যখন এলো, অন্ধকার যে তাদের তখন এত তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলবে তা তারা কেউই আশঙ্কা করেনি। তারা তখন মাইল তিনেক দূরে গেছে, এমন সময় বাজের শব্দ গর্জে ওঠে মাথার ওপর। তক্ষুনি ফিরে আসার চেষ্টা করে তারা, কিন্তু সেই ঝুরি-নামা ডালপালা-ভরা অশ্বত্থ বনে তারা আতঙ্কিত হয়ে আচমকা আবিষ্কার করে যে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। ঝড় ততক্ষণে রেগে উঠে গাছপালার ঝুঁটি ধরে নাড়াচ্ছে। এতদূরে তারা চলে গিয়েছিলো যে বেহেমথের বৈদ্যুতিক মশালের আলো সেখানে পৌঁছোয় না। পথ হারিয়ে ফেলে তারা কেবলই গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো, কেমন করে যে বেহেমথে পৌঁছুবে বুঝতেই পারেনি। ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, এমনকী ডালপালা ও নিবিড় পাতার চন্দ্রাতপ ভেদ করে অঝোর ধারায় ঝরতে লেগেছে সেই বিষম বৃষ্টি–ভিজে তারা যেন ঝোড়ো কাক হয়ে গেলো একেকজনে। আর এমন সময় এক প্রচণ্ড ঝলসানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তাদের, ঠিক যেন মাথার

ওপরেই বাজ ফেটে পড়লো বিষম রোষে, আর গৌমি সংজ্ঞা হারিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলো মাটিতে, ক্যাপ্টেন হুডের পায়ের তলায়। তার বন্দুকটা তার হাত থেকে কে যেন হ্যাচকা টানে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেললে, কুঁদোটা ছাড়া ধাতুনির্মিত খোলনলচের কিছুই আর থাকলো না। প্রথমটায় তারা ভেবেছিলো গেমি বুঝি মরেই গেলো, কিন্তু পরীক্ষা করে বুঝলো যে ওই ভীষণ বিদ্যুৎ তার গায়ে বয়ে যায়নিকাছে পড়েছে, আর সেই ধাক্কায় তার পা-টা অসাড় হয়ে গেছে। বেচারার হাঁটবার ক্ষমতাই ছিলো না; তারা তাকে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এলো, সেই কালো বনের মধ্যে দিয়ে কোনোমতে সামনে এগুতে লাগলো। দুঘণ্টা তারা সেই আঁধারবনের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সংশয়ে পা চলেনি; থেমে বোঝবার চেষ্টা করেছে কোথায় পৌঁছেছে, তারপর আবার শুরু করেছে তারা সেই হতাশ কুচকাওয়াজ। অবশেষে যখন তারা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় কোথায় যেন তীক্ষ্ণ ধাতব স্বরে বাঁশি বেজে উঠলো, বেহেমথের। তার মিনিট পনেরোর মধ্যেই তারা এসে পৌঁছুলো-আরেকটু দেরি হলে বেহেমথ হয়তো তাদের ফেলে রেখেই চলে যেতো।

হুড যতক্ষণে তাদের ওই দুর্বিপাকের বর্ণনা দিলে, বেহেমথ ততক্ষণে প্রশস্ত মসৃণ অরণ্যপথ ধরে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দাবানলও যেন তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগুচ্ছে; হাওয়ার গতি যদি বদলে যায়, তাহলে এই অবস্থায় আমাদের বিপদের আর শেষ থাকবে না। লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে আগুন–পিছু-নেয়া কোনো বিষম ভয়ের মতো—আর বেহেমথ যেন প্রাণপণে ছুটে চলেছে তার হাত এড়াবার জন্যে। হঠাৎ কিন্তু সত্যিই বদলে গেলো হাওয়ার গতি, ছাই আর ফুলকি উড়লো ঘূর্ণি দিয়ে চরকির মতো পাক খেয়ে-খেয়ে, আর আগুনের বেগ যেন আরো বেড়ে গেলো।

ব্যাঙ্কস তক্ষুনি বেহেমথের গতি বাড়িয়ে দিলে, কিন্তু সেই চঞ্চল অগ্নিকাণ্ডের কাছে শেষ পর্যন্ত তাকে যেন হার মানতেই হবে। আমরা আতঙ্কে ও ভয়ে কেবল সেই প্রচণ্ড, অবিশ্বাস্য, ভয়ংকর দাবানলের দিকে তাকিয়ে আছি! অসহায়ের মতো সমস্ত বোধ আর চেতনা যেন টান হয়ে প্রতীক্ষ্ণ করছে ভীষণ মুহূর্তের, কখন পথ আটকে দু-পাশের অরণ্যেই জ্বলে ওঠে আগুন; এমন সময়, তখন সাড়ে-এগারোটা হবে, ঠিক যেন বেহেমথের মাথার উপর বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো বাজ! কী সর্বনাশ! স্টর আর ব্যাঙ্কস যে হাওদায় রয়েছে! আমি ভয়ে চোখ বুঝে ফেললুম।

বাজটা কিন্তু সরাসরি হাওদার উপর পড়েনি; বেহেমথের লম্বা পাখার মতো কানে পড়েছে, আর ওই ইস্পাত শুষে নিয়েছে সব বিদ্যুৎ। এঞ্জিনের কোনো বিপদ হয়নি। বরং সেই বিকট বক্সনাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেহেমথ যেন তার শুঁড় তুলে বার কয়েক বাঁশি বাজিয়ে তার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করে দিলে!

ক্যাপ্টেন হুড ফুর্তিতে লাফিয়ে উঠলো!রক্তমাংসের হাতি হলে কখন ডিগবাজি খেয়ে পড়তো, চার পা শূন্যে তুলে গড়াগড়ি যেতে! কিন্তু দেখেছো আমাদের বেহেমথকে–বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়বৃষ্টি দাবানল কাউকেই কোনো পরোয়া করে না।

আরো-আধঘণ্টা এগুবার পর আমরা এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলুম। জ্বলন্ত গাছপালার আলোয় দেখা গেলো সারি-সারি ভীত ও কাতর, আতঙ্কিত ও মরীয়া জীবজন্তু–দাবানলের হাত থেকে পালাবার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে তারা—কোনোদিকেই দৃকপাত করছে না মোটেই। আর তাদের দেখে হুড কেবল সশব্দে কপাল চাপড়াতে লাগলো। যখন সে

শিকারে বেরিয়েছিলো, তখন কারু ল্যাজের ডগাটিও চোখে পড়েনি —অথচ এখন যখন চায় না, তখন তারা পাল্লার মধ্যে ছুটোছুটি করে মরছে। পোড়া কপাল আর কাকে বলে?

রাত একটার সময় আমাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠলো। হাওয়া হঠাৎ তিনবার পাক খেয়েই বদলালো দিক, উড়ে গেলো ফুলকি আর ছাই, আর ওপাশের প্রস্তুত ও আগ্রহী অশ্বত্থ বনেও ধরে গেলো আগুন। অর্থাৎ বেহেমথ মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, এবং সামনে ও দু-পাশে লেলিহান শিখা উঠে গেছে ঊর্ধ্বে, উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছে যেন ভয়ংকর আহ্বাদে। এই আগুনের কুণ্ডের মাঝখান দিয়েই এগুতে হবে আমাদের : দুই ধারে গনগনে বিপুল উনুন, তার মধ্য দিয়ে ছুটে যেতে হবে বেহেমথকে কোনো জাদুজানা অতিকায় ঐরাবতের মতো। হিন্দুদের বজ্রের দেবতা ইন্দ্রের হাতি ছাড়া কে আর উদ্ধার পাবে এই সংকট থেকে?

ব্যাঙ্কস কিন্তু হাল ছাড়েনি। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তারই মধ্য দিয়ে সে পূর্ণবেগে চালনা করলে বেহেমথকে, দু-পাশে গর্জমান জ্বলন্ত উনুন, প্রজ্বলন্ত ডালপালার উপর দিয়ে ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে বেহেমথের চাকা, আর জ্বলন্ত দম-বন্ধ-করা আবহাওয়া ঢেকে ফেলছে আমাদের।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছিলো, জানি না। হঠাৎ...হঠাৎ একঝলক খোলা হাওয়া যেন শোঁ-শোঁ করে বয়ে গিয়ে আমাদের বলে গেলো, বিপদ আর নেই! রাত তখন দুটো বাজে। আমরা অবশেষে সেই অশ্বত্থ বন পেরিয়ে এসেছি। আমাদের পিছনে পড়ে রয়েছে সেই বিশাল অরণ্যদেশ, যেখানে শিখা কেবল ছড়িয়েই যাবে নৃত্য করতেকরতে, শেষ অশ্বত্থ গাছটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ অব্দি সেই আগুনের নাচ আর থামবে না।

সকালবেলায় ঝড় থেমে গেলো-যেমন হঠাৎ এসেছিলো, তেমনিই হঠাৎ তার রোষ আর আক্রোশ মিলিয়ে গেলো দিগন্তে—যেন এই ভয়ংকর কয়েক ঘণ্টায় নিজেকে সে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলেছে।

বেহেমথ যখন বিশ্রামের জন্যে থামলো, তখন বেলা বারোটা বাজে, আর আমরা অবিরাম চলে রেওয়া প্রদেশের কাছে এসে পড়েছি।

ব্যাপ্টেন হুডের পরাক্রম

সেদিন সারাদিন আমরা গত রাতের ধকল কাটিয়ে ওঠবার জন্যে বিশ্রাম নিলুম এখানে, রাতটাও তাই। এই দুর্যোগ, বিপৎপাত আর অবসাদের পর বিশ্রাম আমাদের পক্ষে নিতান্তই জরুরি হয়ে পড়েছিলো।

অযোধ্যা রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি অবশেষে; এখন আমরা যাবো উর্বর ও শ্যামল রোহিলখণ্ডের মধ্য দিয়ে। দিল্লি পুনরুদ্ধারের পর এইখানে সিপাহী বিদ্রোহের শেষ আগুন জ্বলে উঠেছিলো-পরে সার কলিন ক্যামবেল তার বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষে লিপ্ত হন; অনেকক্ষণ পর্যন্ত, একেবারে শেষ রক্ত বিন্দুটুকু দিয়ে, বিদ্রোহীরা সার কলিনকে রুখেছিলো।

রাস্তা এখানে সমতল ও সোজা; অনেক স্রোতস্বিনী ও ছোটো-ছোটো শাখানদী আছে বটে, অনেকগুলোই তাদের সেচের সুবিধের জন্যে কৃত্রিম উপায়ে মনুষ্যনির্মিত–কিন্তু সেগুলো অনায়াসেই পেরুতে পারবে বেহেমথ। অল্পক্ষণের মধ্যেই যে নেপালের পর্বতগাত্র আমাদের চোখে পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিশ্রামের ব্যবস্থা করে আরেকদিক থেকে ভালোই করেছিলাম আমরা। গৌমির বাঁ-পায়ের অসাড় ভাবটা ছিলো সাময়িক; সেবা ও সংবাহনের ফলে সে আবার সুস্থ হয়ে উঠলো—সেই মারাত্মক দুর্ঘটনার কোনো চিহ্নই আর রইলো না। শুধু দুর্যোগের কিছু চিহ্ন রইলো বেহেমথের লম্বা কানে-মনে আছে, বাজ পড়েছিলো গর্জন করে, রেগে; আমরা

ভেবেছিলুম বুঝি হাওদার উপরেই এসে পড়েছে! তখন বেহেমথ তার লম্বা কানের ডগা দিয়ে সব বিদ্যুৎ শুষে নিয়েছিলো আর তার ওই ইস্পাতের কানে কতগুলো ছোটো-বড়ো ছ্যাঁদা হয়ে গিয়েছিলো কেবল।

আটই জুন সকালবেলায় রোহিলখণ্ডের একটা ছোট্ট গ্রাম ছেড়ে আবার আমরা ধীরেধীরে রেওয়ার দিকে এগিয়ে চললুম; রেওয়া তখন মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে। রাস্তা বৃষ্টি-ভেজা, পিছল, সেইজন্যেই দ্রুতবেগে যাবার উপায় ছিলো না।

হুড আগের দু-দিন তার শিকারি কুকুর ফ্যান আর নাইজারকে নিয়ে বন্দুক হাতে বেরিয়েছিলো বটে, কিন্তু এমন-কোনো হিংস্রভীষণ প্রবল জন্তু তার চোখে পড়েনি যাতে তার শিকারের ক্ষুধা আর রোমাঞ্চলিপ্সা এতটুকু তৃপ্ত হয়। হয়তো সেইজন্যেই সে এতই বিরক্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছিলো যে আট তারিখে শিকারের একটা মস্ত সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে গেলো।

বেহেমথ তখন যেখান দিয়ে যাচ্ছে, তার দু-পাশে ঘন বাঁশবন দেখেই বোঝা যায় গ্রাম বা লোকালয় কাছেই। আর বাঁশবনের আশপাশে শতরঞ্জের ছকের মতো আলবাঁধা পড়ে আছে জলা ধানখেত। স্টর বসে ছিলো হাওদায়, বেহেমথ আস্তে গজেন্দ্রগমনে চলেছে, শুঁড় থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে হালকা সুন্দর ধোঁয়ার রাশি–আশপাশের বাঁশবনের উপরে ছিড়ে-ছিড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

হঠাৎ এমন সময় আশ্চর্যসুন্দর ক্ষিপ্রতায় কী-একটা জানোয়ার একলাফে হাতির ঘাড়ে উঠে বসলো।

চিতাবাঘ! চিতাবাঘ? চেঁচিয়ে উঠলো স্টর।

চীৎকার শুনে হুড একলাফে বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। চিতাবাঘ! তারও গলা থেকে চীৎকার উঠলো।

চেঁচিয়ে বললুম, দেখছো কী? গুলি করো!

গুলি করার সময় ঢের পাবো, বলে হুড বন্দুক তুলে তাগ করে ধরলো।

কর্নেল মানরো, ব্যাঙ্কস আর আমি তখন বারান্দায় বেরিয়ে এসেছি। চিতাবাঘ আসলে বাংলাদেশের গরীয়ান রাজাবাঘের মতো অত-বড়ো নয়, তেমন মহিমা তার নেই; কিন্তু ক্ষিপ্রতায়, গায়ের জোরে আর হিংস্রতায় সে মোটেই কম যায় না। আমাদের হাতি দেখে নিশ্চয়ই ঠকে গিয়েছে চিতাটা 1 সাহসে ভর করে লাফিয়ে পড়েছে মুহূর্তে, ভেবেছে জ্যান্ত মাংসেই বুঝি বসাবে থাবা আর দাঁত, কিন্তু তার বদলে-এ কী কাণ্ড!–এ যে লোহার হাতি! দাঁত-নখই বরং ভেঙে যাবার জোগাড়। চিতাটা যেন এভাবে ঠকে গিয়ে আরো খেপে গেলো, নকল হাতিটার মস্ত কান দুটো আঁকড়ে ঝুলে থাকলো সে একটু, এক্ষুনি আবার লাফিয়ে পড়ে বাঁশবনে ঢুকে যাবে বুঝি।

হুড তার বন্দুক ধরে তেমনি তাগ করেই আছে-ভঙ্গিটা : ও আর কী, গুলি করলেই হলো। হঠাৎ চিতাটা তাকে দেখতে পেলে; গর্জন করে উঠলো সে একবার, তারপর আবার উঠে বসলো হাতির কাঁধে। নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, এটা তার অজানা নেই; কিন্তু তাই বলে সে পালিয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই করলে না। বরং বারান্দায় লাফিয়ে পড়ারই মৎলব বুঝি তার।

হুড চিতাটার গা থেকে চোখ না-সরিয়েই আমাকে জিগেস করলে, মোক্লের, তুমি কখনও চিতাবাঘ মেরেছো?

না।

মারতে চাও একটা?

বললুম, হুড, আমি চাই না যে তুমি এ-রকম একটা বাঘ মারার গৌরব থেকে বঞ্চিত হও—

ফুঃ, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি হুডের, এ আবার একটা বাঘ নাকি। নাও, একটা বন্দুক তুলে নিয়ে চিতাটার কাধ লক্ষ্য করো; তাগ ফশকালে আমি না-হয় চিতাটা লাফাবার সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করবো–

তাহলে তা-ই হোক।

ফক্স আমার হাতে একটা দোনলা বন্দুক তুলে দিলে। বন্দুকটা তুলে নিয়ে চিতাটার কাধ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম। গুলিটা তার কাধ ঘেঁসে চলে গেলো—খুব বেশি হলে একটু ছড়ে গিয়ে থাকবে সম্ভবত, সঙ্গে-সঙ্গে চিতাটা হুড়মুড় করে লাফিয়ে পড়লো মাটিতে।

এঞ্জিন থামাও, এঞ্জিন থামাও! চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলে ব্যাঙ্কস, আর স্টর তক্ষুনি ব্রেক কষে বেহেমথকে থামিয়ে দিলে। বারান্দা থেকে লাফিয়ে নামলে হুড আর ফক্স, ঝোপটার দিকে ছুটে গেলো বন্দুক উঁচিয়ে। রুদ্ধশ্বাস ও উৎকর্ণ কয়েকটা মিনিট কেটে গেলো, কিন্তু

সব চুপচাপ, গুলির কোনো আওয়াজই পাওয়া গেলো না। একটু পরেই শিকারি দুজন ফিরে এলো।

হাওয়া হয়ে গেছে। কোথাও কোনো পাত্তা নেই, হুড চেঁচিয়ে জানালে, ঘাসের উপর এমনকী রক্তের একটা ফোঁটা অব্দি নেই।

বললুম, আমারই দোষ। তুমি নিজে, চিতাটাকে গুলি করলে এমনভাবে পালাতে পারতো না। তোমার তো আর তাগ ফশকাতো না!

বাজে বোকো না! বললে হুড, আমি ঠিক জানি তোমার গুলি ওর গায়ে লেগেছিলো—তবে ঠিক কাঁধে লাগাতে পারোনি!

আমার ঊনচল্লিশ কি আপনার একচল্লিশ নম্বর হওয়া ওর কপালে লেখা ছিলো না, ফক্স কিঞ্চিৎ মনমরাভাবে জানালে।

দূর-দূর! চেষ্টা করে হুড তার গলায় ঔদাসীন্য আনলে, চিতা তো আর সত্যিকার বাঘ নয়—মার্জারকুলের সেরা জীব হলে কি আর আমি অমনভাবে মোক্লেরকে গুলি করতে দিতুম!

যাক, যা হবার হয়েছে, সার এডওয়ার্ড মানরো বললেন, এদিকে ছোটোহাজরি তৈরি-সবাই টেবিলে এসে বোসো, টাটকা খাবারের চেয়ে সান্ত্বনা কি আর কিছুতে আছে!

ছোটোহাজরিতেই সান্ত্বনা মিলবে, আশা করি, বললে ম্যাক-নীল, তবে সব দোষ আসলে ফক্সের?

আমার? ফক্স হকচকিয়ে গেলো।

নিশ্চয়ই! বললে ম্যাক-নীল, মোক্লেরকে যে-দোনলাটা তুমি দিয়েছিলে তার টোটা ছিলো ছ-নম্বর-ওতে কি আর পাখি ছাড়া আর-কিছু মেলে? বলে ম্যাক-নীল দোনলাটার ভিতর থেকে দ্বিতীয় টোটাটা বের করে আনলে। দেখা গেলো, তার কথাই সত্যি।

ফক্স! হুড ডাক দিলে।

বলুন।

দিন-দুই বন্দী থাকতে হবে তোমায়।

আচ্ছা, ক্যাপ্টেন! বলে ফক্স নিজের কামরার দিকে চলে গেলো-আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আর মুখ দেখাবার ইচ্ছে নেই তার। নিজের এই ভুলে লজ্জায় তার প্রায় মাথা কাটা গেছে।

পরদিন ক্যাপ্টেন ইড, গৌমি আর আমি রাস্তার ধারে সমভূমিটার উপর শিকার করতে বেরুলুম। কয়েক ঘণ্টার জন্য থেমেছে বেহেমথ, সেই ফাঁকেই এই সফরি। সারা সকালটা ঝমঝম বৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু দুপুরবেলায় আকাশ একেবারে ঘন-নীল-হালকা শাদা নির্জল মেঘ ছাড়া আর কিছু নেই আকাশে। এই শিকারের প্রেরণা অবিশ্যি মঁসিয়

পারাজারের–ছোটাহাজরির সময় সে জানিয়েছিলো তার ভাড়ার নাকি প্রায় ফাঁকা। তাই ফ্যান আর নাইজারকে নিয়ে আমরা তিনজনে শিকারে বেরিয়েছি।

কিন্তু দু-ঘণ্টা ধরে এদিক-ওদিক ঘুরেও কোনো লাভ হলো না। কেবল কয়েকটা খরগোশ আমাদের দেখে ভয়ে কানখাড়া করে শাঁৎ করে ছুটে মিলিয়ে গেলো দূরে। জায়গাটা আসলে এত ফাঁকা যে শিকারের সন্ধান পাওয়াই দুষ্কর। না আছে জঙ্গল, না-বা কোনো ঝোপঝাড়–কেবল দূরে-দূরে চাষীদের গ্রাম আর গোলাবাড়ি কালো ফুটকির মতো দেখা যায়। হুড অবিশ্যি কোনো হিংস্র জন্তুর আশায় বেরোয়নি, মঁসিয় পারাজারের শূন্য ভাড়ার পূর্ণ করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু বেলা চারটে অব্দি যে আমরা একবারও কোনোকিছুকে গুলি করতে পারলুম না, তা অবশ্য মোটেই আমাদের দোষ নয়।

কিন্তু হুড তবু এমনি আপশোশ প্রকাশ করতে লাগলো যে আমি তার পানি শুনে বার-বার তাকে সান্ত্বনা আর আশা দিলুম।মিলবে, শিকার মিলবে-আলবৎ মিলবে। এখন না-মিলুক, পাহাড়ি জায়গায় জঙ্গলে তো মিলবেই!

তা অবিশ্যি ঠিক। নেপালের জঙ্গলে যদি কিছু না-মেলে তো হাত কামড়ানো ছাড়া আর-কিছুই করার থাকবে না....কটা বাজে এখন?

প্রায় পাঁচটা।

পাঁচটা! অথচ কিছুই পেলুম না এখনও!

সাতটার আগে শিবিরে ফেরার দরকার নেই। ততক্ষণে হয়তো–

উঁহু, আমাদের কপালটাই খারাপ। আর জানো, মোক্লের, কপালই হলো সব সাফল্যের মূল!

পরিশ্রম, ধৈর্য বা অধ্যবসায়ও। আমি বললুম, খালি হাতে ফিরবো না, এ-রকম একটা প্রতিজ্ঞা করলে হয় না? তোমার কী মনে হয়?

কী মনে হয়? হুড যেন অত্যন্ত বিস্মিত হলো এ-কথা শুনে, সেটাই তো মনোভাব হওয়া উচিত শিকারিদের!

তখন অবশ্য আমরা তিনজনে সামনে যা পেতুম, তাকেই আক্রমণ করতুম—মেঠো ইঁদুর কি কাঠবেড়ালিও বোধহয় ছাড়তুম না কিছুতেই। আসলে এখানকার সব পশুপক্ষীই বোধহয় আমাদের মৎলব জেনে গিয়েছিলো আগেভাগে, তাই সবাই পালিয়েছে—এমনকী একেবারে নিরীহ গোবেচারা পাখিগুলো অব্দি চোখে পড়ছে না।

ধানখেত ধরেই আমরা এগুলুম। একবার রাস্তার এপাশ ধরে গেলুম খানিকটা, আবার ওপাশের ধানখেত ধরে ফিরে এলুম। উদ্দেশ্য, যাতে শিবির ছেড়ে খুব-একটা দূরে গিয়ে না-পড়ি। কিন্তু সবই বৃথা হলো। বন্দুকের বদলে হাতে শৌখিন বেড়াবার ছড়ি থাকলেও হতো-আমাদের অবস্থার কিছু উনিশ-বিশ হতো না। এদিকে প্রায় সাড়ে ছটা বেজে গেলো!

হুডের দিকে তো তাকানোই যাচ্ছে না। বিড়বিড় করে কী যেন বকছে আপন মনে, বোধহয় সমস্ত পশুপক্ষীকেই অভিসম্পাত দিচ্ছে। সত্যি, কোনো শিকারির এমন, অবস্থার কথা কল্পনাও রা যায় না।

আমরা তখন শিবির থেকে মাইল তিনেক দূরে। বাঁশবনের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা ঘোরা পথে আমরা শিবিরের দিকে ফিরে আসছি। তখনও সূর্য ডোবেনি দিগন্তে, তবে মেঘের তলায় চ পা পড়ে গেছে। সেইজন্যেই পথটা একটু ঝাঁপসা ঠেকছে।

হঠাৎ এমন সময় আচম্বিতে আমাদের ডানপাশের ঝোপে গররর করে একটা বিষম গর্জন শোনা গেলো। আমার বুকটা এমনভাবে ধ্বক করে কেপে উঠলো যে আমি থমকে থেমে গেলুম। হড় আমার হাতটা চেপে ধরলে। ফিশফিশ করে বললে

বাঘ! তারপরেই একটা বিশ্রী শপথ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে, কিন্তু আমাদের বন্দুকে যে কেবল ছররা গুলি ভরা—একটাও বুলেট নেই!

কথাটা নিদারুণ সত্যি। আমাদের তিনজনের কারুর কাছেই একটাও টোটা নেই। তাছাড়া থাকতেও যদি, তবু তখন বন্দুকে নতুন করে টোটা ভরার সময় পাওয়া যেতো না। কারণ গর্জনটা শোনবার পরেই দেখি গুলতি থেকে বেরুনো মারবেলের মতো প্রচণ্ড বেগে বাঘটা ঝোঁপের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো—ঠিক আমাদের হাত বিশেক দূরে আঁকাবাঁকা রাস্তার মোড়ে এসে বসলো।

রাজা বাঘ; দৃঢ় প্রচণ্ড শরীর, তেজপূর্ণ, মস্ত, ভয়ানক, সুন্দর, নমনীয় পেশী, প্রকাণ্ড থাবা, ক্ষিপ্রতায় হিংস্রতায় তার তুলনা নেই।

এমন ভয়ংকর অবস্থায় কি এর আগে কেউ কখনও পড়েছিলো?

বাঘটাকে দেখবামাত্র আমার হাতটা বন্দুক সমেত কেঁপে উঠলো। লম্বায় ন-দশ ফুট হবে, বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে কালো আর হলদের ডোরাকাটা জ্বলন্ত-উজ্জ্বল এই বিরাট মার্জারবংশীয়ের মুখটায় সূর্যের লাল রশ্মি এসে পড়েছে : চোখ দুটো রয়েছে ছায়ায়-অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো জ্বলে উঠেছে সবুজ-ভীষণ ভয়ানক দুটি পোকরাজ। ল্যাজটা নড়ে উঠছে চঞ্চল হিল্লোলে। এমনভাবে গুঁড়ি মেরে বসেছে যেন এক্ষুনি লাফিয়ে পড়বে।

হুড কিন্তু মোটেই চঞ্চল হয়নি। বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরেছে সে ততক্ষণে, আর বিড়বিড় করে এক অদ্ভুত শুকনো গলায় বলে চলছে : ছ-নম্বর টোটা! ছ-নম্বর টোটা দিয়ে একটা বাঘকে গুলি করা! একেবারে চোখে গুলি করতে না-পারলে...

কথা শেষ করার আর সময় পেলে না হুড। বাঘটা লাফালো না। বরং আস্তে আস্তে রাজার মতো এগিয়ে এলো অরণ্যের সেই হিংস্র মহিমা। গৌমিও পিছন থেকে বন্দুক তুলে তাগ করে আছে-তারও বন্দুকে ছরার কার্তুজ ভরা।

একটুও নোড়ো না কেউ, কোনো শব্দ কোরো না, ফিশফিশ করে বললে হুড, তাহলেই বাঘটা লাফিয়ে এসে পড়বে আমাদের দিকে। আর লাফ দিলেই কোনো রক্ষা

নেই।

আমরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আস্তে পায়ে-পায়ে এগুতে লাগলো সেই ভোরা-কাটা বেড়াল, চোখ দুটো সে একবারও সরাচ্ছে না আমাদের উপর থেকে, ঝোলা চোয়ালটা যেন মাটি-ছোঁয়া। হুডের সঙ্গে তার দূরত্ব বুঝি দশ হাতও নেই। হুড কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে নির্ভীক ও নিষ্কম্প, যেন কোনো প্রস্তরমূর্তি-তার সারা প্রাণ যেন তার চোখের তারায় এসেই সংহত হয়েছে।

ভীষণ মুহূর্তটি আসন্ন, তিনজনের কেউই সম্ভবত আর বেঁচে থাকব না; কিন্তু এতেও হুডের বুক বোধহয় ধ্বক-ধ্বক করছে না। এক-এক করে পাঁচ পা এগিয়ে গেলো হুড। কেমন করে যে আমি নিজেকে সামলে রাখলুম জানি না, আরেকটু হলেই বোধহয় চেঁচিয়ে বলতুম তাকে গুলি ছুঁড়তে। কিন্তু না, হুড বলেছিলো, একমাত্র ভরসা চোখে গুলি করে বাঘটাকে অন্ধ করে ফেলতে পারলে, আর সেইজন্যে গুলি করার আগে তাকে খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

বাঘটা আরো তিন-পা এগিয়ে এলো, তারপর ধনুকের ছিলার মতো টান হয়ে গেলো তার সর্বাঙ্গ, এক্ষুনি লাফাবে

সজোরে গর্জে উঠলো বন্দুক, তার পরেই আরেকটা গুলির শব্দ : গুড়ুম, গুড়ুম!

দ্বিতীয় গুলিটা যেন বাঘের গায়ে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে-করা। বাঘটা কেবল বার দুয়েক গড়ালো মাটিতে, যন্ত্রণা আর ক্লেশ-মেশানো গর্জন উঠলো দু-তিন বার, তারপরেই স্থির হয়ে পড়ে রইলো মাটিতে।

চমৎকার! হুড উল্লসিত, বন্দুকটায় ছররা ছিলো না, জানো! না, ফক্সকে ধন্যবাদ দিতেই হয়?

তাও কি সম্ভব? আমি তো তাজ্জব।

নিজের চোখেই দ্যাখো, বলতে-বলতে সে ফাঁকা টোটাটা বার করে আনলে বন্দুক থেকে-সত্যি, সেই নতুন টোটা, যা ছিলো সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ, দাঁত দিয়ে চামড়া কেটে যে-টোটা বন্দুকে ভরতে হয়!

ব্যাখ্যা করার আর দরকার হলো না। সব বুঝতে পারলুম। দুটো দোনলা বন্দুক ছিলো হুডের—একই রকম দেখতে। ফক্স ভুল করে একটায় ছররা গুলি ভরেছিলো, আরেকটায় ভরে ছিলো শিশের গুলি! এই ভুলের দরুন আগের দিন বেঁচেছে চিতাবাঘের জীবন, আর আজকে বাঁচলো আমাদের!

সত্যি, হুড বললে, জীবনে আর-কোনো দিন মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে দাঁড়াইনি।

আধ ঘণ্টা পরে আমরা যখন শিবিরে ফিরে এলুম, ফক্সকে ডেকে পাঠালে হুড–তারপর কী হয়েছে, সব তাকে খুলে বললে।

শুনে ফক্স বললে, ক্যাপ্টেন, তাহলে দু-দিনের বদলে আমার চারদিন বন্দী হয়ে থাকা উচিত—কারণ আমি দু-দুটো ভুল করেছি।

আমারও তা-ই মত, হুড তক্ষুনি বললে, কিন্তু তোমার ভুলের জন্যেই যেহেতু একচল্লিশ নম্বর আমার হস্তগত হলো, সেইজন্যে আমার মতে এই মোহরটা তোমার প্রাপ্য–

আর আমারও মত হলো এই যে মোহরটা মুহূর্তে পকেটস্থ করে ফেলা,-সোনার টাকাটা পকেটে ঢোকাতে-ঢোকাতে বললে ফক্স।

১২ই জুন সন্ধেবেলায় একটা ছোট্ট গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলুম আমরা; ভারতের সব পাড়াগাঁর মতোই এই গ্রামও দেখতে একই রকম : দুঃস্থ জলাশয়, মশা-মাছির উৎসব, কাদায়-ডোবা মোষ, পাঁজরা-ওঠা গোরু, বুভুক্ষু সংসারের ভাঙা কুঁড়ে ঘর, নিষ্ফল ডাঙায় রাঙা ধুলোর ওড়াউড়ি। এই গ্রাম থেকেই পরদিন সকালে আমরা রওনা হবো : আর নব্বই মাইল দূরে, উৎরাইয়ের কোলে নেপাল—আমাদের লক্ষ্য তারই অরণ্যদেশ।

এক বনাম প্রকাণ্ড তিন

কয়েক দিন কেটে গেছে; অবশেষে উত্তর ভারতের প্রথম উৎরাই বেয়ে উঠে যাচ্ছি আমরা; আর ধীরে-ধীরে উঠে গেছে উৎরাইগুলো, যেন একেবারে জগতের শেষ চুড়োয় গিয়ে পৌঁছেছে তারা। কিন্তু উৎরাই এখানে চোখে পড়ে না; বেহেমথ প্রায় যেন অগোচরেই ক্রমশ উঠে যাচ্ছে, আমরা তা বুঝতেও পারছি না। ঝোড়ো আর বৃষ্টি-ভেজা আবহাওয়া, তবে তাপমাত্রা সহ্যের সীমা পেরোয়নি। রাস্তা এখনও দুর্গম নয়; তবে বেহেমথের কাছে আবার দুরধিগম্যই বা কী আছে?

হিমালয়ের শুভ্র-নীল চুড়োর কাছে এসে পড়েছি আমরা, কিন্তু আবহাওয়ার জন্যে এই আকাশছোঁয়া গিরিমালা স্পষ্ট করে দেখবার জো নেই। অথচ যতই তিব্বতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, জমি ততই বন্য ও এবড়োখেবড়ো হয়ে উঠেছে! তালীবন ছিলো এতক্ষণ দিগন্তে, এবার চোখের সামনে হলদে-সবুজ কলাগাছের সারি; আর রাশি-রাশি বাঁশঝাড়। ঝলমলে ম্যাগনলিয়া, স্নিগ্ধ মেপল, দীর্ঘ ওক, মস্ত বাদাম গাছ, ইণ্ডিয়া রবারের বন, হাওয়ায়-কাঁপা পাইন বন, উৎফুল্ল জেরানিয়াম, রডোডেনড্রন আর লরেল-রাস্তার দুপাশে এই আশ্চর্য নিবিড় বনানী চোখে পড়ে—যখন বৃষ্টি আর যখন রোদ, যখন তরুণ সকাল আর ছায়াঢাকা দূরসন্ধ্যা—সবসময়েই এই দৃশ্য ভঁজের পর ভাজ খুলে অফুরন্ত সৌন্দর্যের সংকেত পাঠিয়ে দেয়। তারই মাঝে-মাঝে বাঁশ-বেতের ছোটো-ছোটো খোড়োবাড়ি-ওলা ছোটো-ছোটো গ্রাম চোখে পড়ে—তবে যতই উপরে উঠছি জনালয় ততই কমে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ছাইরঙা ঝাঁপসাধূসর আকাশ ভেঙে বর্ষা নামে, আমরা বাধ্য হয়ে স্টীম হাউসের বেঠকখানায় বসে আড্ডা দিই, তাশ খেলি, গল্পগুজব করি।

মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে সরাইখানা, নিচু চৌকো বাংলোবাড়ি, দু-কোণায় দুটো স্তম্ভ উঠেছে; ভিস্তিওলা, বাবুর্চি আর খানশামা ছাড়া আর-কেউ থাকে না এ-সব সরাইয়ে। এ-সব সরাইয়ে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি থাকতে হলে বিশেষ পারমিট নিতে হয় ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে।

সতেরোই জুন এমনি-একটি সরাইয়ের কাছে আমরা আস্তানা গেড়েছি, আর সরাইখানার অভ্যাগতরা বেহেমথের দিকে বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ ভরা ঈর্ষাতুর চোখে তাকিয়ে আছে। বেশ সাড়া পড়ে গেছে তাদের মধ্যে। সরাইখানায় অভ্যাগত তখন নেহাৎ কম ছিলো না : এমন নয় যে কোনো ইংরেজ অফিসার নেপাল থেকে ফিরছেন, বা কোনো হিন্দু সওদাগর লাহোর বা পেশোয়ার পেরিয়ে সদলবল নিয়ে আফগানিস্তান যাবার উদ্যোগ করছে। সরাইখানায় ছিলেন গুজরাটের এক ছোটো রাজ্যের রাজা কুমার গুরু সিং, জাঁকজমক-সহকারে ভারত-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি। একাই যে তিনি সরাইখানার সবগুলি ঘরই দখল করে ছিলেন তা নয়—আশপাশের কুটিরগুলোতেও তার অনুচর পরিচারকদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো।

কুমারের অনুচরদের সংখ্যা কম করেও পাঁচশো হবে। বড়ো-বড়ো গাছের তলায় দুশো রথ দাঁড়িয়ে আছে সারি-সারি; কোনো রথের বাহন জিব্রা, কতগুলো আবার মোষে টানে, তাছাড়া রয়েছে প্রকাণ্ড তিনটে হাতি-হাতিগুলোর উপর জমকালো হাওদা বসানো, আর ছিলো গোটা কুড়ি উটের একটা বহর। বহরে কিছুরই অভাব নেই–আছে ওস্তাদ গায়ক ও বাদ্যকর, তরুণী নর্তকী, এমনকী কয়েকজন বাজিকর-কুমারের অবসর বিনোদনের উপায় তারা। উপরন্তু আছে তিনশো বেহারা ও দুশো শাস্ত্রী।

কৌতূহলী হয়ে সন্ধেবেলায় আমি একবার কুমারের তাঁবুর আশপাশ থেকে ঘুরে এলুম। কিন্তু কুমারের দর্শন পাওয়া গেলো না। স্বাধীন রাজা তিনি, ইংরেজদের তোয়াক্কা করেন না, সহজে কি আর তার দর্শন মেলে?

ঠিক ছিলো, পরদিন সকালবেলায় আমরা রওনা হবো। পাঁচটায় কালু বেহেমথের চুল্লিতে আগুন জ্বালাবার উদ্যোগ করলে। আমরা একটা ছোট্ট ঝরনার ধারে বেড়াতে গেলুম। মিনিট চল্লিশ পরে বয়লার তপ্ত হয়ে ফোশ-ফোঁশ করে উঠলো, স্টর যাত্রার উদ্যোগ করে হাওদায় গিয়ে উঠে বসলো। এমন সময় জনা পাঁচ-ছয় ভারতীয় এসে হাজির। রেশমি কুর্তার উপর শাদা উত্তরীয় জড়ানো, মাথায় জরির কাজ-করা পাগড়ি : সঙ্গে জনা-বারো সেপাই–বন্দুক ও তলোয়ার হাতে। একজন শাস্ত্রীর হাতে একটা সবুজ পাতার মুকুট, তার মানে এদের মধ্যে রাজবংশীয় কেউ আছেন।

রাজবংশীয় ব্যক্তিটি আসলে স্বয়ং কুমারসাহেব। বয়েস তার বোধকরি পঁয়ত্রিশ, মরাঠা আদল মুখে, চিবুক কঠোর ও তীক্ষ্ণ। কুমার আমাদের যেন তার চর্মচক্ষুতে দেখতে পেলেন না। সোজা এগিয়ে গেলেন অতিকায় বেহেমথের দিকেস্টর তখন বেহেমথকে আস্তে-আস্তে চালাচ্ছে। একটু তাকিয়ে রইলেন কুমার তার দিকে, তারপর স্টরকেই সরাসরি জিগেস করলেন, কে বানিয়েছে এটা?।

স্টর আঙুল দিয়ে ব্যাঙ্কসকে দেখালো—ব্যাঙ্কস তখন পাশেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সঙ্গে।

কুমার গুরু সিং চমৎকার ইংরেজিতে আস্তে, যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ব্যাঙ্কসকে জিগেস করলেন, আপনি বানিয়েছেন?

হ্যাঁ, আমি, বললে ব্যাঙ্কস!

কে যেন বলেছিলো ভূটানের স্বর্গত রাজাসাহেবের একটা অদ্ভুত খেয়াল থেকেই...

ব্যাঙ্কস ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

কুমার একটু কাঁধ ঝাঁকালেন, যখন জ্যান্ত রক্ত-মাংসের হাতি পাওয়া যায়, তখন খামকা একটা কলের হাতি বানিয়ে কী লাভ?

হয়তো, বললে ব্যাঙ্কস, ভূটানের রাজা ভেবেছিলেন তার হাতিশালার সব হাতির চেয়ে এটা অনেক শক্তিশালী হবে।

ফুঃ! কুমারের গলায় ঘৃণা ফুটে উঠলো, হাতির চেয়েও শক্তিশালী? একটা তুচ্ছ কল?

অনেক বেশি শক্তিশালী, ব্যাঙ্কস আবার বললে।

আপনার হাতিগুলো একে গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়েও একটু নড়াতে পারবে না, হড একটু অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলো।

আপনি বলছেন...! কুমার বললেন।

আমার বন্ধু কেবল এ-কথাই বলতে চাচ্ছেন যে দশ জোড়া ঘোড়া আর আপনার ওই তিনটে হাতি যদি একসঙ্গে এই নকল হাতিটাকে নড়াবার চেষ্টা করে, তাহলেও একে একফুটও নড়াতে পারবে না, ব্যাঙ্কস যেন প্রায় ছোটোখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললে।

এর একবর্ণও আমি বিশ্বাস করি না, কুমারসাহেব বলে উঠলেন।

কিন্তু বিশ্বাস না-করলে আপনি ভুল করবেন, হুড তক্ষুনি তাঁকে জানালে।

কুমার এতক্ষণে তার ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছুলেন। বিরোধিতা তার ধাতে মোটেই সয় না।

তাহলে এখানেই কি আমরা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারি? কুমার জিগেস করলেন।

নিশ্চয়ই পারেন, ব্যাঙ্কস বললে।

কুমার গুরু সিং বললেন, একটা বাজি ধরলে হয় না? আপনাদের হাতি যে পিছু হঠবে—

কে বললে, পিছু হঠবে, হুড অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলো।

আমি বলছি, গুরু সিং বললেন।

মহারাজ কত টাকা বাজি রাখতে চান? ব্যাঙ্কস মৃদুস্বরে জিগেস করলে।

চার হাজার—অবশ্যি সে-টাকা হারাতে যদি আপনাদের গায়ে না-লাগে।

বাজির অঙ্কটা নেহাৎ ফ্যালনা নয়। যদিও বেহেমথের জয় সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় ছিলো না তবুও খামকা এমন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিলো না ব্যাঙ্কস।

রাজি নন তো? সে আমি আগেই জানতুম, কুমারের গলার স্বর বিদ্রূপে ভরে গেলো।

নিশ্চয়ই রাজি, কর্নেল মানরো এতক্ষণে কথা বললেন।

তাহলে কর্নেল মানরো চার হাজর টাকা বাজি ধরছেন?

মহারাজ যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে দশ হাজার টাকা বাজি ধরতে পারি। কর্নেল মানরো জানালেন।

বেশ, তাহলে তা-ই হোক, তক্ষুনি উত্তর দিলেন গুরু সিং।

ব্যাঙ্কস সার এডওয়ার্ডের হাত চেপে ধরে ধন্যবাদ জানালে। রাজার অসহিষ্ণুতার উত্তরে সে যে দ্বিধায় পড়েছিলো, সার এডওয়ার্ড তাকে তার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু তার ভুরু কুঁচকে গেলো একটু সংশয়ে-কে জানে তার এঞ্জিনের শক্তি সে সত্যি করে জানে কিনা।

আমরা রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ালুম। বাজির খবর শুনে অনেক ভারতীয় এসে ভিড় করেছিলো সেখানে। ব্যাঙ্কস নীরবে গিয়ে হাওদায় উঠে বসলো স্টরের পাশে।

বেহেমথের শুঁড় থেকে একঝলক ধোঁয়া বেরিয়ে এলো।

ইতিমধ্যে কুমার গুরু সিং-এর ইঙ্গিতে একদল অনুচর গিয়ে রাজার প্রকাণ্ড হাতি তিনটিকে নিয়ে এসেছে। হাতিগুলোর পিঠে আর সেই জমকালো হাওদা নেই এখন। বাংলা দেশের বিখ্যাত হাতি দাক্ষিণাত্যের হস্তীকুলের চেয়ে অনেক প্রকাণ্ড ও শক্তিশালী। তিনটি মাহুত বসে আছে হাতির পিঠে, হাতে অঙ্কুশ–কিন্তু হাতিগুলো এত শিক্ষিত যে ইঙ্গিত করলেই চলে, অঙ্কুশ ব্যবহার করতে হয় না। হাতি তিনটি যখন রাজার সামনে দিয়ে গেলো, তখন যেটি যুথপতি—সবচেয়ে প্রকাণ্ড সেটা—হাঁটু গেড়ে বসলো রাজার সামনে, তারপরে শুঁড় তুলে তাকে অভিবাদন করলে। তারপর উঠে সঙ্গীদের নিয়ে এসে বেহেমথের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে এবং কিঞ্চিৎ বোধহয় বিস্মিতই হলো এই অদ্ভুত হস্তীপ্রবরকে দেখে।

হুড ভারি অধীর হয়ে পড়েছিলো-কৌতূহলে ও উত্তেজনায়; সত্যি বলতে আমিও একটু বিচলিত হয়েছিলুম; কিন্তু মানরো নির্বিকার-কুমার গুরু সিং-এর চেয়েও অনেক বেশি নির্বিকার।

ব্যাঙ্কস উপর থেকে বললে, আমরা প্রস্তুত। মহারাজ যখনই বলবেন—

আমি এক্ষুনি বলবো, কুমার বলে উঠলেন।

কুমার ইঙ্গিত করতেই মাহুতরা অদ্ভুত একটা শিস দিয়ে উঠলো, হাতি তিনটে টান হয়ে দাঁড়ালো, বেহেমথ একটু এগিয়ে এলো।

ব্যাঙ্কস শান্ত গলায় স্টরকে বললে, ব্রেক ঠেলে ধরো।

তখুনি শুঁড় দিয়ে একটু ধোঁয়া বেরিয়ে এলো, আর বেহেমথ স্থির হয়ে দাঁড়ালো —অবিচল ও অকম্পিত।

মাহুত তিনজন নানাভাবে উত্তেজিত করলো হাতিদের, তারাও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ধাক্কা দিলে বেহেমথকে—কিন্তু বেহেমথ যেন একটা অনড় পাহাড়-মাটি থেকে একটুও নড়লো না সে। কুমার গুরু সিং এত জোরে তার ঠোঁট চেপে ধরলেন যে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। হুড হাততালি দিয়ে উঠলো।

ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলে, এবার সামনে এগোও।

অমনি আবার শুঁড় দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে এলো, আস্তে ঘুরে গেলো বেহেমথের চাকা-হাতি তিনটি আস্তে-আস্তে পিছু হঠতে লাগলো—আর অনিচ্ছুক পিছু-হঠার সাক্ষী রয়ে গেলো মাটির উপর গভীর-করে-আঁকা তাদের পায়ের ছাপ! তারপরে বেহেমথ যখন আরো জোরে এগুলো, পাশে উলটে পড়ে গেলো হাতি তিনটি—কোনো বাধাই দিতে পারলে না বেহেমথকে। হড চীৎকারে তার উল্লাস প্রকাশ করলে মানরো কী-একটা ইঙ্গিত করলেন ব্যাঙ্কসকে। ব্যাঙ্কস ব্রেক টেনে বেহেমথকে আবার থামিয়ে দিলে।

রাজার প্রকাণ্ড হাতি তিনটি তখন উলটে পড়েছে মাটিতে, চিৎপাত হয়ে আর অসহায় ভাবে শূন্যে দুলছে তাদের পা। কুমার ততক্ষণে সেখান থেকে চলে গেছেন : শক্তি পরীক্ষার শেষটুকু দেখবার জন্যে আর মিথ্যেমিথ্যি অপেক্ষা করেননি।

বেহেমথ থামতেই হাতি তিনটি করুণ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালে, তারপর যখন বেহেমথের পাশ দিয়ে সরাইয়ের দিকে আবার ফিরে যাচ্ছে তখন যূথপতিটি আবার হাঁটু গেড়ে বসলো, শুঁড় শূন্যে তুলে অভিবাদন করলে বেহেমথকে : পরাজয় স্বীকার করায় তার কোনো লজ্জা নেই, জয়ীর সম্মান সে দিতে জানে।

একটু পরেই রাজার এক অনুচর এসে টাকার থলি তুলে দিলে মানরোর হাতে–মানরো থলিটা নিলেন বটে, তারপর মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, মহারাজের অনুচরদের জন্যে আমাদের বখশিশ রইলো। বলে ধীরে গিয়ে তিনি স্টীম হাউসে উঠে পড়লেন।

বেহেমথ ততক্ষণে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। একটু পরেই আমরা রওনা হয়ে পড়লুম। এবার স্পষ্টই উৎরাই ধরে যেতে হবে; কুমার গুরু সিং-এর শিবির আর সরাই খানিক পরেই পিছনে মিলিয়ে গেলো।

পঁচিশে জুন যখন একটানা সাত দিন এগুবার পর বেহেমথ একটি পাহাড়ি নদীর পাড়ে থামলো, তখন আমরা সমুদ্রতল থেকে ছ-হাজার ফিট উপরে এসে পৌঁছেছি–ঠিক ধবলগিরির তলায় থেমেছে বেহেমথ, যার চুড়ো উঠে গেছে ২৭০০০ ফুট উপরে। কলকাতা থেকে প্রায় একহাজার মাইল দূরে এসে আমাদের উত্তর ভারত ভ্রমণের এই প্রথম পর্যায় শেষ হলো। এবার এই নেপালের বিষম জঙ্গলে আমাদের জন্যে কী অপেক্ষা করে আছে, কে জানে? কর্নেল মানরোর সঙ্গে তার চিরশত্রু নানাসাহেবের সাক্ষাৎ হবে কি এখানে? না কি তার কাছে পুরো যাত্রাটাই মনে হবে বুনোহাঁসের পিছন-ধাওয়া?

কারণ নানাসাহেবের মৃত্যুর সংবাদ তার যে মোটেই বিশ্বাস হয়নি, তা আমি কেন যেন সারাক্ষণই অনুভব করতে পারছিলুম।

--মঁসিয় মোক্লের-এর দিনপঞ্জি আপাতত এখানেই শেষ–

বহ্নিশিখা

এতদূর পর্যন্ত আমরা মঁসিয় মোক্লের-এর বিবরণী অনুসরণ করে তিব্বতের পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছি। শীতকালটা তারা এখানেই শিবির করে কাটাবে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আমাদের গল্পের অন্য যে-পটটি উন্মোচিত হয়েছিলো এবার তার দিকেই একটু ফেরা যাক।

বেহেমথ যখন এলাহাবাদে পৌঁছোয়, তখন কী হয়েছিলো পাঠকদের নিশ্চয়ই তা মনে আছে। সেখানেই পঁচিশে মে-র একটি কাগজ থেকে কর্নেল মানরো নানাসাহেবের মৃত্যুর খবর পান। কিন্তু সত্যি কি অবশেষে এই অগ্নিগর্ভ পুরুষটি ছোট্ট একটি খণ্ডযুদ্ধে সাতপুরা পাহাড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন? না কি অন্য অনেকবার যেমন সত্যি-মিথ্যে গুজব। ছড়িয়েছিলো, এটা তেমনি কোনোকিছু? এটা অবশ্য আমরা নিজেরাই আন্দাজ করে নিতে পারবো যদি আবার সাতই মার্চের রাত্রিবেলায় অজন্তার গুহা থেকে বেরিয়ে-পড়া নানাসাহেব, বালাজি রাও ও তার অনুচরদের পিছন পিছন খানিকটা অনুসরণ করে আসি।

সুরাটের কাছে সমুদ্রে পড়েছে তাপ্তী নদী; কিন্তু যেখানে তার উৎস, সেখানে, তাকে ডিঙিয়ে, অজন্তা থেকে একশো মাইল দূরে, সাতপুরা পর্বতের এক গিরিখাতে। আশ্রয় নিয়েছিলেন নানাসাহেব—একটানা ষাট ঘন্টা ঘোড়া ছুটিয়ে এতদূরে এসেছেন তারা। জায়গাটা গণ্ডোয়ানার কাছে : গণ্ডোয়ানার পরিধি দুশো বর্গমাইল-তিরিশ লাখের উপর বাসিন্দা এখানকার—মূলত আদিবাসীদের দ্বারাই অধ্যুষিত। আর এরা এতদিন ছিলো

বন্য, তবে ঈষৎ শান্ত হয়েছে ইদানীং—কিন্তু ঠিকমতো ফুলকি ছড়াতে পারলে বিস্ফোরণ ঘটাতে কতক্ষণ? ক্ষিপ্রতায় এদের তুলনা নেই, গেরিলা যুদ্ধে এদের জুড়ি মেলে না। এরা যদি একবার নানাসাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে তার অঙ্গুলিহেলনে বিদ্রোহ করে, তাহলে সন্দেহ নেই ইংরেজদের বিষম বেগ পেতে হবে। গণ্ডোয়ানার উত্তরে বুন্দেলখণ্ড; বিন্ধ্য পাহাড়ের কোলে, যমুনার তীরে, এই পার্বত্য প্রদেশে নিবিড় অরণ্যে বাস করে আরেক দল প্রচণ্ড মানুষ—একদা টিপু সুলতানের হয়ে লড়াই করে এরা বিদেশীদের প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলো। আর গণ্ডোয়ানার পূর্বে থাকে কোরা, পশ্চিমে ভীল উপজাতি। কাজেই এইসব পার্বত্য জাতির মধ্যে আগুন ছিটোতে হলে যেজায়গাটার আশ্রয় নিলে সবচেয়ে ভালো হয়, অনেক ভেবেচিন্তে শেষটায় নানাসাহেব এসে আশ্রয় নিয়েছেন সেখানেই।

পাশেই নর্মদার তীরে ছোট্ট একটা অজ পাড়াগাঁ ছিলো এককালে—এখন সেখানে কোনো বসতি নেই। সংকীর্ণ গিরিখাত দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত একটি অঞ্চল। গিরিজন আদিবাসীরা বলে সেখানে নাকি এক পাগলি ঘুরে বেড়ায় কেবল—তিন বছর ধরে ওই পাগলি ওখানে আছে-একা-একা থাকে, আপন মনেই বিড়বিড় করে সারাক্ষণ কী যেন বকে, লোকের সামনে চুপ করে থাকে—সে-যে কোনদেশী স্ত্রীলোক কেউ জানে না —রাতের বেলায় মশাল হাতে তাকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় বলে লোকে তার নাম দিয়েছে বহ্নিশিখা।

তার সম্বন্ধে নানা আশ্চর্য গুজব শুনে বালাজি রাও অনেক খবর নিলেন। কিন্তু না, একেবারে উন্মাদিনী সে, চোখে শূন্য দৃষ্টি, কানে যেন কোনো অস্ফুটভাষা শোনে, বিড়বিড় করে কথা কয়, বদ্ধ উন্মাদ। এক অর্থে জীবস্মৃত। যেন কোনো অকথ্য বিভীষিকা তাকে স্বাভাবিক জগৎ থেকে কোনো অপার্থিব দুঃস্বপ্নের কোলে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—যেখানে

কোনো ভাষা নেই, দৃশ্য নেই, শব্দ নেই—যেটা নিতান্তই এক ইন্দ্রিয়হীন ভীষণ জগৎ যেন। এককালে রূপসী ছিলো, গৌরতনুতে তারই ক্ষীণ আভাস—কিন্তু সে-যে কোনকালে তা কেউ জানে না।

পাহাড়িরা নিরীহ গোবেচারিদের দয়া দেখায়। বহ্নিশিখাকেও কেউ কিছু বলে না। খেতে দেয়, আশ্রয় দেয়, ঘুরে বেড়াতে দেয় ইতস্তত। কিন্তু কে এই রহস্যময়ী? কতদিন ধরে সে এমনি উম্মাদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে? কোত্থেকে সে এসেছে? প্রথম কবে এলো সে গণ্ডোয়ানায়? কেন তার হাতে জ্বলন্ত মশাল থাকে সবসময়? কেউ এসব প্রশ্নের উত্তর জানে না। মাঝে-মাঝে কয়েক মাস আবার তার কোনো খোঁজই থাকে না। কোথায় যায় সে তখন? বিন্ধ্য-সাতপুরার পাহাড়ি জায়গা ছেড়ে চলে যায় সে? বুন্দেলখণ্ডে যায়? মালবে? কেউ জানে না। অনেক সময় আদিবাসীরা ভেবেছে বুঝি সে মরেই গিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ একরাতে আবার মশাল হাতে ফিরে এসেছে এই উম্মাদিনী। আসলে সে যেন কোনো চলন্ত প্রস্তরমূর্তি—তার মন মরে গেছে। কবেই-এখন কবে এই জীর্ণ মনুষ্যদেহ পোকায় কাটে, তা-ই বাকি আছে।

নানাসাহেবেরা যখন তাপ্তীর তীরে পৌঁছলেন, তখন বহ্নিশিখা আবার নিরুদ্দেশ। বালাজি রাও তার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করলেন, কিন্তু শেষটায় সবটাই তার মনে হলো আদিবাসীদের ভয়ার্ত কল্পনার অমূলক বিলাস। কারণ এক মাস কেটে গেলো-তবু সেখানে তার কোনো খোঁজ নেই। সেইজন্যেই নানাসাহেবের কাছে বহ্নিশিখার কথা তিনি খুলে বললেন না।

+

পুরো একমাস—১২ই মার্চ থেকে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত—নানাসাহেব ওই সংকীর্ণ গিরিসংকটে আত্মগোপন করে ছিলেন। উদ্দেশ্য : ইংরেজরা যাতে তার কোনো হদিশ-পেয়ে ভাবে যে তিনি নিশ্চয়ই মারা গেছেন, আর নয়তো বুনো হাঁসের পিছনে অন্যদিকে ধাওয়া করে চলে যায়। দিনের বেলায় দুই ভাই ঘাঁটি ছেড়ে ককখনো বেরুতেন না : রাত্রে অন্ধকারে গা ঢেকে নর্মদার তীর ধরে দু-ভাই গ্রাম থেকে গ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে আগুন ছিটোতে বেরুতেন—সকালে ফিরে এসে দু-ভাই আবার আলোচনায় বসতেন কেমন করে সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্বতের অগ্নিশিখা সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে দেয়া যায়। পুরো সিন্ধিয়া রাজ্যে, আর ভোপাল, মালব ও বুন্দেলখণ্ডে যাতে এক বিপুল ব্যুৎসব শুরু হয় তারই প্রস্তুতি চললো ধীরে, গোপনে, নিয়তির মতোই অনিবার্য যেন তার বেগ। যাতে সমস্তটাই একসঙ্গে একটা বারুদের স্কুপের মতো বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে, এই ছিলো তার উদ্দেশ্য।

কেটে গেলো একটি মাস। ততদিনে বম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজ্যপাল ধুন্ধুপন্থের কোনো হদিশ না-পেয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছেন, ভেবেছেন যে নিতান্তই একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ধুন্ধুপন্থের মাথার দাম হেঁকেছেন। কোনো উশকানি বা নতুন জনরব না-পেয়ে লোকের উৎসাহও ধীরে-ধীরে স্তিমিত হয়ে গেলো। আর গুপ্তচরেরা যখন একদিন এই খবর এনে দিলে, নানাসাহেব বেরুলেন বিদ্রোহের বীজ ছিটোতে।

১১ই এপ্রিল তাঁকে দেখা গেলো ইন্দোরে; ১৯শে এপ্রিল শুয়ারিতে; ২৪শে এপ্রিল মালব প্রদেশের প্রধান শহর ভীলশায়; ২৭শে তারিখ গেলেন রাজঘর, ৩০শে সাগর-নগরে;

নর্মদার উপত্যকায় ফিরে আসার আগে পুনে যেতে ভুললেন না; সব শেষে গেলেন ভোপালে।

ভোপাল মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল-সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানে আগুন জ্বলেনি। নানাসাহেব আর বালাজি রাও ভোপাল পৌঁছুলেন ২৪শে মে; সেদিন ছিলো মহরমের উৎসব; রাস্তায় মিছিল আর শোভাযাত্রা, তাজিয়া বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। হস্তিবাহিনী, হা হাসান! হা হোসেন! বলে চীৎকার উঠছে থেকে-থেকে। আর তারই মধ্যে গণ্ডোয়ানার জনা-বারো গিরিজন পরিবৃত হয়ে যোগীবেশে নানাসাহেব ও বালাজি রাও এগিয়ে যাচ্ছেন ভোপালের রাস্তা দিয়ে। সন্ধ্যা আসন্ন, অন্ধকার হয়ে আসছে। এমন সময় কে যেন নানাসাহেবের কাঁধে আস্তে আলত করে হাত রাখলে। ফিরে তাকিয়ে তিনি দ্যাখেন একটি বাঙালি দাঁড়িয়ে আছে; নানাসাহেব তাকে চিনতে পারলেন; বিদ্রোহের সময় এই বাঙালিটি একটি ছোট্ট বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়েছিলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন নানাসাহেব। বাঙালি যুবকটি ফিশফিশ করে বললে, কর্নেল মানরো কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন।

কোথায় আছে সে এখন?

তাকে কাল বারাণসীতে দেখেছি।

কোথায় যাচ্ছে?

নেপালের সীমান্তে।

মৎলব?

কয়েক মাস থাকবেন বোধহয় সেখানে।

আর তারপর?

বম্বাই ফিরবেন।

তীক্ষ্ণ একটা শিসের শব্দ শোনা গেলো। অমনি ভিড়ের মধ্য থেকে একটি লোক এসে নানাসাহেবের সামনে দাঁড়ালে। সে আর-কেউ নয়—কালোগনি।

এক্ষুনি যাও, বললেন নানাসাহেব, গিয়ে নেপালের পথে মানরোর দলে যোগ দাও। তার কোনো উপকার করো—দরকার হলে নিজের জীবন বিপন্ন করতেও পেছপা হোয়ো না। বিন্ধ্যপর্বতের কাছাকাছি না-আসা অব্দি কিছুতেই তার সঙ্গ ছেড়ো না। তারপর যখন সে নর্মদার উপত্যকায় এসে পৌঁছুবে–তখন—শুধু তখনই এসে আমাকে তার কথা জানিয়ে যাবে।

কালোগনি ঘাড় নেড়ে তক্ষুনি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো। দশ মিনিটের মধ্যে ভোপাল ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়লো। আর নানাসাহেব ফিরে এলেন নর্মদার উপত্যকার দিকে-তার গোপন ঘাঁটির উদ্দেশে। পথে সারাক্ষণ নানাসাহেব চুপ করে কেবল ভাবলেন মানরোর কথা; না-জেনে সে কেমন করে ক্রমশ তার কবলে এসে পড়বে–যেমন করে ময়ালের টানে তার মুখের কাছে এগিয়ে আসে নিরীহ জীবজন্তু। বালাজি রাওকে পর্যন্ত এ-সম্বন্ধে

এতক্ষণে কিছু বলেননি। তারপর যখন পাহাড়ের মাঝখানে পরিচিত বন্যপথে এসে বিশ্রামের জন্যে ঘোড়া থামিয়েছেন, তখন তিনি আস্তে-আস্তে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন।

মানররা কলকাতা থেকে বেরিয়েছে। বম্বাই আসবে নাকি শিগগিরই।

বম্বাইয়ের রাস্তা একেবারে ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে, বালাজি রাও বললেন।

এবার বম্বাইয়ের রাস্তা, নানাসাহেব স্পষ্ট করে জানালেন, বিন্ধ্য পর্বতে গিয়ে শেষ হবে।

এই উত্তর আর ব্যাখ্যা করার দরকার পড়ে না।

তখন সকালবেলা একটা পাহাড়ি নদীর কাছে তারা নেমেছেন; এবার নদীতীর ধরে উঠে যাবেন। অনুচররা ঘোড়াগুলো নিয়ে আগেই এগিয়ে গেছে। চারদিক এত স্তব্ধ যে নদীর জলের ছন্দ শুনে-শুনে পাহাড় যেন তখনও ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ এমন সময় গুড়ুম করে আওয়াজ হলো—তারপরেই এক সঙ্গে আরো-কতগুলো বন্দুক গর্জে উঠলো।

জনা-পঞ্চাশ গোরা সেপাই নিয়ে এক ইংরেজ অফিসার বন্দুক হাতে নেমে আসছে। ভাটির দিকে। কেউ যেন পালাতে না-পারে, গুলি চালাও, চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলে বাহিনীর নেতা।

একসঙ্গে আরেকবার গর্জে উঠলো বন্দুকগুলো, মাটিতে ছিটকে পড়লো কয়েকটি অনুচর। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই পাহাড়ি নদীর জলে-আর স্রোত তাদের মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। কোলাহল করে এগিয়ে এলো গোরা সৈন্যরা। এমন সময় ওই মুহূর্মুর স্কুপের

মধ্য থেকে একজন মাথা তুলে ভাঙা গলায় অভিসম্পাত দিলে, বিদেশীরা নিপাত যাক! তার কষ বেয়ে রক্ত বেরিয়ে গেলো গলগল করে, আর অসাড় দেহটা পড়ে গেলো মাটিতে।

বাহিনীর নেতা এগিয়ে এলেন।

এই কি নানাসাহেব?

হ্যাঁ, এই-ই নানাসাহেব, দুটি ফিরিঙ্গি জানালে-তারা কানপুরে ছিলো এক সময়, নানাসাহেবকে চিনতো।

তাহলে এবার অন্যদের পাকড়াতে হবে।

পিছন ধাওয়া করে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেলো সেই সমরবাহিনী।

আর তারা জঙ্গলের মধ্যে মেলাতে না-মেলাতেই একটা ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক ছায়ামূর্তি-সে আর-কেউ নয়, বহ্নিশিখা।

আগের দিন সন্ধেবেলায় এই বহ্নিশিখাই নিজের আগোচরে ইংরেজ বাহিনীটির অচেতন পথপ্রদর্শক হয়েছিলো। নর্মদার উপত্যকায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো একাকিনী, উদ্দেশ্যহীনা—আর উপজাতিরা যাকে বোকা ভাবতে বিড়বিড় করে বারেবারে সেই উম্মাদিনী আওড়াচ্ছিলো একটি নাম, জপমালার মতো : নানাসাহেব! নানাসাহেব। ফিরিঙ্গিদের নেতা সচমকে এই নাম শুনেই তাকে অনুসরণ করার আদেশ দেন। কিন্তু

উম্মাদিনী যেন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সচেতন ছিলো না—তাদের কোলাহল যেন একবারও তার কানে পৌঁছোয়নি, তাদের বাহিনী তার চোখে পড়েনি—তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন সংহত হয়ে কেবল একটি নামই বারেবারে উচ্চারণ করে যাচ্ছে, নানাসাহেব! আর তার পিছন পিছন এসেই অবশেষে এই বাহিনী নানাসাহেবদের মুখোমুখি পড়ে, গর্জে ওঠে বন্দুক, ভাঙা গলায় সাতপুরা বিন্ধ্যের পাহাড়ের কোলে রক্তরাঙা কথা কটি শোনা যায় : বিদেশীরা নিপাত যাক।

এর বিবরণই এলাহাবাদে বসে ২৬শে মে সন্ধেবেলা খবরকাগজে পড়েছিলেন কর্নেল মানরো, কারণ খবরটা তারযোগে বম্বাই থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে দমকা হাওয়ার মতো।

বহ্নিশিখার চোখের তারায় অদ্ভুত এক আলো জ্বলে উঠেছে; মৃতদেহের স্কুপের কাছে এসে সে ঝুঁকে দাঁড়ালে; তাকিয়ে দেখলে সেই মরণপণ-করা মানুষটির মৃতদেহ–তার সর্বাঙ্গ জুড়ে বিদেশীদের জন্য ঘৃণা। উম্মাদিনী পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো; বুকের যেখানে গুলি বিধেছে সেখানে হাত রাখলে; রক্তে তার ছিন্নবসন রাঙা হয়ে গেলো, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই, অপলকে সে তাকিয়ে আছে সেই কুলিশকঠোর মরাঠা মুখটির দিকে। তারপর ধীরে-ধীরে সে উঠে দাঁড়ালে, মাথা নাড়ালে কয়েকবার, আপনমনেই—যেন গাছপালা পাহাড় জলের কাছে কিছু বলতে চায় সে, তারপর ধীরেধীরে হেঁটে গেলো জঙ্গলের কালো পথে। আবার এক গভীর ঔদাসীন্য তাকে ঢেকে ফেললে আগাগোড়া। আর শোনা গেলো না তার মুখ থেকে কানপুরের সেই রক্তরাঙা নামটা।

শার্দুল ও শয়তান

আবার মঁসিয় মোক্লের-এর বিবরণী থেকে

মাতিয়াস ফান খোইত

আমাদের শিবির বসানো হয়েছে ধবলগিরির তলদেশে, সমুদ্রতল থেকে প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে, কলকাতা থেকে একহাজার মাইল দূরে। আমাদের ভ্রমণের প্রথম পর্যায় এখানে এসেই শেষ হয়েছে; কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম গ্রহণ করে অতঃপর আমরা যাবো দক্ষিণাপথে-কর্নেল মানরো পুনরায় অক্লান্ত সন্ধানে বেরুবেন তার চিরশত্রু নানাসাহেবের। জানি না কোনোদিন এঁরা দুজনে পরস্পরের মুখোমুখি হবেন কিনা– হয়তো পুরোটাই এক-অর্থে বন্যহংসের পশ্চাদ্ধাবন : তবু কর্নেল মানরোর পরিকল্পনার কোনো প্রতিবাদ আমরা করিনি। হয়তো ধীরে-ধীরে সমগ্র ভারত ভূখণ্ড ভ্রমণ করে আসার পর তার এই জ্বালা ও যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হবে। নানাসাহেব যদি সত্যি নেপালে আশ্রয় নিয়ে থাকেন, যদি তিব্বতের সীমান্তে তরাইয়ের জঙ্গলে সেই বিদ্রোহী মানুষটি জ্বলন্ত মশালের মতো জ্বলে-জ্বলে ঘুরে বেড়ান, তাহলে এই জায়গাটিই যে তার দেখা পাবার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত ও অনুকূল স্থল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের জীবন অত্যন্ত রহস্যময়-ভবিষ্যৎ কখন যে কাকে কী দেয়, তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো সেই রহস্যধূসর ভবিতব্যের প্রতীক্ষ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করণীয় নেই। তবু মাঝে-মাঝে সার এডওয়ার্ডের গম্ভীর ও থমথমে মুখের দিকে তাকালে আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে। কী-একটা চাপা বেদনা ও জ্বালা এই মানুষটিকে যুগপৎ কী-রকম অস্থির ও নিশ্চিন্ত করে রেখেছে।

এই অবস্থার মধ্যে একঝলক টাটকা হাওয়ার মতো হলো ক্যাপ্টেন হুড। মানুষটি ভালোবাসে হই-চই ও হাস্যরোল, লোকটা সে ছটফটে ও জ্যান্ত; প্রতিমুহূর্তেই অদ্ভুত

কোনো-কিছুর পরিকল্পনা করে যাচ্ছে। সার এডওয়ার্ডের সম্পূর্ণ উলটো বলা যায় তাকে। ভালোবাসে তর্কাতর্কি ও উত্তেজনা-নানা বিষয়ে কৌতূহল ও শখ রয়েছে— সার এডওয়ার্ডের মতো অমন একরোখা নয়। কেবল শার্দুলশিকারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই মানুষটি মুহূর্তে কীভাবে যেন একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। পঞ্চাশ নম্বর বাঘ তার চাই-ই-শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে এটাই বারেবারে সে ঘোষণা করে। এবং তার অনুচর ফক্স প্রত্যাশায় জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে।

ব্যাঙ্কস বোধহয় কর্মসূত্রে সারা ভারতবর্ষ চষে ফেলেছিলো। উপরন্তু এঞ্জিনিয়ার মানুষ, বিশেষ করে রেলে কর্ম করে বলেই ভারতের সব অঞ্চলের খবর রাখে। সে-ই আমাদের বোঝালে যে আমরা যেখানে শিবির ফেলেছি, সে-জায়গাটা শিমলা কিংবা দার্জিলিং-এর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। শিমলা অনেকটা সুইৎজারল্যাণ্ডের মতো, সুতরাং আমাদের কাছে সে ততটা নতুন নয়, বললে সে, আর দার্জিলিং-এর গৌরব হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঝলমলে শিখর—কিন্তু বৃষ্টি বা কুয়াশায় সেটা প্রায় সবসময়েই এমন লুকিয়ে থাকে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার অভুদয় আমাদের চোখের সামনে কতদিনে হতো কে জানে। তার চেয়ে ধবলগিরিই বা মন্দ কী?

ধবলগিরি আশ্চর্য! সেদিনই স্বচ্ছ স্পষ্ট সকালবেলায় ধবলগিরি উন্মোচিত হয়েছিলো আমাদের সামনে-সেই আশ্চর্য তুষারমৌলি গিরিশৃঙ্গের উজ্জ্বল দৃশ্যটি আমি কোনোদিনও ভুলবো কি না কে জানে।

তাছাড়া, ব্যাঙ্কস আরও বললে, এখানে শিবির ফেলে আমরা অন্যদিক থেকেও ভালো করেছি, মোক্লের। রাস্তাটা এখানে পাহাড়ের গায়ে দুটো ভাগ হয়ে গেছে-পুবে আর

পশ্চিমে। আর তারই ফলে আশপাশের ছোটো-ছোটো পাহাড়ি গ্রামগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে আমাদের মোটেই বেগ পেতে হবে না। সবচেয়ে কাছের গ্রামটা আমাদের স্টীম হাউস থেকে মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে। এখানকার পাহাড়ি মানুষেরা বেশ অতিথিবৎসল-ছাগল আর ভেড়া পোষে, শটি আর গম ফলায়-প্রয়োজন হলে অনায়াসেই আমরা তাদের সাহায্য নিতে পারবো।

বেহেমথ যেখানটায় আস্তানা গেড়েছে, সেটা একটা মালভূমিমাইল খানেক লম্বা আর আধমাইলটাক চওড়া। ছোটো-ছোটো ঘন মখমলের মতো ঘাসেভরা জায়গাটা; কোথাও কোথাও ভায়োলেট ফুটে আছে, কোথাও-বা রডোডেনড্রনের গুচ্ছ; ফুটেছে ক্যামেলিয়াও; আর কোথাও সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা ওকগাছ। এই সুন্দর বাগানটার পরিকল্পনা করার জন্য প্রকৃতি-ঠাকরুনকে স্মার্না কি ইস্পাহানের মালি ডাকতে হয়নি : বরং দখিনা হাওয়ায় উড়ে এসেছে কিছু বীজ, আর এই উর্বর ভূমিতে ঝরেছে কিছু রোদ-বৃষ্টি–আর সব মিলিয়ে আপনা থেকেই যেন তৈরি হয়েছে এই সুন্দর ভূদৃশ্য।

একপাশে চলে গেছে ঘন বন—প্রায় আঠারো হাজার ফুট অব্দি উঠে গেছে এই নিবিড় বনানী। ওক, সিডার, বীচ, মেপল গাছের সঙ্গেই কোথাও সহাবস্থান করছে বেণুবন, কোথাও-বা কলাগাছের ঝাড়, জাপানি ডুমুর গাছ। এ-রকমই একটা ছোট্ট শাখাঝোঁপের ছায়ায় বেহেমথ জিরিয়ে নেবে কয়েক সপ্তাহ-তার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও।

মঁসিয় পারাজারের খানাঘর থেকে সুগন্ধি ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে, আমরা চলন্ত বাড়ির বারান্দায় বসে-বসে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বোদ পোহাই আর জমাট আড্ডা দিই,

মাঝে-মাঝে ধবলগিরির গগনভেদী চুড়ো চোখে পড়ে, যখন হাওয়া এসে নিচু ভারি ঝোলামেঘ আর কুয়াশা সরিয়ে দেয়।

এইভাবেই ধবলগিরিতে আমাদের ছুটি শুরু হলো।

+

২৬শে জুন সকালবেলায় আমার ঘুম ভাঙলো ক্যাপ্টেন হুড আর ফক্সের জ্যান্ত সংলাপ শুনে—খাবার ঘরে বসে তারা শশব্যস্ত ও উত্তেজিত আলোচনায় মগ্ন ছিলো। আমিও গিয়ে তাদের বৈঠকে যোগদান করলুম। ব্যাঙ্কসও তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তক্ষুনি সে-ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখেই হুড বলে উঠলো : কী-হে ব্যাঙ্কস, তাহলে এখানে আর নেহাৎ দু-এক ঘণ্টার বিশ্রাম নয়—আস্ত কয়েকটি মাস কাটাতে হবে আমাদের?

ঠিকই বলেছো, হড, চেয়ার টেনে বসতে-বসতে ব্যাঙ্কস জবাব দিলে, এবার ইচ্ছে-করলে তোমরা শিকারে বেরুতে পারো—বেহেমথের বাঁশি শুনে তোমাদের আর তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসতে হবে না।

শুনলে তো, ফক্স?

শুনলুম, ক্যাপ্টেন, ফক্স জানালে।

হুড বললে, এই তোমাদের বলে রাখছি, ব্যাঙ্কস, আমার ওই পঞ্চাশ নম্বরটাকে ঘায়েল না-করে এই ধবলগিরি থেকে আমি আর নড়ছি না। পঞ্চাশ নম্বরটাকে চাই, ফক্স, চাই-ই। আমি ঠিক জানি হতভাগাকে ঘায়েল করা তেমন সহজ কর্ম হবে না।

তবু ঘায়েল তাকে করবোই আমরা, ফক্স বিনীতভাবে জানিয়ে দিলে।

আমি জিগেস করলুম, কী করে বুঝলে যে তাকে ঘায়েল করা তেমন সহজ হবে?

নেহাৎই আমার ধারণা, মোক্লের, তার বেশি কিছু নয়। শিকারিদের মাথায় মাঝেমাঝে আগে থেকেই অমন ধারণা ঢুকে বসে।

তাহলে তুমি আজ থেকেই বুঝি, ব্যাঙ্কস জিগেস করলে, শিকারে বেরুবার মৎলব আটছো?

আজ থেকেই শিকারের যাবতীয় শুলুক-সন্ধান নিতে হবে–তরাইয়ের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে হবে ময়না তদন্ত করতে। আগে তো গিয়ে দেখতে হবে বাঘেরা আমার আগমনবার্তায় ডেরা ছেড়ে পালিয়েছে কি না?

শোনো, কথা শোনো, কী অহংকার!

অহংকার নয়—আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলছি!

দুর্ভাগ্য। হিমালয়ের জঙ্গলে? তাও কি সম্ভব? জিগেস করলে ব্যাঙ্কস।

দেখাই যাবে শিগগিরই! হুড আমার দিকে ফিরলো! তুমিও সঙ্গে যাবে তো, মোক্লের?

নিশ্চয়ই যাবো।

আর তুমি, ব্যাঙ্কস?।

আমিও যাবো, বললে ব্যাঙ্কস, আর আমার মনে হয় মানরোও সঙ্গে যেতে চাইবেন—অবশ্য আমার মতো, অ্যামেচার হিশেবে, পেশাদার শিকারি হিশেবে নয়!

তা অ্যামেচার হিশেবে আসতে চাও আপত্তি নেই, তবে সঙ্গে গুলিভরা রাইফেল রেখো। ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে শৌখিন ফুলবাবুটির মতো জঙ্গলে যাবার মানে হয় না।–লজ্জায়-অপমানে সব জন্তুই শেষটায় মুখ লুকোবে।

তা-ই হবে তাহলে, ব্যাঙ্কস সম্মতি জানালে।

এবারে কিন্তু, ফক্স, দেখো, কোনো ভুল যেন না-হয়। খেয়াল রেখো। আমরা কিন্তু এবার বাঘের তল্লাটে। কর্নেল, ব্যাঙ্কস, মঁসিয় মোক্রের আর আমার জন্যে চারটে এনফিল্ড রাইফেল, তোমার আর গৌমির জন্যে দুটো বুলেটভরা বন্দুক!

ভয় নেই, ক্যাপ্টেন, ফক্স তাকে আশ্বাস দিলে, বাঘেরা নালিশ করার কোনো সময় বা কারণই পাবে না, এটাই আপনাকে জানিয়ে রাখছি!

বেলা এগারোটা নাগাদ, অতএব, আমরা দু-জনে যথাবিধি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জঙ্গলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম; কুকুর দুটোকে সঙ্গে নেয়া হলো না—কারণ এ-ধরনের শিকারে

কুকুরেরা কোনো কাজেই লাগে না। স্টর, কালু আর মঁসিয় পারাজারকে নিয়ে সার্জেন্ট ম্যাক-নীল বেহেমথেই থেকে গেলো—সব গোছগাছ করার জন্যে। তাছাড়া এই দু-মাস একটানা চলবার পর বেহেমথের কলকজা সাফসুফ করে রাখা দরকার। কোথাও কিছু বিকল হয়ে গেছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেজন্যে অবিশ্যি, বলাই বাহুল্য, অনেক সময় লাগবে, কারণ ভালো করে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখাই ভালো। আর সে-কাজে স্টর ও কালুর সাহায্য প্রতি মুহূর্তেই কাজে লাগবে।

বৃষ্টিবাদল নেই, পরিষ্কার উজ্জ্বল দিন। পাহাড়ি পথ, পাকদণ্ডী বেয়ে ঘুরে-ঘুরে নেমে গেছে জঙ্গলের দিকে। আমাদের অবিশ্যি হাঁটতে ভালোই লাগলো, যদিও সত্যিকার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে সময় লাগলো পাক্কা দেড় ঘণ্টা!

জঙ্গলে ঢোকবার আগে হুড আমাদের সবাইকে সম্বোধন করে ছোটোখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললে। যেহেতু আমরা এখন হিংস্র জন্তুর ডেরায় হানা দিতে যাচ্ছি। সেইজন্যে আমাদের একটু সাবধান থাকা উচিত-বাঘ মারতে গিয়ে শেষটায় বাঘেরই শিকার হয়ে-যাওয়াটা তেমন উপভোগ্য ঠেকবে না বলেই নাকি তার মনে হয়। সেইজন্যে—হুডের সুচিন্তিত পরামর্শ—আমরা যেন কিছুতেই দলছাড়া হয়ে না-যাই–আর, সর্বোপরি, মাথা ঠাণ্ডা রাখি যেন সবসময়।

তার মতো একজন জাঁদরেল শিকারির মুখ থেকে এই উপদেশ শুনে আমরা যথোচিত সতর্কহলুম। বন্দুকে গুলি ভরা হলো, চোখ-কান রইলো খোলা ও স্পর্শাতুর, এবং ভারতীয় জঙ্গলের ভয়াবহ সর্পকুলও যাতে আমাদের পদচুম্বন না-করে, সেইজনে, আরো-একডিগ্রি সাবধান হলুম!

সাড়ে-বারোটার পর আমরা বেশ গভীর জঙ্গলেই প্রবেশ করলুম! কাঠুরেদের পায়ে-চলার-পথ দিয়ে যাচ্ছি আমরা, সাবধানে, নিবিষ্টভাবে। ঝোপঝাড়ে কোনো টু-শব্দ হলেই বন্দুক উঁচিয়ে ধরছি, ঝোপঝাড় ও ডালপালাগুলোকে অবলোকন করছি সন্দেহের দৃষ্টিতে : কোথায় কোনখানে কোন বেশে জঙ্গলের আচম্বিত জান্তব মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে, কে জানে। মাঝে-মাঝে নিচু হয়ে মাটিতে জীবজন্তুর পায়ের দাগ দেখে বুঝছি যে ক্যাপ্টেন হুডের আশঙ্কা অমূলক—তার আগমনবার্তায় তরাইয়ের হিংস্র জন্তুরা আদপেই ডেরা ছেড়ে পালিয়ে যায়নি।

হঠাৎ হুডের মুখ থেকে একটা অস্ফুট চীৎকার শুনে আমরা সবাই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে গেলুম। তাকিয়ে দেখি, সামনেই প্রায় কুড়ি-পা দূরে একটি অদ্ভুত গড়ন। কোনো বাড়ি নয়–কারণ তার না-আছে কোনো চিমনি, না-আছে কোনো জানলা। কোনো শিকারির ডেরাও নয়, কারণ তাতে কোনো ফোকর বা গবাক্ষ কিছুই নেই। বরং পাহাড়ি-কোনো মানুষের সমাধিই হবে হয়তো এটা–জঙ্গলের গভীরে এখন হারিয়ে গেছে। লম্বা একটা চুরুটের মত আকার, পাশাপাশি গাছের ডাল বসিয়ে তৈরি-করা, মাটিতে শক্ত করে বসানো, মোটা-মোটা লতা দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। গাছের ডাল পেতেই ছাত হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, এটা যে বানিয়েছিলো, সে ব্যাপারটাকে মজবুত করার জন্যে কোনোকিছু করতেই বাদ রাখেনি। ছ-ফিট উঁচু, বারো ফিট লম্বা আর পাঁচ ফিট চওড়া একটা ব্যাপার—কোনো দরজা চোখে পড়লো না; হয়তো একটা দরজা ছিলো, কোনো দূরঅতীতে, কিন্তু এখন মোটা গাছের গুড়িতে ঢাকা পড়ে গেছে। একদিকে একটা লিভার রয়েছে, সেই লিভারটাই ছাতের উপরকার কয়েকটা লম্বা ডালকে টেনে রেখেছে, যেভাবে

লিভারের সঙ্গে এগুলো বাধা রয়েছে, তাতে লিভারের ভারসাম্য একটু এদিকওদিক হলেই ডালগুলো নিচে নেমে এসে ছাতের দিকটা পুরোপুরি আটকে দেবে।

আশ্চর্য তো! কী এটা? আমি জিগেস করলুম।

ব্যাঙ্কস ভালো করে সরেজমিন তদন্ত করলে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, কী আবার–নেহাৎই একটা ইঁদুরধরা ফাঁদ। অবশ্য ইঁদুরটা আসলে কী, সেটা অনুমান করার ভার তোমাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

বাঘ ধরার ফাঁদ নাকি? হুড জিগেস করলে।

হ্যাঁ, ব্যাঙ্কস বললে, বাঘ-ধরা–ফাঁদ। ওই-যে গাছের গুড়িটা দিয়ে দরজাটা আটকানো দেখছো, গুড়িটা আসলে ছাতের ওই ডালগুলো দিয়ে শুন্যে উঠে ঝুলছিলো–ভিতরে কোনো জন্তু ঢুকতেই তার ভারে আপনা থেকেই সেটা নিচে নেমে এসেছে!

এই প্রথম, হুড বললে, ভারতবর্ষের জঙ্গলে আমি এ-রকম কোনো ফাঁদ দেখলুম! ইঁদুর-ধরা-ফাঁদ-হুম কিন্তু এ-সব-ফাঁদ-টাদ আসলি শিকারিদের যোগ্য নয় মোটেই।

বাঘেরও সম্মান তাতে নষ্ট, ফকু যোগ করলে।

সে-কথা মানি, বললে ব্যাঙ্কস, তবে যখন এ-সব হিংস্র জন্তুকে শেষ করে ফেলাটাই সবচেয়ে জরুরি কাজ হয়ে দাঁড়ায়-ফুর্তি বা আমাদের জন্যে শিকার নয়, কোনো হিংস্র জন্তুদের ধ্বংস করাটাই যখন বাধ্যতায় পরিণত হয়, তখন যেনতেন প্রকারেণ কাজ

হাশিল করাই তো ভালো-তাছাড়া ফাঁদ পেতে ধরলে সংখ্যাতেও বেশি পাওয়া যায়। এই ফাঁদটা আমাকে কিন্তু খুবই আকৃষ্ট করছে—অত্যন্ত চতুর-কোনো লোকের কাজ এটা, সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে এতটা কুলোত না। এমন আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তি সচরাচর দেখা যায় না।

এতক্ষণে কর্নেল মানরো কথা বললেন, আমি একটা কথা বলবো? গাছের গুড়িটা নেমে পড়ে দরজাটা যখন বন্ধ করে দিয়েছে, তখন ভিতরের ভারসাম্যটা কোনো কারণে নিশ্চয়ই নষ্ট হয়েছে। সম্ভবত আচমকা কোনো বুনো জন্তু ঢুকেছিলো ভিতরে, আর তাতেই ফাঁদের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে।

সেটা আমরা এক্ষুনি জানতে পারবো, বললে হুড। আর ভিতরের ইঁদুরটা যদি এখনও জ্যান্ত থাকে— বলেই হুড বন্দুক তুলে বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল ছোঁয়ালে। দেখাদেখি আমরাও সে-দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলুম।

ক্যাপ্টেন হুড, ফক্স আর গৌমি প্রথমে ফাঁদটার চারপাশে ঘুরে দেখলে কোথাও এতটুকু ফুটো চোখে পড়ে কি না। ভিতরটায় কী আছে, একবার যদি কোনোরকমে বাইরে থেকে দেখা যেতো!

কিন্তু কোথাও চুলমাত্র ফঁক দেখা গেলো না।

তখন উৎকর্ণ হয়ে তারা শোনবার চেষ্টা করলে ভিতর থেকে কোনো আওয়াজ আসে কি না। কিন্তু সব কী-রকম যেন গোরস্থানের মতো নিঃঝুম ও স্তব্ধ। ভারি অস্বস্তিকর।

তখন আবার সামনে এসে গাছের গুড়িটা তারা পরীক্ষা করলে। দুটো মোটা লতা আকড়ে ধরে আছে গুড়িটা-লিভারটায় চাপ দিয়ে ওটাকে শুন্যে তুললেই ফাদের দরজা খুলে যাবে।

টু-শব্দটিও তো শুনলুম না—এমনকী নিশ্বেসের শব্দ অব্দি না, দরজায় কান লাগিয়ে হুড শোনবার চেষ্টা করলে, ফাঁদটা নিশ্চয়ই ফাঁকাই পড়ে আছে।

ফাঁকা হলেও সাবধানের মার নেই, কর্নেল মানরো বাঁদিকটায় একটা গাছের গুড়ির উপর বসে পড়লেন। আমি গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালুম।

হুড তখন গৌমিকে ডাক দিলে ডাক শুনেই গৌমি বুঝে নিলে তাকে কী করতে হবে। একলাফে সে গিয়ে হাতে উঠে পড়লো, তারপর সেই লিভারটার কাছে গিয়ে আস্তে সেটাকে আঁকড়ে ধরলে—অমনি তার ভারে চট করে গাছের গুড়িটা শূন্যে উঠে গেলো, আর গৌমি লিভারটা আঁকড়ে ধরে ঝুলতে লাগলো।

যতটা ফাঁক হলো তাতে যে-কোনো মস্ত জন্তুও অনায়াসেই বেরিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ছোটো-বড়ো কোনো জন্তুরই কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। হয়তো আমাদের কথাবার্তা ও ফাঁদের ডালপালার আওয়াজে বন্দী জানোয়ারটি ফাঁদের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে ঘাপটি মেরে আছে—হয়তো সুযোগ বুঝে লাফিয়ে বেরুবে হঠাৎ দুম করে–আর চট করে জঙ্গলে মিলিয়ে যাবে।

উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করতে লাগলো।

হঠাৎ দেখি, ক্যাপ্টেন হুড বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল চেপে ফাঁদের দরজার কাছে গিয়ে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছে। বনের ডালপালার আড়াল দিয়ে আলো এসে পড়েছে দরজার সামনে, ভিতরে কী আছে দেখতে কোনো অসুবিধেই হবার কথা নয়।

হঠাৎ শুনতে পেলুম ভিতরে অস্পষ্ট একটু খশখশে শব্দ হলো, তারপরেই ঘোঁৎ করে একটা গর্জন—সব যেন কেমন সন্দেহজনক। বোধহয় ভিতরে কোনো জানোয়ার ঘুমুচ্ছিলো, এখন পাশ ফিরে শব্দ করে হাই তুলছে।

হুড আরো এক-পা এগিয়ে গেলো; ভিতরে কালো-মতো কী-একটা যেন নড়ে উঠলো, বন্দুকটা তার দিকেই তাগ-করা। হঠাৎ এমন সময় কে যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, তার পরেই স্পষ্ট ও চমৎকার ইংরেজিতে কে যেন বলে উঠলো : গুলি করবেন না! দোহাই ভগবানের, গুলি করবেন না। বলতে-বলতে ভিতর থেকে কে-একজন বেরিয়ে এলো।

আমরা এতটাই অবাক হয়ে গিয়েছিলুম যে গৌমি লিভার ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নামলো নিচে, অমনি ধপ করে গাছের গুড়িটা আবার মাটিতে পড়ে ফাঁদের দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

ততক্ষণে সেই অপ্রত্যাশিত মানুষটি হুডের দিকে এগিয়ে গেছেন, স্পষ্ট স্বরে বলছেন, দয়া করে বন্দুকটা একটু নামাবেন, আমি বাঘ নই—আপনাকে বাঘের সঙ্গে বোঝাঁপড়া করতে হবে না।

একটু ইতস্তত করে হুড বন্দুকটা নামিয়ে নিলে।

ব্যাঙ্কস এগিয়ে এলো এবার। কার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য পেলুম জানতে পারি কি?

প্রকৃতিবিজ্ঞানী মাতিয়াস ফান খোইত-লণ্ডনের মিস্টার চার্লস রাইস আর হামবুর্গের হের হাগেনবেকের জন্যে পাচিডেরমাট, টার্ডিগ্রেডস, প্ল্যান্টিগ্রেডস, প্রাোবোস্কিড়েট ও কার্নিভোরা যোগাড় করতে বেরিয়েছি। তারপর হাত নেড়ে আমাদের দেখিয়ে বললেন : এঁরা?

কর্নেল মানরো ও তার বন্ধুবান্ধব, বললে ব্যাঙ্কস।

হিমালয়ের জঙ্গলে বেড়াতে বেরিয়েছেন? ফান খোইত বললেন, সত্যি, ভারি সুন্দর জঙ্গল। .....আপনারা আমার নমস্কার নেবেন?

কে এই অদ্ভুত মানুষটি? মাথায় কিছু পোকা আছে বোধহয়—নয়তো এভাবে বাঘের ফাঁদে বন্দী থেকেই ঘিলু নিশ্চয়ই ভেস্তিয়ে গেছে।

মাতিয়াস ফান খোইতের বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি; চোখে পুরু চশমা, তার আড়ালে চোখের তারা ঝিকমিক করছে, মসৃণ মুখ, একটু উন্নাসিক, প্রতিমুহূর্তেই অস্থির হয়ে আছেন, অঙ্গভঙ্গিসহকারে এমনভাবে কথা বলেন যে মনে হয় মফস্বলের রঙ্গমঞ্চের কোনো কৌতুক অভিনেতাই বুঝি-বা হবেন। চোখে-মুখে কথা বলেন, প্রতিমুহূর্তে ভঙ্গি করেন নাটকীয়, মাথাটার অন্তঃস্থলে কিছু আছে কিনা জানি না—তবে সবসময়েই মাথাটা একটু কাৎ করে আছেন।

পরে অবিশ্যি আমরা তারই মুখ থেকে জানতে পেলুম যে তিনি আগে টারডাম সংগ্রহশালায় প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু শিক্ষকতায় তেমন উন্নতি করেননি। নিশ্চয়ই ছাত্রেরা ক্লাসে তার ভাবভঙ্গি দেখে হাস্যরোল বন্ধ করতে পারতো না; তারা যে তার ক্লাসে ভিড় করে আসতো, তা নিশ্চয়ই জ্ঞানস্পৃহাবশত নয় বরং কিঞ্চিৎ মজা করে নেবার জন্যে। শেষটায় জীববিদ্যার অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিজে পশুশালায় কর্ম নিলেন—দেখা গেলো তত্ত্বকথা বলার চেয়ে পশু সংগ্রহেই তিনি অধিকতর পারঙ্গম। ক্রমে তিনি লণ্ডন ও হামবুর্গের দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পশু সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। এখন তিনি তরাইতে এসেছেন ইওরোপ থেকে মস্ত একটা অর্ডার পেয়ে—অনেক জন্তু ধরে নিয়ে যেতে হবে তাকে। যেখানে তিনি ছাউনি ফেলেছেন, সে-জায়গাটা এই ফাঁদ থেকে মাইল দু-এক মাত্র দূরে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাতিয়াস ফান খোইতের জীবনচরিত আমাদের জানা হয়ে গেলো, কিন্তু তবু সেই রহস্য কিছুতেই ভেদ হলো না তিনি কেমন করে ওই ফাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। শেষটায় ব্যাঙ্কস এ-বিষয়ে তাকে সরাসরি জিগেস করে বসলো। জানা গেলো, কাল বিকেলে তিনি তার কাল থেকে এই ফাঁদটা দেখতে এসেছিলেন—সঙ্গে অবশ্য ভৃত্যেরা ছিলো কিন্তু তারা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলো বলে তিনি একাই এই ফঁদটার মধ্যে ঢুকে পড়েন। ঢুকেছিলেন লিভারটা কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। ঢোকবামাত্র হঠাৎ কেমন করে যেন তার হাত লেগে দড়িটা ঢিলে হয়ে যায় আর তিনি আবিষ্কার করেন যে তিনি নিজের ফাদে নিজেই বন্দী হয়ে গেছেন; এবং উদ্ধার পাবার উপস্থিত কোনো আশাই আর নেই।

এতখানি বলে মাতিয়াস ফান খোইত একটু থামলেন-বোধহয় অবস্থার গুরুত্বটা বোঝবার সময় দিলেন আমাদের। তারপর আবার শুরু করলেন, একবার বুঝুন ব্যাপারটা-মস্ত একটা ঠাট্টা নয় কি? প্রথমটায় এই হাসির দিকটাই আমার চোখে পড়লো : নিজের ফাঁদে নিজে বন্দী! ভেবেছিলুম, আমার অনুচরেরা ক্রাল*-এ ফিরে গিয়ে আমাকে না-দেখতে পেয়ে খোঁজ নিতে বেরুবে–মুক্তি পেতে বেশি দেরি হবে না। কিন্তু সন্ধে হয়ে গেলো, রাত হয়ে গেলো-তবু তাদের কোনো পাত্তাই নেই। শেষটায় তাদের জন্যে বসে থেকে-থেকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েই পড়লুম। হঠাৎ কীসের শব্দ শুনে ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখি দরজা খোলা, ভিতরে আলো, এবং আমার বুক লক্ষ্য করে বন্দুক তোলা! আরেকটু হলেই অকালেই অক্কা পেতুম আর-কি! মুক্তির মুহূর্ত আর মৃত্যুর মুহূর্ত এক হয়ে যেতো। কিন্তু শেষটায় ক্যাপ্টেন যখন দেখলেন যে আমিও হোমো সাপিয়েনের একজন, তখন বন্দুক নামালেন। তা আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাই—আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে।

তাহলে আপনিও তরাইয়ের এদিকটায় ছাউনি ফেলেছেন? ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

হ্যাঁ, বললেন মাতিয়াস ফান খোইত। আগেই বোধহয় আপনাদের বলেছি যে আমার ক্রালটা এখান থেকে মাত্র মাইল দু-এক দূরে; আপনারা অনুগ্রহ করে সেখানে পদধূলি দিলে আমি যথার্থই কৃতার্থ হব।

নিশ্চয়ই, মিস্টার ফান খোইত, বললেন কর্নেল মানরো, আমরা গিয়ে আপনার ক্রাল দেখে আসবো।

শিকার করতে বেরিয়েছি আমরা, হুড তাকে জানালেন, কাজেই ক্রাল-এ আপনি কী ব্যবস্থা করেছেন, দেখলে নিশ্চয়ই অনেককিছু শিখতে পারবো।

শিকারে বেরিয়েছেন? মাতিয়াস ফান খোইত চেঁচিয়ে উঠলেন, শিকারি? বুনো জানোয়ার খুঁজে বার করেন—সে শুধু তাদের মারবার জন্যে?

হ্যাঁ, মারবার জন্যে,–উত্তর দিলে হুড।

আপনি তাদের মারেন, আর আমি তাদের ধরি, গর্বের স্বরে বললেন ফান খোইত।

তা আর কী করবেন? আমাদের দু জনের দেখবার ধরন আলাদা, বললে হুড।

ফান খোইত অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকালেন কেবল। কিন্তু আমরা শিকার করতে বেরিয়েছি জেনেও তিনি তার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে নিলেন না। তাহলে চলুন, ক্রাল-এর দিকেই এগুনো যাক।

কিন্তু তার মুখের কথা মেলাবার আগেই দূরে কাদের যেন গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো। একটু পরেই গাছপালার আড়াল থেকে উঁকি দিলে জনা ছয়েক স্থানীয় লোক।

এই-যে—এরাই আমার অনুচর, বললেন ফান খাইত, তারপর আমাদের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মুখে আঙুল দিয়ে নিচু গলায় বললেন, কিন্তু আমার ওই দুর্দশার কথা ওদের বলবেন না। আমি যে নিজের ফাদেই নিজে গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিলুম, তা যেন তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে না-পারে। তাহলে ওদের চোখে আমি হয়তো অনেকটাই খাটো হয়ে যাবো।

আমরা ইঙ্গিতে তাকে আশ্বস্ত করায় তবে তিনি শান্ত হলেন।

ইতিমধ্যে তার অনুচরদের মধ্য থেকে একজন চটপটে ও চালাক লোক এগিয়ে এলো। হুজুর, আমরা আপনাকে একঘণ্টারও বেশি সময় খুঁজে বেড়াচ্ছি...

আমি এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলছিলুম শোনো, এঁরা আমাদের ক্রাল দেখতে যেতে চাচ্ছেন—কিন্তু ক্রাল-এ ফেরবার আগে ফাঁদটাকে ঠিকঠাক করে দাও তো।

অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ ফাঁদটাকে ঠিকঠাক করতে লেগে গেলো। আমরাও ততক্ষণে ফাদের ভিতরটা একবার ভালো করে অবলোকন করে এলুম।

সত্যি, ভারি কৌশলী ফাঁদটা। এমনকী হুড শুক্কু প্রশংসা না-করে পারলে না। আর তার প্রশংসা শুনেই ফান খোইত পুনর্বার বললেন, আপনি তো দুম করে গুলি ছুঁড়েই খালাশ–মেরে ফেললেই ল্যাঠা চুকে গেলো। আমাকে কিন্তু জ্যান্ত ও অক্ষত অবস্থায় এদের পাকড়াতে হয়।

তা তো বটেই—আমাদের দুজনের দেখবার ভঙ্গিটাই আলাদা, আবারও বললে হুড়।

আমারটাই বোধকরি আদর্শ উপায়। অন্তত জন্তুদের যদি একবার জিগেস করে দ্যাখেন

ফান খোইতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হুড বললে, আমার অবিশ্যি সে-ইচ্ছে আদৌ নেই।

বুঝলুম, ফান খোইত আর ক্যাপ্টেন ইডের মধ্যে অহরহ এ-রকম কথা কাটাকাটি হতে থাকবে। তক্ষুনি হয়তো দুজনের মধ্যে একটা ছোটোখাটো তর্ক বাধতো, কিন্তু হঠাৎ বাইরে একটা প্রবল শোরগোল উঠলো। হুড়মুড় করে আমরা বেরিয়ে এলুম।

বাইরে এসে দেখি, কর্নেলের পায়ের কাছে একটা ভীষণ বিষাক্ত সাপ দু-টুকরো হয়ে পড়ে আছে, আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক, তার হাতে একটা গাছের ডাল। লোকটা আর কেউ নয়, ফান খোইতের সেই সপ্রতিভ ও বুদ্ধিমান অনুচরটি। সে যদি হাতের ডালটা দিয়ে নামারতো তাহলে সার এডওয়ার্ড এতক্ষণে সর্পাঘাতেই মরতেন। ভিতর থেকে আমরা যে-চীৎকার শুনেছিলুম, তা ফান খোইতের আরেকজন অনুচরের। মাটিতে পড়ে সে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, কারণ আহত সাপটা সামনেই তাকে পেয়ে তক্ষুনি তাকে ছুবলে দিয়েছে।

কর্নেল মানরোর কাছে ছুটে গেলুম আমরা।

আপনার লাগেনি তো?

না, আমার কিছু হয়নি, বললেন সার এডওয়ার্ড। তারপর সেই ভারতীয়টির দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

ভারতীয়টি ইঙ্গিতে জানালে যে সে ও-সব ধন্যবাদ-টন্যবাদের কোনো ধার ধারে।

কী নাম তোমার? জিগেস করলেন কর্নেল মানরো।

সেই হিন্দুটি উত্তর দিলো, কালোগনি।

———-

*ক্রাল একটা ওলন্দাজ শব্দ, তার মানে ছোট্ট গ্রাম। বিশেষ করে ওলন্দাজ আফ্রিকার ছোট্ট বসতিকেই হ্যাঁল বলে অভিহিত করা হয়।

ক্রাল

দুর্ভাগা লোকটির অতর্কিত সর্পাঘাত মৃত্যু আমাদের উপর একটা গভীর ছাপ ফেলে গেলো। একে তো এ-রকম মৃত্যু মাত্রেই ভয়ংকর, তার উপর একদিক থেকে সে কিনা মরলো সার এডওয়ার্ডকে বাঁচাতে গিয়ে।

সেই কালান্তক বিষে ততক্ষণে ভারতীয়টির দেহ নীল ও শক্ত হয়ে গিয়েছিলো। অন্যরা তাড়াতাড়ি একটা কবর খুঁড়ে সেখানেই তাকে সমাহিত করলে, যাতে তার মরদেহটা অন্তত বন্য জন্তুদের ক্ষুধিত গ্রাস থেকে রক্ষা পায়।

এই মন-খারাপ-করা অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে যাবার পর মাতিয়াস ফান খোইতের আমন্ত্রণে আমরা তার সঙ্গেই ক্রালের উদ্দেশে চললুম।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ফান খোইতের ক্রাল-এ গিয়ে পৌঁছলুম। মস্ত একটা চওড়া জায়গা, বেড়া দিয়ে ঘেরা; ক্রালের দরজাটা বেশ প্রশস্ত, যাতে অনায়াসেই মোষটানা-গাড়ি ঢুকতে পারে। ভিতরে লম্বা একটা খোড়ো বাড়ি, গাছের ডাল ও তক্তা জুড়েজুড়ে তৈরি। ঘেরা জায়গাটার বাঁ প্রান্তে ছ-টা মস্ত খাঁচা, খাঁচাগুলো আবার কোঠাওলা, উপর তলায় চাকা রয়েছে, যাতে মোষ-টানা-গাড়ির সঙ্গে জুতে দিলেই খাঁচাগুলো নিয়ে রওনা হয়ে পড়া যায়। খাঁচার ভিতর থেকে যে-রকম গররর গর্জন উঠলো, তাতে স্পষ্টই বোঝা গেলো যে সেগুলো আদৌ প্রাণীবিবর্জিত নয়।

এ-ছাড়া রয়েছে গোটা-বারো মোষ, পাহাড়ের ঘাস খেয়েই তারা বেঁচে আছে। তারাই এই সচল পশুশালা নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ায়। ছ-টি লোক আছে। এই মোষগুলোর তদারকি করা ও গাড়ি চালাবার জন্যে—আর জনাদশেক লোক রয়েছে। জন্তুগুলোকে গ্রেপ্তার করার জন্যে বাস, এই হলো ক্রাল-এর লোকজনদের তালিকা।

গাড়িওলাদের ভাড়া করা হয়েছে কেবল এই অভিযানের জন্যেই; কাছের রেলওয়ে স্টেশনে জন্তুগুলোকে পৌঁছে দিলেই তাদের ছুটি। সেখান থেকে রেলে করে এলাহাবাদ হয়ে এরা যাবে কলকাতা কি বম্বাই-সেখান থেকে ইওরোপ।

ফান খোইত তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে কয়েক মাস হলো এই ক্রাল-এই রয়েছেন। কেবল যে তরাইয়ের বন্য জন্তুদের ভয়ই রয়েছে এখানে, তা নয়—এখানকার ভীষণ কালান্তক জ্বরের ভয়ও রয়েছে প্রতি মুহূর্তে। স্যাঁৎসেঁতে ভেজা রাত্তির, মাটি থেকে ওঠা ভ্যাপশা ঠাণ্ডা গন্ধ, গাছের ডগায় ঝুলে থাকা ভিজে-ভিজে রোদুর—সবকিছু মিলে হিমালয়ের এখানটা ভীষণ অস্বাস্থ্যকর। একবার ম্যালেরিয়া ধরলে আর রক্ষে নেই। এই ম্যালেরিয়া এমনকী তরাইয়ের বাঘের বাচ্চাদের চেয়েও মারাত্মক। সুতরাং এই ক্রালএ এসে আশ্রয় নিয়ে আমাদের কোনোই লাভ নেই—হয়তো দু-এক রাত্তির কাটানো যেতে পারে, তাছাড়া বাকি সময়টা স্টীম হাউসে কাটানোই আমাদের পক্ষে শ্রেয়।

আমরা কাল দেখতে যাওয়াতে মাতিয়াস ফান খোইত খুব খুশি। ঘুরে-ঘুরে জীবজন্তুর সংগ্রহ দেখালেন তিনি আমাদের, অনর্গল কথা বললেন জহুজানোয়ার সম্বন্ধে–অনেক বৈজ্ঞানিক নাম ও লাতিন অভিধায় ভূষিত তার বক্তৃতা থেকে বোঝা যাচ্ছিলো। নিজের বিষয়টা তিনি ভালোই বোঝেন।

তবু ক্যাপ্টেন হুডের সঙ্গে তার কথাবার্তা হলো অতিশয় চিত্তাকর্ষক। সেই পুরোনো তর্কটা বারেবারে উত্থাপিত হলো—শিকার ভালো, না জন্তু-জনোয়ার ধরে পোষ মানানো ভালো। এবং বলাই বাহুল্য তর্কের কোনো স্পষ্ট মীমাংসা হলো না। শেষটায় দুজনেই যখন একযোগে নিজের-নিজের নেশা ও খেয়ালের গুণকীর্তন শুরু করে দিলেন, তখন ব্যাঙ্কস মাঝখানে পড়ে তাদের বাদ-প্রতিবাদ থামালে।

অবশেষে তর্কটা দাঁড়ালো এইরকম : বনের রাজা কোন জন্তু? সিংহ, না হাতি, বাঘ? লিবিয়ার জঙ্গল বেশি ভয়ংকর, না সুন্দরবন? ফান খোইত শেষটায় বাঘকেই বনের রাজা বলে ঘোষণা করলেন;-বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজাবাঘের হালুম নিনাদ—তিনি বললেন—অরণ্যের সবচেয়ে ভয়ংকরসুন্দর শব্দ। এ-বিষয়ে অবশ্য ক্যাপ্টেন হুডের সঙ্গে তার বিশেষ মতভেদ দেখা গেলো না। এবং জঙ্গলে সবচেয়ে ভীষণ জন্তু যে বাঘই হয়—বিশেষ করে সে যদি কখনও নরমাংসের স্বাদ পেয়ে থাকে–এ-বিষয়েও তারা অবশেষে একমত হলেন।মানুষখেকো বাঘের চেয়ে ভীষণ আরকিছু নেই, এটা সত্যি, অবশেষে ফান খোইত সিদ্ধান্ত জানালেন, তবে স্বভাবকে নামেনে তাদের উপায় কী? একটু হেসে আরো যোগ করলেন, তাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে।

তাঁর এই মন্তব্যের পরই আমরা কাল থেকে ফেরবার সময় হয়েছে বলে সাব্যস্ত করলুম। কেননা আমাদেরও খেয়ে বাঁচা দরকার ছিলো। বলাই বাহুল্য, ক্রাল থেকে বিদায় নেবার সময় ভাবভঙ্গি দেখে এমনিতে মনে হবার জো নেই যে ফান খোইত আর ক্যাপ্টেন হুডের মধ্যে কোনোদিন বন্ধুতা সম্ভব, অথচ হুড আর ফান খোইতের মধ্যে শেষ পর্যন্ত গলাগলি ভাব হয়ে গিয়েছিলো, যদিও দুজনের মতামত ছিলো একেবারেই বিপরীত।

একজনের স্বপ্ন তরাই থেকে বন্যজন্তু নির্মূল করা, অন্যজনের জীবিকা তাদের ধরে দেশ-বিদেশে চালান দেয়া; তবু জঙ্গল সম্বন্ধে অন্য-অনেক বিষয়ে দুজনের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা গেলো না। বরং ঠিক হলো যে ক্রাল আর স্টীম হাউসের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন করা চলবে না। ফান খোইত যেমন ক্যাপ্টেন হুডের অভিপ্রায় স্মরণে রাখবেন, তেমনি আমরাও কোনো চিত্তাকর্ষক জন্তু পেলে যেন তাকে খবর দিই। ফান খোইত তো তার সব শিকারিকেই ক্যাপ্টেন হুডের হাতে ছেড়ে দিলেন, বিশেষ করে কালোগনি, কারণ তারা এ-অঞ্চলের হালচাল ভালো করে জানে বলে সহজেই বন্য জন্তুদের হদিশ দিতে পারবে—আর কালোগনি এদেরই মধ্যে অত্যন্ত চালাকচতুর ও ক্ষিপ্র; ক্রাল-এর কাজে সদ্য নিযুক্ত হলেও তার উপরে অনায়াসে এসব বিষয়ে নির্ভর করা যায়। এর বদলে—হুড প্রতিশ্রুতি দিলে—সেও যথাসাধ্য চেষ্টা করবে যাতে ফান খোইত বাকি জন্তুগুলো শিগগিরই পাকড়ে ফেলে তার কোটা পূর্ণ করতে পারেন।

ক্রাল ছেড়ে আসার আগে সার এডওয়ার্ড আবার কালোগনিকে তার কৃতজ্ঞতা জানালেন; বললেন, যখনই সে স্টীম হাউসে যাবে, তখনই সে সেখানে স্বাগত হবে। শুনে কালোগনি ঠাণ্ডাভাবে তাকে একটা সেলাম করলে। লোকটা যেন পাথরে-খোদাই করা; বাইরেটা দেখে কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই ভিতরে ভিতরে সে কী ভাবছে। নিশ্চয়ই সার এডওয়ার্ডের কৃতজ্ঞতায় ভিতরে ভিতরে সে খুশি হচ্ছিলো, কিন্তু তার মুখ দেখে সেটা বোঝার কোনো জো ছিলো না।

তরাইয়ের রানী

পর-পর কয়েকদিন ধরে এমন একটানা বৃষ্টি পড়লো যে শেষটায় আমাদের বিরক্তি বোধ হতে লাগলো। আকাশে সূর্যের দেখা নেই; ছাইরঙা ভারি নিচু মেঘ ঝুলে আছে। সারাদিন, মাঝে-মাঝে বাজ পড়ছে, অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে–হুডের শিকারে যাবার পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেলো বলে তার সে কী বিষম রাগ! শেষটায় জুন মাসের শেষদিনে আকাশ একটু পরিষ্কার হবার লক্ষণ দেখালো। হুড, ফক্স, গৌমি আর আমি ঠিক করলুম বৃষ্টি থামলেই ক্রাল-এ গিয়ে হাজির হবো—সেখান থেকে ফান খোইতের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে অবশেষে বেরুবো বাঘের খোঁজে।

বৃষ্টি থামতেই সেদিন আমরা তাই বেরিয়ে পড়লাম।

খানিকক্ষণ যাবার পর সেই বাঘ-ধরা-ফঁদটার কাছে এসে দেখি খোদ ফান খোইত। সশরীরে কালোগনি ও আরো পাঁচ-ছজন অনুচরসহ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাত্তিরে ফাদে একটা বাঘ পড়েছিলো, কালোগনিরা সেটাকে মোষ-টানা-খাঁচায় তুলতে শশব্যস্ত।

বাঘটা সত্যি রাজার মতো। পেশল বলিষ্ঠ শরীর; দেখেই তো হুডের ঈর্ষা হতে লাগলো। আরো একটা কমলো তরাই থেকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফক্সকে সে জনান্তিকে জানালে।

ফান খোইত কিন্তু কথাটা শুনে ফেলেছিলেন। তিনি বলে বসলেন, আরো-একটা বাড়লো আমার সংগ্রহে। এখনও আরো-দুটো বাঘ, একটা সিংহ, দুটো চিতাবাঘ চাই আমার–না-

হলে সব চাহিদার জোগান দেয়া যাবে না। তা, আপনারা কি আমার সঙ্গে ক্রাল-এ যাবেন নাকি?

ধন্যবাদ, হুড বললে, কিন্তু আজকে আমরা নিজেদের হাতের কাজেই ব্যস্ত থাকবো।

তাহলে কালোগনিকে সঙ্গে নিতে পারেন, বললেন ফান খোইত, এখানকার জঙ্গল ওর নখদর্পণে—হয়তো আপনাদের কাজে লাগবে।

পথ দেখাবার জন্যে ওকে আমরা সানন্দেই নেবো।

তাহলে আমি বাঘটাকে নিয়ে এখন চলি। আশা করি আপনাদের নিরাশ হতে হবে না—তবে জঙ্গল থেকে সবগুলো জানোয়ারই সাবাড় করে দেবেন না যেন। এই বলে মাতিয়াস ফান খোইত অনেকটা নিচু হয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে আমাদের অভিবাদন করে খাঁচায় গর্জাতে-থাকা বাঘটাকে নিয়ে সদলবলে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কেবল কালোগনি রয়ে গেলো আমাদের জঙ্গলের মধ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

তাহলে, মোক্লের, চলো এবার আমার বিয়াল্লিশ নম্বরের সন্ধানে।

আপনার বিয়াল্লিশ, আর আমার আটত্রিশ, তক্ষুনি ফক্স পুরো হিশেবটা জানিয়ে দিলে।

শুনে আমিও বললুম, এবং আমার এক নম্বর-কিন্তু আমার কথা বলার ভঙ্গি দেখে হুড একেবারে হেসে ফেললে; স্পষ্ট বোঝা গেলো, আমার কণ্ঠস্বরে তার মতো দিব্য আগুনের ছোঁয়াচ ছিলো না।

কালোগনির দিকে ফিরে হুড জিগেস করলে, তাহলে এখানকার জঙ্গল তুমি ভালো করে চেনো?

অন্তত কুড়িবার, দিনে-রাতে, এই জঙ্গল দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে, বললে কালোগনি।

সেদিন ফান খোইত বলছিলেন ক্রাল-এর আশপাশে নাকি একটা বাঘকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে। তুমি সেটাকে দেখেছিলে?

দেখেছি, কিন্তু সেটা বাঘ নয়, বাঘিনী। এখান থেকে মাইল দু-এক দূরে তাকে দেখা গিয়েছিলো। কয়েক দিন ধরে সবাই সেটাকে পাকড়াবার চেষ্টা করছে। আপনারা যদি চান তো তার ডেরার–

ঠিক তা-ই আমরা চাই, হুড আর কালোগনিকে তার কথা শেষ করতে দিলে।

কালোগনিকে অনুসরণ করে আমরা গভীরতর জঙ্গলে প্রবেশ করলুম। কারণ সাধারণত ক্ষুধায় কাতর না-হলে বাঘ কখনও সহজে গভীর জঙ্গল ছেড়ে বেরোয় না। সেইজন্যেই অনেকে হয়তো কোনো বাঘের মুখোমুখি না-পড়েও এই অঞ্চলে এসে বেড়িয়ে যেতে পারেন। শিকারের উদ্যোগ করলে সেইজন্যেই প্রথমে খবর নিতে হবে জঙ্গলের কোথায়-কোথায় বাঘের উপদ্রব বেশি। বিশেষ করে খোঁজ নিতে হয় বাঘ কোথায় জল খেতে যায়—সেই ঝরনা বা ছোট্ট জলস্রোতটি বার করতে পারলেই অনেকটা সন্ধান মিলে গেলো—তারপরে কেবল সুযোগের অপেক্ষা। তবে অনেক সময় তা অবিশ্যি আদৌ যথেষ্ট হয় না, টোপ ফেলেই তাকে কব্জিতে আনতে হয়। অনেক সময় গোরুর মাংস গাছতলায়

ফেলে রেখে গাছের উপরে শিকারিরা ওৎ পেতে থাকে। অন্তত ঘন জঙ্গলে সাধারণত এই উপায়ই গ্রহণ করা হয়।

সমতলভূমিতে অবিশ্যি ব্যবস্থা অন্য। সেখানে মানুষের এই সবচেয়ে বিপজ্জনক খেলায় হাতি সবচেয়ে কাজে লাগে। অবশ্য হাতিদের এই জন্যে ভালো করে শিখিয়ে নিতে হয়। তবু সবচেয়ে শিক্ষিত হাতিরাও অনেক সময় বাঘের মুখোমুখি পড়ে গেলে ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে এমনভাবে দৌড়ুতে থাকে যে হাওদায় বসে-থাকা শিকারির পক্ষে তখন হাতির পিঠে বসে-থাকাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে আবার বাঘেরাও দুঃসাহসে ভর করে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে হাতির পিঠে-সেই বিশাল জন্তুর পিঠেই তখন বাঘে-মানুষে ভীষণ লড়াই বেধে যায়, আর বেশির ভাগ সময়েই সেই লড়াই শিকারির পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে।

অন্তত এইভাবেই ভারতের রাজা-বাদশারা শিকারে বেরোন, জমকালো ভঙ্গিতে, জাঁকজমক সহকারে—কিন্তু ক্যাপ্টেন হুডের শিকার করার পদ্ধতি মোটেই এ-রকম নয়। হুড বরং পায়ে হেঁটে বাঘের খোঁজে বনে-বনে ঘুরে বেড়াবে, সে বরং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঘের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করবে, কিন্তু তবু কখনও হাতির পিঠে চড়ে শিকারে বেরুবে না।

আমরা কালোগনিকে অনুসরণ করে এগুচ্ছি বনের মধ্যে। সাধারণত হিন্দুরা একটু চাপা স্বভাবের হয়, কালোগনিও তাদের মতোই-পারতপক্ষে কোনো বাক্যব্যয় করতে চায় না—কোনো প্রশ্ন করলেও অতি সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দেবার পক্ষপাতী।

ঘণ্টাখানেক হেঁটে আসার পর একটি প্রখর স্রোতস্বিনীর কাছে এসে আমরা থামলুম। জলের ধারে মাটির ওপর নানা ধরনের জন্তুর পায়ের ছাপ–ছাপগুলো বেশ টাটকা। পাশেই একটা গাছের গুড়ির সঙ্গে মস্ত একখণ্ড গোমাংস টোপ হিশেবে বেঁধে রাখা হয়েছিলো—টোপটা, স্পষ্ট বোঝা গেলো, কোনো জন্তু আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছিলো বোধহয় কতগুলো শেয়াল মাংসের টুকরোটাকে নিয়ে টানাটানি করেছিলো, যদিও আদৌ তাদের জন্যে এই টোপ ফেলা হয়নি। আমরা কাছে যেতেই গোটা কয়েক শেয়াল হুড়মুড় করে ছুটে পালিয়ে গেলো।

ক্যাপ্টেন, কালোগনি বললে, এখানেই বাঘিনীটার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে কত সুবিধে হবে।

কালোগনি ঠিকই বলেছিলো। আমরা বন্দুক উঁচিয়ে ঢ্যাঙা গাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে পড়ে সেই মাংসের টুকরোটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলুম। গৌমি আর আমি রইলুম একটা গাছের আড়ালে, হুড আর ফক্স দুটো মুখোমুখি দাঁড়ানো মস্ত, ওকগাছের ডালে উঠে বসে তৈরি হয়ে রইলো। কালোগনি লুকোলো একটা মস্ত পাথরের আড়ালে-বিপদ দেখলে সে পাথরের চুড়োয় উঠে পড়বে। এইভাবে ছড়িয়েথাকার ফলে সুবিধেটা হলো এই যে জন্তুটাকে একেবারে ঘিরে ধরা যাবে—কিছুতেই যাত সে পালাতে না-পারে, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা।

এখন কেবল অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই আমাদের। আশপাশের ঝোঁপের আড়ালে শেয়ালগুলো তখনও ডাকাডাকি করছিলো কিন্তু আমাদের ভয়ে সেগুলো আর মাংসের দিকে এগিয়ে আসতে পারছিলো না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ আচম্বিতে শেয়ালের ডাক থেমে গেলো। পরক্ষণেই হুড়মুড় করে গোটা কয়েক শেয়াল ল্যাজ গুটিয়ে সেখান থেকে ঊধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো। কালোগনির শরীরটা তখন টান হয়ে উঠেছে ধনুকের ছিলার মতো, ইঙ্গিতে সে আমাদের সাবধান হতে বলে দিলে। বুঝতে পারলুম, শেয়ালদের ওই পলায়ন আসলে কোনো হিংস্র জন্তুর আবির্ভাবের পূর্বাভাস। সম্ভবত ওই বাঘিনীরই আবির্ভাব হয়েছে বনের মধ্যে।

আমরা বন্দুক উঁচিয়ে আছি। ঝোঁপের যেদিক থেকে শেয়ালগুলো ছুটে পালিয়েছিলো, হুড আর ফক্স বন্দুক তুলে সেই দিকটায় তাগ করে আছে। তার পরেই হঠাৎ দেখলুম সেই ঝোঁপের একটা দিক আচমকা ভীষণভাবে নড়ে উঠলো। শুনতে পেলুম শুকনো ডালপালা গুড়িয়ে যাবার শব্দ। আস্তে, অতি মন্থর কিন্তু নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে, কোনো জন্তু গুঁড়ি মেরে এগুচ্ছে নিশ্চয়ই। যদিও জন্তুটা শিকারিদের কোথাও দেখতে পাচ্ছে না, তবু কেমন করে যেন সে টের পেয়ে গেছে যে জায়গাটা তার পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। জন্তুরা এ-সব বিষয় কেমন করে যেন টের পেয়েই যায়। নিশ্চয়ই ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর না-হয়ে পড়লে, এবং সেই মাংসের গন্ধে আকৃষ্ট না-হলে, সে আর এক পাও এগুতো না।

অবশেষে ডালপালার আড়ালে তাকে দেখা গেলো—কেমন যেন সন্দিহান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশালসুন্দর বাঘিনী। তারপরে আস্তে সাবধানে গুঁড়ি মেরে সে এগুতে থাকলো আবার—শরীরের মধ্যে কোথাও তার বোধহয় কোনো স্প্রিং আছে, কোনো বেগতিক দেখলেই সে ঝটকা মেরে লাফিয়ে পালাবে।

আমরা তাকে টোপটা পর্যন্ত এগুতে দিলুম। মস্ত একটা শিকারি বেড়াল শিকারের উপর লাফাবার আগে ঘাড় ও পিঠ যেমনভাবে বাঁকিয়ে টান করে নেয়, তার শরীরটাও ঠিক তেমনি হয়ে উঠলো।

হঠাৎ সেই ছমছমে স্তব্ধ বন যুগপৎ দুটি বন্দুকের গুলিতে থরথর করে কেঁপে উঠলো;

বিয়াল্লিশ নম্বর, চেঁচিয়ে উঠলো হুড।

আটত্রিশ, ততোধিক উঁচু গলার স্বর ফক্সের!

হুড আর ফক্স একই সঙ্গে গুলি করেছিলো; আর এমনি তাদের অব্যর্থ লক্ষ্য যে বাঘিনার হৃৎপিণ্ড তৎক্ষণাৎ ফুটো হয়ে গিয়েছে। এখন সে পড়ে আছে মাটিতে–নিস্পন্দ ও নিঃসাড়।

কালোগনি চটপট ছুটে গেলো তার দিকে। আমরা তাড়াতাড়ি যে-যার গাছ থেকে নেমে এলুম। বাঘিনীটা আর একটুও নড়ছে না।

কিন্তু, সত্যি, কার গুলিতে মরেছে তরাইয়ের এই রানীবাঘ? ক্যাপ্টেন হুড, না ফক্স—কার গুলি ভেদ করেছে লক্ষ্য। পরীক্ষা করে দেখা হলো বাঘটাকে; দেখা গেলো তার বুকে স্পষ্ট দুটি গুলির দাগ!

যাক, হুডের গলায় কিঞ্চিৎ ক্ষোভ শোনা গেলো, আমরা দু জনেই তাহলে আধখানা করে বাঘ পেলুম-সাড়ে-একচল্লিশ হলো তাহলে আমার।

অর্থাৎ আমার হিশেব দাঁড়ালো সাড়ে-সাঁইত্রিশ, ফক্সের গলাতেও সেই একই ক্ষোভ।

কিন্তু তারা দুজনে যতই ক্ষুব্ধ হোক না কেন, বাঘিনীটা যে তক্ষুনি মরেছে, এটা আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। আহত বাঘিনীর মতো ভয়ংকর জন্তু আর-কিছুই হতে পারে না—নিজেদের ভাগ নিয়ে তারা দুজনে যতই ক্ষুব্ধ হোক না কেন, একবারেই একটা বাঘ মেরে ফেলা মোটেই কম কৃতিত্বের কাজ নয়।

ফক্স আর গৌমি বাঘিনীর সেই চমৎকার ছালটি ছাড়াবার জন্যে সেখানেই থেকে গেলো, আর আমি হুডের সঙ্গে ফিরে এলুম স্টীম হাউসে। সারা রাস্তা হুড বেশ মনমরা হয়ে রইলো-ভাগে মাত্তর আধখানা বাঘ পড়ায় সে কিন্তু মোটেই খুশি হয়নি।

+

তরাইয়ের জঙ্গলে ক্যাপ্টেন হুডের প্রতিটি অভিযানের বর্ণনা দেবার কোনো প্রয়োজন দেখছি না, কারণ আসলে হয়তো প্রতিটি শিকার-অভিযানের ধরনই একরকম-বৈচিত্র্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত, একইরকমভাবে সবকিছুরই পুনরাবৃত্তি হয়। তেমনি সন্তর্পণে যেতে হয় জঙ্গলের মধ্যে, টোপ ফেলা হয় জন্তুটির জন্যে, তারপর লুকিয়ে থেকে একইরকমভাবে জন্তুটির আবির্ভাবের জন্য বসে-থাকা, অপেক্ষা-করা। সেইজন্যেই এখানে কেবল এটুকু বলাই নিশ্চয়ই যথেষ্ট হবে যে তরাই অন্তত হুড আর ফক্সের নালিশ করার মতো কোনো কারণ দেয়নি।

এরই মধ্যে একবার ফান খোইতও আমাদের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলেন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন যে কোনো আধমরা বাঘকে তিনি ক্রাল-এ নিয়ে গিয়ে সারিয়ে তুলবেন,

এবং তার তালিকা বিস্ফারিত হয়ে উঠবে। সেদিন আমাদের তিনটি বাঘের পাল্লায় পড়তে হয়েছিলো। দুটি বাঘ, ফান খাইতের তীব্র বিরাগ সত্ত্বেও, হুড আর ফক্সের গুলিতে প্রথম বারেই মারা পড়লো—কিন্তু তৃতীয় বাঘটির কাঁধে গুলি লাগার পর সে একটি প্রচণ্ড লাফ দিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে পড়েছিলো।

এই বাঘটাকে মারবেন না, ফান খোইত চীৎকার করে জানালেন, এ-বাঘটাকে জ্যান্ত পাকড়াতে চাই।

কিন্তু প্রাণতাত্ত্বিকের মুখের কথা শেষ হবার আগেই আহত বাঘটি প্রায় তাঁরই উপর এসে পড়লো। এক ধাক্কায় ফান খাইত কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লেন—ঠিক তক্ষুনি ক্যাপ্টেন হুড গুলি না-করলে এই উড়ো ওলন্দাজটিকে আর বেঁচে থাকতে হতো না।

ক্যাপ্টেন, আপনার আরেকটু অপেক্ষা করা উচিত ছিলো। শেষ পর্যন্ত না-হয় দেখতেন-

কী দেখতাম? বাঘের থাবায় কীভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যান, সেই দৃশ্য?

একটু নখের আঁচড় লাগলেই যে মরতুম, তা আপনাকে কে বললে?

বেশ, হুড শান্ত গলায় বললে, এর পরের বারে আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখবো।– কোনো বাধা দেবো না।

পশুশালায় দাঁড়িয়ে গর্জন করার বরাত ছিলো না বাঘটার, বরং বৈঠকখানার দেয়ালের শোভা বর্ধন করাই ছিলো তার নিয়তি। কিন্তু তার ফলে হুডের সংগ্রহ দাঁড়ালো

তেতাল্লিশ, আর ফক্সের আটত্রিশ-আগের দিনের আধখানা বাঘ আমরা আর হিশেবেই ধরলুম না।

হঠাৎ তেইশে জুলাই কয়েকজন পাহাড়ি এসে হাজির স্টীম হাউসে। আমাদের শিবির থেকে মাইল পাঁচেক দূরে তাদের ছোট্ট গ্রামটি—তরাইয়ের জঙ্গলের উপর দিকটায়। তারা তড়বড় করে আমাদের যা বললে তার সারমর্ম দাঁড়ালো এইরকম : গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি বাঘিনী নাকি পুরো অঞ্চলটায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছে। ছাগল-ভেড়া উধাও হচ্ছে প্রতিদিন, মানুষের প্রাণও মোটেই নিরাপদ নয়। বসতি তুলে অন্য-কোথাও চলে যাবে কিনা ভাবছে তারা। ফাঁদ পেতে তারা ধরবার চেষ্টা করেছিলো বাঘিনীটিকে, কিন্তু বাঘিনীর গায়ে তাতে আঁচড়টিও পড়েনি। গাঁও-বুড়োরা বলছে এ-বাঘিনী নাকি সর্বনাশের দূত-শিগগিরই এখান থেকে বসতি না-তুলে দিলে সব ছারখার করে দিয়ে যাবে।

কাহিনীটি শুনেই ক্যাপ্টেন হুড প্রায় লাফিয়ে উঠলো। তক্ষুনি সে পাহাড়িদের প্রস্তাব করে বসলো যে সে তাদের সঙ্গে তাদের গ্রামে গিয়ে সব সরেজমিন তদন্ত করে দেখতে রাজি আছে। এ-রকম একটি দুর্ধর্ষ বাঘিনীর সঙ্গে বোঝাঁপড়া করার সাধ নাকি তার অনেক দিনের।

তুমিও আসবে না কি, মোক্লের? আমাকে হুড জিগেস করলে।

নিশ্চয়ই, আমি বলে উঠলুম, এ-রকম একটা রোমহর্ষক অভিযান আমি ছাড়তে রাজি নই।

ব্যাঙ্কস বললে, এবার কিন্তু আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবে। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে হুড কেমন করে শিকার করে, তা দেখে এই চর্মচক্ষু সার্থক করি।

ক্যাপ্টেন, আপনি আমাকে যেতে বলবেন না? জিগেস করলে ফক্স।

সে কী হে? এই তো তোমার বাকি আধখানা বাঘিনী মারার সুযোগ! হুড হেসে উঠলো, এই সুযোগ কি কখনও ছাড়া চলে?..না, না, তোমাকেও যেতে হবে।

আমাদের যেহেতু তিন-চার দিন একটানা স্টীম হাউসের বাইরে থাকতে হবে, সেইজন্যে ব্যাঙ্কস সার এডওয়ার্ডকেও জিগেস করে নিলে তিনি আমাদের সঙ্গে পাহাড়িদের গ্রামে যেতে চান কিনা। সার এডওয়ার্ড অবশ্য তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, এই সুযোগে তিনি সার্জেন্ট ম্যাক-নীল আর গৌমিকে নিয়ে আশপাশের অঞ্চলটা একবার টহল দিয়ে ঘুরে আসবেন। আমরা যেন তার জন্যে খামকা কোনো চিন্তা না-করি।

ব্যাঙ্কস আর তাকে বিশেষ পিড়াপিড়ি করলে না। চটপট তৈরি হয়ে নিয়েই আমরা প্রথমে ক্রাল-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

ক্রাল-এ যখন পৌঁছুলুম তখন বেলা দুপুর। ফান খোইতকে আমরা আমাদের। অভিপ্রায় জানাতেই তিনি কালোগনি ছাড়াও আরো-তিনজন ভারতীয়কে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন। শুধু একটা চুক্তি করে নিলেন তার আগে-যদি দৈবাৎ কোনো কারণে বাঘিনীটিকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে তাকে ক্রাল-এ দিয়ে যেতে হবে; কারণ কোনো চিড়িয়াখানায় যদি এ-রকম একটা প্ল্যাকার্ড লটকে দিয়ে জানানো যায়, তরাইয়ের

এই সম্রাজ্ঞী একদা একটা পুরো গ্রাম ছারখার করে দিয়েছিলো, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই একটা মস্ত আকর্ষণ হয়ে উঠবে।

ক্রাল থেকে বেরিয়ে আমরা যখন পাহাড়িদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলুম, তখন বেলা চারটে বাজে। গিয়ে দেখি, গ্রামবাসীদের আতঙ্ক সেখানে অসীমে পৌঁছেছে। ঠিক সেইদিনই সকালবেলায় প্রকাশ্য দিবালোকে বাঘিনীটি নাকি একটি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে।

আমরা সেই গ্রামে পৌঁছুতেই আমাদের মহাসমাদর করে গ্রামের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ব্যক্তিটি একজন ইংরেজ, সেখানে পাহাড়িদের সঙ্গে থেকে তিনি চাষবাস করেন। তার পক্ষে এই বাঘিনী আরো সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে : দু-একদিনের মধ্যে বাঘিনীটিকে বধ করা না-গেলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে তাকে আবার নতুন করে অন্য জায়গায় গিয়ে চাষবাসের উদ্যোগ করতে হবে। এবং সেটা তার মোটেই অভিপ্রেত নয়। ওই বাঘিনীটিকে কেউ যদি ঘায়েল করতে পারে, তাহলে তিনি বরং কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন, তবু এখানকার বাস ওঠাবেন না। কারণ —তিনি বললেন-একবার যদি এই আতঙ্ককে বাড়তে দেয়া যায়, তাহলে আশপাশের চোদ্দ-পনেরোটা গ্রাম একেবারে ছারখার হয়ে যাবে।

কয়েক বছর আগে, তিনি বললেন, আরেকটি বাঘিনীর জন্যে তেরোটি গ্রামের লোক গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো—আর তার ফলে প্রায় দেড়শো মাইল উর্বর জমি পতিত পড়ে থাকে। এবারও যদি এ-রকম কোনো ব্যাপার ঘটে, তাহলে পুরো এলাকাটাই আমাদের ছেড়ে যেতে হবে!

বাঘিনীটাকে মারবার চেষ্টা করেছেন আপনারা? ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

সম্ভব-অসম্ভব সব উপায়ই প্রয়োগ করা হয়েছে। ফাঁদ পাতা হয়েছে, মস্ত গর্ত করে উপরে ডালপালা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, স্ট্রিকনিন-মাখানো মাংস দিয়ে টোপ ফেলে দেখা হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

আপনাকে অবশ্য এমন কথা দিতে পারবো না যে আমরা বাঘিনীটিকে ঘায়েল করবো, বললে হুড, তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমরা চেষ্টার কোনোই ত্রুটি করবো না।

সেই দিনই সব তোড়জোড় . রে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের দলের সঙ্গে, যোগ দিলে আরো কুড়িজন পাহাড়ি। ব্যাঙ্কস যদিও আদৌ শিকারি নয়, তবু সে উচ্ছলভাবে অত্যন্ত আগ্রহসহকারে আমাদের সঙ্গে সফরিতে বেরুলো।

তিনদিন ধরে অহোরাত্র খোঁজা হলো সেই বাঘিনীকে—কিন্তু তার কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না; গোটা তল্লাট থেকেই সে যেন একেবারে উবে গিয়েছে। মাঝখান থেকে হুড়ের পাল্লায় পড়লো আরো-দুটি বাঘ, এবং হুড কেবল গুনে শেষ হিশেব জানালে আমাদের : পয়তাল্লিশ।

অবশেষে আমরা যখন সেই নরখাদক বাঘিনীর আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি, তখন হঠাৎ এক নতুন দুষ্কর্ম সাধন করে সে তার আগমনবার্তা জানালে আমাদের। আমরা যে-ইংরেজ ভদ্রলোকের অতিথি হয়েছিলুম, তারই একটি মোষ হঠাৎ একদিন খোঁয়াড় থেকে উধাও হয়ে গেলো–এবং তার ভুক্তাবশেষ ও হাড়গোড় পাওয়া গেলো গ্রাম থেকে মাইল দু-এক দূরে। হত্যাকাণ্ডটি-আইনের ভাষায়-বলা যায়, সুপরিকল্পিত। সকলের আগেই

www.bengaliebook.com

মোষটিকে নিয়ে সে উধাও হয়ে যায়। নানা চিহ্ন দেখে বোঝা গেলো আততায়ী খুব-একটা দূরে নেই—ওই ভুজ্ঞাবশেষেরই আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে।

আমরা অবিশ্যি তবু উটকো একটা প্রশ্ন করলুম, এটা কি সেই বাঘিনীরই কাজ বলে মনে হয়? না কি অন্যকোনো বাঘের কীর্তি?

পাহাড়িদের দেখা গেলো এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সবাই একবাক্যে জানালে ওটা তারই কাজ। তাদের দ্বিধাহীন রায় শুনে আমরা আর রাতের অপেক্ষা না-করে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম। কারণ রাতের অন্ধকারে এই ধূর্ত, ক্ষিপ্র ও ভীষণ বাঘিনী একেবারে বেমালুম নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। খেয়ে-দেয়ে এখন সে নিশ্চয়ই তার ডেরায় গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে-দু-তিন দিনের মধ্যে হয়তো আর বেরুবেই না।

যেখান থেকে মোষটাকে বাঘিনীটি টেনে নিয়ে গিয়েছিলো, সেখানে চাপচাপ রক্ত পড়ে আছে। সেই রক্তের দাগ লক্ষ করে এগিয়েই আমরা বাঘিনীর ডেরার উদ্দেশে চলতে লাগলুম। রক্তের দাগ গিয়ে শেষ হলো একটা ঘন ঝোঁপের মধ্যে। এই ঝেপটাকে এর আগে খেদা দিয়ে বহুবার ঘেরাও করা হয়েছে—কিন্তু বাঘের ল্যাজের ডগাটিরও দেখা যায়নি। এবার আমরা চারপাশ দিয়ে গোল করে ঝোপটাকে ঘিরে ধরলুম, যাতে কিছুতেই সেই নরখাদক আর পালাতে না-পারে।

আস্তে আস্তে সেই গোল মনুষ্যবেড়া ছোটো হয়ে আসতে লাগলো। আমি, কালোেগনি আর ক্যাপ্টেন হুড রইলুম একদিকে-অন্যদিকে রইলো ফক আর ব্যাঙ্কস। কিন্তু দু-দলের

মধ্যে যোগাযোগ আমরা একটুও ছিন্ন করিনি-প্রতি মুহূর্তেই সংবাদ আদান-প্রদান করা হচ্ছিলো।

বাঘটা যে ঝোঁপের মধ্যেই আছে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না। কারণ রক্তের দাগ গিয়ে শেষ হয়েছে ঝোঁপের মধ্যে, অথচ অন্য পাশে আর কোনো রক্তের দাগ নেই। অবশ্য তার মানে এই নয় যে বাঘটার ডেরা এই ঝোপে, কারণ আগে যখন ঝোপটা খোঁজা হয় তখন বাঘটাকে এখানে পাওয়া যায়নি। হয়তো এটা তার সাময়িক বিশ্রামের স্থান।

বেলা তখন মাত্র আটটা। সাড়ে আটটার মধ্যেই আমাদের গণ্ডি আরো ছোটো হয়ে এলো। পাশের লোকটিকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, এত ছোটো হয়েছে গণ্ডি। কিন্তু ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই-ঝোঁপের মধ্যটা অদ্ভুতরকম স্তব্ধ হয়ে আছে। শেষটায় আমার মনে হতে লাগলো বাঘটা হয়তো ঝোঁপের মধ্যে আর নেই-আমরা মিছিমিছি এইভাবে সময় নষ্ট করছি।

আরো-ছোটো হয়ে এলো আমাদের গণ্ডি–আর তারপরেই হঠাৎ ঝোঁপের মধ্য থেকে একটা চাপা রাগি গর্জন উঠলো। শব্দ শুনে বোঝা গেলো কতগুলো পাথর আর গাছের আড়ালে বাঘটা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে।

হুড, ব্যাঙ্কস, ফক্স, কালোগনি ও আরো-কয়েকজন পাহাড়ি তখন ঝোঁপের মুখটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভিতরেই ঢুকে পড়ি এবার, হুড পরামর্শ দিলে।

সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে–বিশেষ করে প্রথমে যে যাবে, তার পক্ষে, বললে ব্যাঙ্কস।

হাতের রাইফেলটা তুলে হুড বললে, তবু আমি যাবো—

আমি আগে যাবো, ক্যাপ্টেন, ফক্স ঝোঁপের দিকে পা বাড়ালো।

না, না, ফক্স—এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার, হুড বাধা দিলে।

কিন্তু ক্যাপ্টেন, আমি আপনার চেয়ে ছটা বাঘ পিছিয়ে আছি–

তক্ষুনি ব্যাঙ্কস ফতোয়া জারি করলে, উঁহু, তোমাদের দুজনের কাউকেই আমি ঝোঁপের মধ্যে ঢুকতে দেবো না।—কিছুতেই না।

ঝোপে ঢোকবার কী দরকার? আরো তো একটা উপায় আছে, কললে কালোগনি।

কী?

ও-পাশে আগুন দিয়ে দিলেই হয়–ধোঁয়া আর আগুনের জন্যে বাধ্য হয়ে তাকে বেরুতেই হবে! আর একবার গাছের আড়াল থেকে বেরুলে বাঘটাকে মারাও অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

কালোগনি ঠিকই বলেছে, ব্যাঙ্কস সায় দিলে, এসো, চটপট কিছু শুকনো ভালপালা ও নন-পাতা একজায়গায় জড়ো করো-তারপর তাতে আগুন দাও। তাতে হয় তাকে জান্ত ঝলসে মরতে হবে নয়তো বেরুতেই হবে বাইরে।

বেরিয়ে যদি পালিয়ে যায়, পাহাড়িরা আপত্তি করলে।

তাহলে তার আগেই তাকে আমরা অভিনন্দন জানাবো, হুড তার রাইফেল তুলে দেখলে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুকনো পাতা, ঘাস, ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো–অমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠলো-আর হাওয়ার তোড়ে সেই ধোঁয়া ঢুকতে লাগলো ঝোঁপের মধ্যে। এবার আরেকটা রাগি, হিংস্র গর্জন উঠলো ঝোপ থেকে বোঝা গেলো, অচিরেই বাঘটা ঝোপ থেকে লাফিয়ে বেরুবে।

উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত ভাবে আমরা ঝোঁপের দিকে তাকিয়ে রইলুম, আর হুড পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে রাইফেল তুলে ধরলো { হঠাৎ ঝোঁপের মধ্যটা প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠলো। হাঁটু গেড়ে বসলো হুড, রাইফেল তাগ-করা ঝোঁপের দিকে, সমস্ত শরীর তার ধনুকের ছিলার মতো টান-করা।

হঠাৎ ধোঁয়ার মধ্য থেকে একটা প্রকাণ্ড জন্তু সবেগে বেরিয়ে এলো।

একসঙ্গে গর্জে উঠলো দশটি বন্দুক–কিন্তু, আশ্চর্য, বাঘের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়লো না। হুড তখনও হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল তাগ করে আছে–বাঘিনীটা যেই আরেকটু এগুলো, অমনি তার কাধ লক্ষ্য করে হুডের রাইফেল গর্জে উঠলো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই

বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র সেই বাঘিনী লাফিয়ে পড়লে হুডের উপর। থাবার একটা আঘাতে এক্ষুনি তার মাথার খুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে

কিন্তু পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ ছুরি হাতে কালোগনি লাফিয়ে পড়লো বাঘের উপর। হঠাৎ এমনভাবে আক্রান্ত হয়ে বাঘিনী এবার তার দিকেই ফিরলো।

সেই ফাঁকে হুড ক্ষিপ্রভাবে লাফিয়ে উঠলো। কালোগনির হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গিয়েছিলো—সেটা তুলে বাঘিনীর বুকে বসিয়ে দিলো আস্ত, একেবারে বাঁটশুদ্ধু বাঘিনীটা গড়িয়ে পড়ে গেলো।

পরক্ষণেই পাহাড়িদের সমস্বর উল্লাস শোনা গেলো : শের মর গিয়া! শের মর। গিয়া।

সত্যি, মরে গিয়েছে! দশ ফিট লম্বা, ল্যাজ সমেত-চিক্কণ, নধর, পেশল সম্রাজ্ঞীর মতোই, সত্যি!

পাহাড়িরা যখন সেই রানীবাঘকে ঘিরেই উল্লাসে নৃত্য করছে, কালোগনি আস্তে হুডের দিকে এগিয়ে গেলো। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, সাহেব।

ধন্যবাদ কীসের! আমিই তো উলটে তোমাকে ধন্যবাদ দেবো-তুমি না-থাকলে এতক্ষণে আমি অক্কা পেতুম?

কিন্তু আপনি বাঘটা না-মারলে আমাকেও মরতে হতো, ঠাণ্ডা গলায় বললে কালোগনি, আপনার ছেচল্লিশ নম্বর এটা! আমি আর কীই-বা করেছি।

হুড আর কোনো দ্বিরুক্তি না-করে কালোগনির হাত ধরে কৃতজ্ঞতাভরে ঝাঁকুনি দিলে।

ব্যাঙ্কস বললে, কালোগনি, চলে এসো আমাদের স্টীম হাউসে, বেহেমথে। তোমার কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে—ওষুধ লাগিয়ে দেবো।

কালোগনি কোনো আপত্তি করলে না। পাহাড়িদের সমস্বর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আমরা স্টীম হাউসের দিকে রওনা হয়ে পড়লুম। ফান খোইতের অন্যান্য অনুচরেরা কালের দিকে ফিরে গেলো।

বেহেমথে ফিরে এলুম দুপুর নাগাদ। এসে দেখি, সার্জেন্ট ম্যাক-নীল আর গৌমিকে নিয়ে কর্নেল মানরো বেরিয়ে গেছেন; ছোট্ট একটা চিরকুটে লিখে গেছেন, তিনি নানাসাহেবের সন্ধানে চললেন—নানাসাহেব নেপালে আছেন কিনা, এটা তিনি সঠিক জানতে চান।

চিরকুটটা যখন পড়া হচ্ছিলো, তখন হঠাৎ আমি তাকিয়ে দেখলুম কালোগনির মুখের ভাব যেন আচমকা কী-রকম অদ্ভুত হয়ে উঠলো! কেন? নানাসাহেবের নাম শুনে? কিছুই ঠিক বুঝতে পারলুম না।

মাতিয়াস ফান খোইতের বিদায়

সার এডওয়ার্ডের অপ্রত্যাশিত প্রস্থান আমাদের সবিশেষ ভাবিয়ে তুললো। এখানে আসার পর থেকেই লক্ষ করছিলুম, তিনি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে আছেন। যখনই পাহাড়িরা আমাদের শিবিরে আসতো, তখনই তিনি তাদের নানারকম প্রশ্ন করতেন, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগেস করে নানাসাহেবের হদিশ জানবার চেষ্টা করতেন। স্পষ্ট বোঝা যেতো, অতীতের ঘটনা তিনি মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারেননি।

কিন্তু এখন, এ-রকম অবস্থায়, আমরা কী করবো? অনুসরণ করবো তাকে? কিন্তু তিনি যে কোন দিকে গেছেন, তা-ই তো জানি না। নেপালের সীমান্তের কোন জায়গাটাই বা তিনি খুঁজে দেখতে চান, তাও আমাদের জানা নেই। তাছাড়া আগে থেকে যেহেতু তিনি এ-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি, তার কারণই হলো তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তিনি অন্যকে বিরক্ত করতে চান না—এ ছাড়া ব্যাঙ্কস আগে থেকে এ-কথা শুনলে হয়তো তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করতো, যেটা তার ঠিক মনোমতো হতো না। এখন আমরা কেবল তার ফিরে-আসার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না। নিশ্চয়ই অগস্ট মাস শেষ হবার আগেই তিনি ফিরে আসবেন, কেননা ঠিক ছিলো বেহেমথ অগস্টের শেষাশেষি কি সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে বম্বাই প্রেসিডেন্সির দিকে রওনা হবে।

কালোগনি মাত্র একদিনই ছিলো স্টীম হাউসে; ব্যাঙ্কসের চিকিৎসায় যখন তার আশু উন্নতি দেখা দিলো, তখন সে ক্রাল-এ নিজের কাজে যোগ দেবার জন্যে ফিরে গেলো। ক্ষতটা শিগগিরই শুকিয়ে যাবে—তা থেকে ভয়ের কোনোই কারণ নেই।

অগস্ট মাস এলো ভয়ানক ঝড়বৃষ্টির মধ্যে–আবহাওয়া এতটাই খারাপ হয়ে গেলো যে ব্যাঙেরও সর্দি হবার আশঙ্কা দেখা দিলে। তবু শুকনো দিনগুলো হয়তো সংখ্যায় জুলাই মাসের চেয়ে বেশি। সেইজন্যেই তরাইয়ের জঙ্গলে মাঝে-মাঝে শিকারে বেরুনো গেলো। ক্রাল-এর সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হলো। মাতিয়াস ফান খোইত আর-কিছুতেই তুষ্ট নন-তাকেও সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে চলে যেতে হবে, কিন্তু এখনও সেই একটি সিংহ, দুটো বাঘ আর দুটো চিতা তিনি পাকড়াও করে উঠতে পারেননি।

সিংহটা অবশেষে ধরা পড়লো। ৬ই অগস্ট—ফান খোইতের পাতা ফাসে। এতদিন ধরে সিংহের দেখা না-পেয়ে-পেয়ে তিনি শেষটায় ভাবতে বসেছিলেন যে ভারতের জঙ্গলে বোধ হয় সিংহ পাওয়াই যায় না। যেই তিনি সিংহের আশা ছেড়ে দিলেন, অমনি তারই পাতা দড়ির ফাসে সিংহটা ধরা পড়লো। শুধু তা-ই নয়, ফাসটা লক্ষ–করলে ক্যাপ্টেন হুড হয়তো সিংহটাকে গুলিই করে বসতো, কিন্তু ভাগ্যিশ ফান খোইত সঙ্গেই ছিলেন, সেইজন্যে আগে থেকেই হুডকে বারণ করতে পারলেন।

আর সিংহটাই বুঝি তার কপাল খুলে দিলে। ১১ই অগস্ট সেই ফাঁদে-যে-ফঁদে ফান খোইত নিজেই আটকা পড়েছিলেন একদা—পড়লো দুটো চিতাবাঘ-রোহিলখণ্ডে যে-রকম একটি চিতা উদ্ধতভাবে বেহেমথকে আক্রমণ করেছিলো না-বুঝে, চিতা দুটো ছিলো সেই জাতের।

এর পরে কেবল বাকি রইলো দুটো বাঘ-তাহলেই ফান খোইতের তালিকা সম্পূর্ণ হয়।

ইতিমধ্যে হুড আর ফক্সের তালিকাও স্থির হয়ে বসে নেই—তাও ক্রমশ কেঁপেই চলেছে; হুডের সংগ্রহ হয়েছে আটচল্লিশ নম্বর, ফক্স তার উনচল্লিশ নম্বরটিকে ঘায়েল করতে একটুও দ্বিধা করেনি; কালো নেকড়ে বাঘটিকে হিশেবে ধরলে ফক্সের তহবিল অবশ্য চল্লিশেই পূর্ণ হতো।

২০শে অগস্ট ফান খোইত একটি বাঘ পেলেন গর্তের মধ্যে : গভীর গর্ত খুঁড়ে তার উপর ডালপালা বিছিয়ে রাখা পাহাড়িদের বন্য জন্তু শিকারের প্রাচীন পদ্ধতি। সেইজন্যেই হয়তো সব জন্তুই এতদিন সন্তর্পণে ওই সন্দেহজনক গর্তটি এড়িয়ে চলছিলো। যে-বাঘটি গর্তে পড়েছিলো, সে এত উঁচু থেকে অতর্কিতে পড়ে যাওয়ার ফলে বেশ আহত হয়েছিলো, কিন্তু আঘাতটা মোটেই সীরিয়াস ছিলো না। কয়েকদিন খাঁচার মধ্যে বিশ্রাম করলেই সেটা সেরে যাবে। ফান খোইত যখন হামবুর্গের হের হাগেনবেককে বাঘটা সমঝে দেবেন, তখন আঘাতের কোনো চিহ্নই থাকবে না।

এখন কেবল আর-একটা মাত্র বাঘ পেলেই ফান খোইতের চাহিদা মেটে। তাহলেই তিনি বম্বাই গিয়ে জাহাজ ধরতে পারেন।

সেই শেষ বাঘটিকে সংগ্রহ করতে অবশ্য বেশি দেরি হলো না, কিন্তু তার জন্যে যে দাম দিতে হলো সেটা নেহাৎ কম নয়। আগে জানলে ফান খোইত হয়তো আর শেষ শার্দুলটির জন্য অপেক্ষা করতেন না।

২৬শে অগস্ট রাত্রে শিকারে বেরুবার পরিকল্পনা ছিলো ক্যাপ্টেন হুডের। নিমেঘ শান্ত আকাশ, স্তব্ধ ক্ষীণ চাঁদ-সমস্ত-কিছুই শিকারের পক্ষে খুব অনুকূল। একেবারে ঘন কালো অন্ধকার রাতে জন্তুরা অনেক সময়েই ডেরা ছেড়ে বেরোয় না; তার চেয়ে অর্ধ-আলোকই তাদের আকর্ষণ করে বেশি। আলোছায়ার মধ্যেই গভীর রাতে এই নিশাচরেরা শিকারের সন্ধানে গুঁড়ি মেরে মেরে এগোয় বনের মধ্যে। মাঝরাতের পর যখন চাঁদ উঠবে—হুড ঠিক করেছিলো—তখনই সে শিকারে বেরুবে।

হুড, ফক্স, স্টর আর আমি—ঠিক ছিলো স্টীম হাউস থেকে এই চারজনে বেরুবো-আর কাল থেকে ফান খোইত স্বয়ং কালোগনি ও আরো কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবেন।

সেইজন্যেই সান্ধ্যভোজ শেষ হতেই আমরা চারজনে স্টীম হাউস থেকে বেরিয়ে পড়লুম; প্রথমে ক্রাল-এ যাবো; সেখান থেকে ফান খোইতদের নিয়ে একেবারে বনের মধ্যে ঢুকবো।

ক্রাল-এ যাবার পর ফান খোইত আমাদের সব পরিকল্পনা শুনে বললেন, যেহেতু মাঝরাতের আগে আমরা শিকারে বেরুচ্ছি না, সেইজন্যে তিনি এই সুযোগে দু-এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে চান। জ্বম্ভন সহযোগে এই তথ্যটি জানিয়ে তিনি শোবার ঘরে চলে গেলেন, বলে গেলেন ইচ্ছে করলে আমরাও খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারি, আর ঘুম-টুম যদি একান্তই আমাদের না-আসে তাহলে গোটা ক্রালটাই রইলো আমাদের তত্ত্বাবধানে-আমরা যা খুশি তা-ই করতে পারি।

কাঁচা ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে শিকারে যাবার কথাটা আমার মোটেই পছন্দ হলো না; তার চেয়ে একটুও না-ঘুমুনোই ভালো; সেইজন্যে আমি হডের সঙ্গে ক্রাল-এর মধ্যেই গল্প করে-করে ঘুরতে লাগলুম। ফান খোইতের বহুমূল্য ও হিংস্র সম্পত্তিগুলোকে টহল দিয়ে দেখে এলুম একবার, বাঘ-সিংহ, নেকড়ের খাঁচায় জন্তুগুলো বসে-বসে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমুচ্ছে। গল্প করতে-করতে আমরা তাদের একবার দেখে এলুম। ঘণ্টাখানেক সময় এইভাবেই কাটিয়ে দেয়া গেলো। তারপর আর-কিছু করার না-পেয়ে বসে-বসে ঢুলতে লাগলুম দুজনে। চারপাশ কী-রকম স্তব্ধ হয়ে আছে, বেশ অস্বাভাবিক রকম। কোথাও কোনো নিশাচরের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না—সব কেমন অদ্ভুত চুপচাপ। এত চুপ, যে সেই স্তব্ধতা যেন বুকের উপর চেপে বসে যায়। জঙ্গলের মধ্যে এ-রকম ছমছমে ভুতুড়ে স্তব্ধতা কেন যেন মানায় না।

স্তব্ধতা কেমন যেন আমাদেরও আক্রান্ত করেছিলো। সেইজন্যেই হড স্তব্ধতা নাভেঙেই ফিশফিশ করে আমাকে বললে, মোক্লের, এই চুপচাপ ভাবটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। জঙ্গলের চেয়ে শোরগোলভরা জায়গা খুব কমই আছে। বাঘ-সিংহের গর্জন না-শুনলেও শেয়ালের ডাক তো সারা রাতই শোনা যায়। আর এই ক্রাল-এ এত জীবজন্তু ও মানুষ আছে যে সহজেই তারা এর দ্বারা আকৃষ্ট হতো। অথচ দ্যাখো, কিছু শোনা যাচ্ছে না—শুকনো পাতার শব্দ পর্যন্ত না। ফান খোইত জেগে থাকলে তারও নিশ্চয়ই এটা খুব অদ্ভুত ঠেকতো।

ঠিকই বলেছে, হুড, আমি বললুম, নিশাচরদের এই স্তব্ধতার কোনো কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। যা-ই হোক—একটু সাবধানে থেকো, না-হলে শেষটায় দেখো, ঘুম পেয়ে যাবে।

না, না, ঘুমিয়ো না। আড়মোড়া ভেঙে হুড বললে, আরেকটু পরেই আমাদের রওনা হতে হবে।

মাঝে-মাঝে দু-একটা কথা বলছি, কিন্তু ক্রমশই কথাগুলো জড়িয়ে আসছে। বসেবসে চুলছি কেবল : চেতনাটা কেমন শিথিল হয়ে আসছে। হঠাৎ একটা রুষ্ট চাপা গর্জনে আমার ঝিমুনি ভেঙে গেলো। গর্জনটা যে বুনো জন্তুদের খাঁচা থেকে এলো সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইলো না। কারণ পরমুহূর্তে বাঘ-সিংহের চাপা-চাপা রাগি গরগর আওয়াজ ভেসে এলো। খাঁচার মধ্যে উত্তেজিতভাবে তারা পায়চারি করছে–মাঝে-মাঝে খাঁচার শিকের কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়ার মধ্য থেকে কীসের গন্ধ শুকছে, বোধহয় দূরের কোনো-কিছুর গন্ধ পাচ্ছে তারা।

কী ব্যাপার, বলো তো হুড, আমি জিগেস করলুম।

কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ভয় হচ্ছে ওরা বুঝি দূরের কিছুর গন্ধ...

হুডের কথা শেষ হবার আগেই ক্রাল-এর বেড়ার বাইরে বুনো জন্তুদের ভীষণ গর্জন উঠলো।

কী সর্বনাশ! বাঘ! বলেই হুড ফান খোইতের ঘরের দিকে হুড়মুড় দৌড় দিলে।

হুডের অবশ্য ছুটে-যাবার কোনোই দরকার ছিলো না। কারণ সেই বিকট গর্জন শুনে ততক্ষণে ক্রাল-এর সবাই ধড়মড় করে জেগে উঠেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

চড়াও হয়েছে না-কি এসে? চেঁচিয়ে জিগেস করলেন ফান খোইত, ঘর থেকে তিনি ছুটে বেরিয়ে আসছেন।

তা-ই তো মনে হয়, হুড জানালে।

দাঁড়ান, একবার দেখে নিই। বলে একটা মই নিয়ে বেড়ার গায়ে ঠেশ দিয়ে ফান খোইত তরতর করে উপরে উঠে গেলেন। উঠেই চীৎকার করে জানালেন, দশটা বাঘ আর ডজন খানেক নেকড়ে!

ব্যাপারটা তো ঘোরালো ঠেকছে খুব, বললে হড, আমরাই তাদের শিকার করছিলুম এতকাল—এবার দেখছি তারাই আমাদের শিকার করতে এসেছে!

বন্দুক—আপনাদের বন্দুক নিন! ফান খোইত চেঁচিয়ে জানালেন।

আদেশ পালন করতে আমরা একটুও দেরি করলুম না : তক্ষুনি যে যার বন্দুক বাগিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম।

দল বেঁধে বন্য হিংস্র জন্তু এসে চড়াও হচ্ছে, দাঁত-নখ বেঁধাচ্ছে, এই ব্যাপারটা ভারতবর্ষে খুব দুর্লভ নয়। বিশেষ করে যেসব জায়গায় বাঘ ঘুরে বেড়ায়, সে-সব জায়গায় এটা হামেশা হয়; সুন্দরবন অঞ্চলে বাংলাদেশের রাজা-বাঘ কতবার যে এমনি সদলে দিগ্বিজয়ে বেরোয়, তার ইয়ত্তা নেই। ব্যাপারটা যে ভয়ংকর, তা তর্কাতীতকারণ প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় আক্রমণকারীরা বিজয়গর্বে সবকিছু বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করে চলে গিয়েছে।

ততক্ষণে বাইরের দুরন্ত দমকা গর্জনের সঙ্গে খাঁচার মধ্যেকার জন্তুদের চাপা, রাগি, ক্ষুব্ধ চীৎকার মিশে গিয়েছে। বনের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে ক্রাল-জন্তুদের এই কথোপকথনের মধ্যে আমাদের কথা সব চাপা পড়ে যাচ্ছিলো।

মোষগুলো তখন আতঙ্কে ও বিভীষিকায় একেবারে যেন খেপে গিয়েছে-ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে তাদের খোঁয়াড় থেকে—খামকাই ফান খোইতের অনুচরেরা তাদের সামলাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মোষদের তীব্র সন্ত্রস্ত ভাবগতিকে মনে হচ্ছে না যে তাদের সামলানো যাবে।

এমন সময় ক্রাল-এর দরজা সশব্দে খুলে গেলো—সম্ভবত দরজাটা তেমন শক্ত করে আটকানো হয়নি সন্ধেবেলায়—এবং হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লো একদঙ্গল বুনো জন্তু।

সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ুন, ঘরের মধ্যে, ফান খোইত ছুটতে ছুটতেই চাচালেন। আত্মরক্ষার আশ্রয় বলতে সত্যি ঘরের মধ্যে ঢুকে-পড়া ছাড়া আমাদের তখন আর-কিছু করার ছিলো না। কিন্তু ঘর পর্যন্ত পৌঁছুনো যাবে কিনা, তা-ই সন্দেহ। এর মধ্যেই ফান খোইতের দুটি অনুচরের ছিন্নভিন্ন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। অন্যরা পাগলের মতো যে-কোনো-একটা আশ্রয়ের জন্যে এলোমেলো উদভ্রান্ত ছুটছে।

ফান খোইত, স্টর আর ছ-জন অনুচর ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—দুটো বাঘ লাফাবার উদ্যোগ করেছিলো, কিন্তু তার আগেই তারা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কালোগনি, ফক্স আর অন্যরা প্রাণপণে আশপাশের গাছগুলোর মগডালে উঠে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কেবল আমি আর ক্যাপ্টেন হুডই ফান খোইতের সঙ্গে যোগ দেবার একফোঁটাও সুযোগ পাইনি।

মোক্লের! মোক্লের! ইডের ডান হাতটায় তক্ষুনি একটা চোট লেগেছে, তা সত্ত্বেও সে আমাকে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু আমি ততক্ষণে একটা মস্ত বাঘের ল্যাজের ঘায়ে মাটিতে ছিটকে পড়েছি। বাঘটা আমাকে কব্জা করার আগেই লাফিয়ে উঠে আমি হুডের সাহায্যের জন্যে ছুটে গেলুম।

তখনও আমাদের একটা আশ্রয় ছিলো। জানোয়ারদের খাঁচায় তখনও একটা কামরা ছিলো ফাঁকা-যে-বাঘটা ধরা হয়নি তারই জন্যে ওই কামরাটা নির্দিষ্ট ছিলো। আমরা হুড়মুড় করে সেই খাঁচাটার মধ্যে গিয়ে ঢুকেই খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিলুম। আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত নিরাপদ। জন্তুগুলো তখন খাঁচার লোহার গরাদের উপর ঝাঁপিয়ে গরগর করে চাপা রাগে ভীষণ গর্জাচ্ছে। আর তাদের ধাক্কায় আস্ত খাঁচাটাই বুঝি উলটে ডিগবাজি খেয়ে যায়। কিন্তু বাঘেরা—তারাই সবচেয়ে সাংঘাতিক–তক্ষুনি অন্য শিকারের খোঁজে সেখান থেকে চলে গেলো-লোহার গরাদ ভেঙে আমাদের পাকড়াবার চেষ্টা সম্ভবত স্থগিত রাখলো কিছুক্ষণের জন্য।

সে কী দৃশ্য! গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখলুম বলেই কোনো খুঁটিনাটিই আমাদের চোখ এড়ালো না।

গোটা পৃথিবীটাই যেন ভিরমি খেয়ে চিৎপাত উলটে পড়ছে, হুড তখন রাগে প্রায় কাপছে। ব্যাপারটা একবার ভাবো, মোক্লের! কী পরিহাস! জন্তুগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরে, স্বাধীন ভাবে-আর আমরা কিনা বন্দী হয়ে আছি খাঁচায়?

তোমার যে-চোট লেগেছিলো, সেটা কেমন— আমি জিগেস করলুম।

ও-কিছু না— সামান্য।

এমন সময় পর-পর পাঁচ ছটা গুলির আওয়াজ শোনা গেলো। ঘরের মধ্যে থেকে ফান খোইতরা গুলি চালাতে শুরু করেছেন—আর ঘরের চারপাশে রক্তের স্বাদে খেপে গিয়ে গজাচ্ছে দুটো বাঘ আর তিনটে নেকড়ে।

স্টরের বুলেটে একটা জন্তু পড়ে গেলো নিস্পন্দ। বাকিগুলো তখন পেছিয়ে গিয়ে শেষটায় একযোগে মোষের খোঁয়াড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ফক্স, কালোগনি ও অন্যরা তাড়াহুড়োয় বন্দুক-টলুক ফেলেই গাছে উঠে পড়েছিলো— তারা এই অবস্থায় কোনো সাহায্যই করতে পারছে না।

ক্যাপ্টেন হুডের ডান হাতটা আবার চোট পেয়ে প্রায় অবশ হয়ে আছে। তবু, সেই অবস্থাতেই, গরাদের ফাঁক দিয়ে কোনো-রকমে বন্দুক তাগ করে ধরে সে তার উনপঞ্চাশ নম্বরটিকে দখল করে নিলে।

মোষগুলো তখন লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে খোঁয়াড় থেকে। খ্যাপার মতো দাপাদাপি করছে-আতঙ্কে ডাকতে-ডাকতে ক্রালের এপাশ-ওপাশ ছুটে বেরুচ্ছে—মাঝে-মাঝে চেষ্টা করছে মাথার শিঙ দিয়ে বাঘদের এফাঁড়-ওফোঁড় করে ফেলতে-কিন্তু বাঘগুলো সাবধানে তাদের শিঙের নাগাল থেকে দূরে পাক খেয়ে-খেয়ে তাদের তাড়া লাগাচ্ছে। একটা মোষের কাঁধে লাফিয়ে উঠেছে কালো একটি নেকড়ে-দাঁত-নখ বসিয়েছে তার ঘাড়ে, শেষটা ঐ অবস্থাতেই মোষটা ক্রাল-এর খোলা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে চলে গেলো বাইরে, জঙ্গলের অন্ধকারে।

আরো পাঁচ-ছটা মোষ বাঘের তাড়ায় তারই মতো ওই খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো—দু-তিনটি বাঘও তক্ষুনি তাদের পিছু পিছু ছুটলো। কেবল যে-মোষগুলো বাঘনেকড়ের থাবা এড়াতে পারেনি, তাদের রক্তাপ্লুত দেহ গড়াগড়ি যেতে লাগলো মাটিতে।

ফান খোইতের ঘরের জানলা দিয়ে অবিরাম বন্দুক গর্জাচ্ছে। আমি আর হড যথাসাধ্য করবার চেষ্টা করছি খাঁচার মধ্য থেকে। আর ইতিমধ্যে একটা নতুন বিপদ দেখা দেবার উপক্রম করছে। খাঁচার মধ্যেকার জন্তুগুলো রক্তের গন্ধে ও এই শোরগোলে ভীষণ দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে—খাঁচা ভেঙে বেরুবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। থরথর করে কাঁপছে চাকা-লাগানো খাঁচাগুলো, একটা বাঘের খাঁচা উলটে পড়লো, একটা চাকা শূন্যে ঘুরে গেলো একবার। ভয় হলো, জন্তুগুলো শেষটায় হয়তো খাঁচা ভেঙে বেরিয়েই পড়ে বুঝি-বা।

সৌভাগ্যই বলতে হবে যে তেমনতর কিছুই ঘটলো না। হুড তার বন্দুকে টোটা ভরতে-ভরতে বললে, এ-যে দেখছি কিছুতেই ফুরোয় না! এতগুলো এসেছিলো!

এমন সময় একটা বাঘ ফান খোইতের অনুচরেরা যে-গাছে আশ্রয় নিয়েছিলো তার ডাল লক্ষ্য করে এমন একটা লম্ফ দিলে যে আঁৎকে উঠলুম। বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করে বাঘটা শেষটায় একটি পাহাড়ির পা কামড়ে তাকে সবেগে টেনে নিয়ে এলো মাটিতে। কিন্তু তখন সেই মৃতদেহটির স্বত্ব নিয়ে কোত্থেকে একটি নেকড়ে এসে সেই বাঘটির সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিলে। রক্তে মাখামাখি থাবা তাদের-হাড়ের শব্দ হচ্ছে মড়মড়, কষ বেয়ে তাদের রক্ত গড়াচ্ছে।

আমাদের গোলাগুলি ততক্ষণে ফুরিয়ে গেছে। অসহায় দর্শক বলে সমস্ত দৃশ্যটা বিস্ফারিত চক্ষে অবলোকন করা ছাড়া আমাদের আর-কোনো উপায় নেই।

কিন্তু সেই বীভৎস দৃশ্য অবশ্য আর আমাদের দেখতে হলো না। আমাদের পাশের খাঁচায় একটা বাঘ এত হুটোপাটি করছিলো যে তার ধাক্কায় আমাদের খাঁচাটা উলটে গেলো। ভিতরে আমরা ডিগবাজি খেলুম বার-দুই, কিন্তু খাঁচাটা এমনভাবে উলটেছিলো যে বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে আর দেখা গেলো না।

দেখা গেলো না সত্যি, কিন্তু শোনা গেলো। সে কী কানে-তালা লাগানো গর্জন ও দাপাদাপি! তাজা রক্তের গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। বাইরে যেন তাণ্ডব চলছে একটা–ভারতীয় ধরনে বলা যায়। খাঁচাগুলো ভেঙে অন্য জন্তুগুলো বেরিয়ে পড়েছে নাকি? ফান খোইতের

ঘরটা কি একযোগে চড়াও হয়ে তারা ভেঙে ফেলেছে? না কি লাফ দিয়ে-দিয়ে গাছগুলো থেকে একজন-একজন করে মানুষ পাকড়াও করছে তারা?

কী হচ্ছে কিছুই বুঝছি না—আর আমরা কিনা এই নোংরা সিন্দুকটায় বন্দী হয়ে পড়ে আছি, রাগে ক্ষোভে ক্যাপ্টেন হুড আর-কিছু বলতে পারলে না।

প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট কেটে গেলো এইভাবে—কিন্তু এই সময়টুকুকেই মনে হলো অনন্তকাল। আর তারপরেই বাইরের সেই বীভৎস গর্জন ক্রমে শান্ত হয়ে আসতে লাগলো। বাঘের ডাক আর শোনা যাচ্ছে না, পাশের খাঁচাগুলোতেও জন্তুদের দাপাদাপি বন্ধ হয়ে এলো। তাহলে কি রক্তারক্তি কাণ্ড শেষ হলো অবশেষে? তক্ষুনি শুনতে পেলুম সশব্দে বন্ধ করা হলো ক্রাল-এর দরজা। বাইরে কালোগনি চেঁচিয়ে আমাদের নাম ধরে হাঁক পাড়ছে : ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন!

এই-যে, এদিকে! হুড চেঁচিয়ে জানালে।

তার কথা নিশ্চয়ই বাইরে শোনা গেলো, কারণ পরক্ষণেই খাঁচাটাকে ধরাধরি করে ঠিকমতো বসানো হলো চাকার উপর-আমরা জন্তুদের খাঁচা থেকে মুক্তি পেলুম।

ফক্স। স্টর! বেরিয়ে এসেই হুড প্রথমেই নিজের সঙ্গীদের খোঁজ করলে।

এই-যে, আমরা এখানে আছি! সাড়া পাওয়া গেলো তাদের।

আশ্চর্য! তারা একটুও আহত হয়নি। ফান খোইত আর কালোগনির দেহেও কোনো আঁচড় লাগেনি। মাটিতে মরে পড়ে আছে একটা নেকড়ে ও দুটি প্রকাণ্ড বাঘ। অন্যগুলো ক্রাল ছেড়ে পালিয়েছে—আর-কোনো ভয় নেই আমাদের। খাঁচা ভেঙেও কোনো জানোয়ার আর পালাতে পারেনি-মাঝখান থেকে ফান খোইত দেখতে পেলেন দুটি খাঁচার মাঝখানে একটা বাঘ আটকে পড়ে গিয়েছে-পালাতে পারেনি-ফলে তার শেষ বাঘটাকেও পাওয়া গেলো।

কিন্তু এই বাঘটার জন্যে তাকে যে-দাম দিতে হলো, তা অনেক। পাঁচটা মোষ মরেছে তাঁর, আর তিনটি ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে মাটিতে : রক্তে-রক্তে জায়গাটা মাখামাখি! সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঘটা সত্যি খুব দামি।

+

বাকি রাতটুকু কালের ভিতরে কি বাইরে আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো না। এবার ক্রালের দরজা বেশ শক্ত করে লাগানো হয়েছিলো। তখন যে কেমন করে হঠাৎ জন্তুগুলোর ধাক্কায় দরজা খুলে গিয়েছিলো, সেটাই অবাক লাগলো—কারণ খিলগুলো বেশ পোক্ত ছিলো।

হুড যেখানটায় চোট পেয়েছিলো, এখন, সব উত্তেজনা প্রশমিত হলে, সেখানটায় বেশ ব্যথা করতে লাগলো, অথচ আঘাতটা তেমন জোরালো হয়নি—আরেকটু হলেই তার ডান হাতটা আস্ত কেটে বাদ দিতে হতো হয়তো আমার অবশ্য কোথাও কোনো চোট লাগেনি।

সকাল হলেই, ঠিক করে ফেললুম, স্টীম হাউসে ফিরে যাবো–আপাতত আর শিকারে যাবার বাসনা আমার নেই।

মাতিয়াস ফান খোইত অবশ্য তার অনুচরদের দশা দেখে বেশ মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন—ফালতু বাঘটিকে পেয়ে অবশ্য তার শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলো। সারা রাতটা তার শশব্যস্ত কেটে গেলো। লোক তিনটিকে সমাহিত করা হলো ক্রালের মধ্যেই গভীর কবর খুঁড়ে-যাতে বুনো জানোয়ারদের খপ্পরে কিছুতেই না-পড়ে। কিন্তু মড়ার আবার দেহের ভয়!

কিছুক্ষণ পরেই তরাইয়ের ছায়া-ঢাকা কালো পথগুলো আলো হয়ে উঠতে লাগলো। ফান খোইতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা স্টীম হাউসের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়লুম! জঙ্গলের রাস্তায় আমাদের যাতে আবার কোনো বিপদে পড়তে না-হয়, সেইজন্য ফান খোইত আমাদের সঙ্গে কালোগনি ও আরো দুজন অনুচর দিয়ে দিলেন।

পথে আর-কোনো বিষম ব্যাপার ঘটলো না। বাঘ কি নেকড়ে-কারু ল্যাজটুকুও আর দেখা গেলো না। বোধহয়, আলো ফুটতে দেখে, রাত্তিরের ওই অভিযানের পর তারা ক্লান্ত বোধ করে, যে যার গোপন ডেরায় ফিরে গেছে। এখন হাঁক পেড়ে তাদের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে তোলার কোনো মানে হয় না। যে-মোষগুলো ক্রাল থেকে প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়েছিলো, সেগুলো হয় বাঘ-নেকড়ের খাদ্যে পর্যবসিত হয়েছে, নয়তো এই তল্লাট ছেড়ে বহু দূরে পালিয়ে গেছে। মোষগুলো ফান খোইতের একেবারে সমূহ লোকশান হলো।

জঙ্গল পেরিয়ে এসে কালোগনি তার সঙ্গীদের নিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলে। আমরা স্টীম হাউসে ফিরে গেলুম ফ্যান আর নাইজারের উল্লসিত ডাকাডাকির মধ্যে।

ব্যাঙ্কসকে আমরা রাত্তিরের সেই রগরগে ও শিহরন ভরা অভিজ্ঞতার কথা খুলে বললুম। এত সহজে আমরা নিষ্কৃতি পেয়েছি শুনে সে আমাদের অভিনন্দন জানালে আর ভাগ্যকে কৃতজ্ঞতা। প্রায় ক্ষেত্রেই এ-রকমভাবে আক্রান্ত হবার পর বন্ধুদের গল্প শোনাবার জন্যে কেউই নাকি বেঁচে থাকে না।

হুড অত্যন্ত অপছন্দ করলেও ব্যাঙ্কস কিন্তু হুডের হাতটা পট্টি বেঁধে স্লিং-এ ঝুলিয়ে রাখলে। তবে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে ব্যাঙ্কস এটা বললে যে আঘাত মোটেই গুরুতর নয়—কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। ভিতরে ভিতরে হুড একেবারে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলো : সে কোনো প্রতিশোধ নিতে পারলে না, মাঝখান থেকে বাঘের থাবার চোট পেয়ে গেলো। অথচ ওই প্রায়-অবশ হাত নিয়েই সে কিনা ৪৯ নম্বরটি ঘায়েল করেছে।

২৭ তারিখ বিকেলে গোটা স্টীম হাউস ফ্যান আর নাইজারের আহ্লাদি ডাকাডাকিতে জেগে উঠলো। বাইরে এসে দেখি সার্জেন্ট ম্যাক-নীল আর গৌমিকে নিয়ে কর্নেল মানরো ফিরে এসেছেন। দেখে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। সার এডওয়ার্ডের অভিযান সফল হয়েছে কি না, তা অবশ্য তখনও জানি না—কিন্তু তিনি যে সুস্থ দেহে ফিরে এসেছেন, এটাই যথেষ্ট।

পরে অবিশ্যি জানা গেলো নেপাল-সীমান্তে তার অন্বেষণের কোনো ফল হয়নি–এটুকু ছাড়া মানরো আর বিশেষ কিছু বলতে চাইলেন না। ব্যাঙ্কস অবিশ্যি হাল ছেড়ে দিলে না—আড়ালে ডেকে ম্যাক-নীলকে জিগেস করে যা জানা গেলো, তার সারমর্ম হলো এই : বই প্রেসিডেন্সিতে আবির্ভূত হবার আগে নানাসাহেব হিন্দুস্থানের যে-অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন, মানরোর ইচ্ছে ছিলো পুরো জায়গাটা সরেজমিন তদন্ত করে দ্যাখেন; নানাসাহেব ও তার সঙ্গী-সাথীদের কী হলো, তা জানবার জন্যে অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন তিনি, জানতে চাচ্ছিলেন বম্বাইতে গিয়ে কে আশ্রয় নিয়েছে—নানাসাহেব, বালাজি রাও।

খোঁজখবর নিয়ে যা জানা গেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই যে বিদ্রোহীরা ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছে। বালাজি রাও-এর কোনো খবরই নেই; নানাসাহেব তো একেবারে উবে গিয়েছেন হাওয়ায়। সাতপুরা পর্বতের অধিত্যকাতেই নিশ্চয়ই নানাসাহেবের মৃত্যু হয়েছে–আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নিশ্চয়ই নেতার মৃত্যুতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। বেহেমথের এখন আর হিমালয়ে থেকে লাভ নেই। বরং বম্বাই অব্দি ঘুরে দেখা ভালো।

সব শুনে ঠিক হলো সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে আমরা ধবলগিরি ছেড়ে রওনা হবো। হুডের ক্ষতটা শুকিয়ে যেতে এই কটা দিন লেগে যাবে। তাছাড়া কর্নেল মানরোও এত জায়গা ঘুরে এসে বেশ ক্লান্ত-ভারও বিশ্রাম চাই।

ব্যাঙ্কস ইতিমধ্যে হিমালয় থেকে বম্বাই যাবার প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ঠিক হলো, উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে-সব অংশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিলো, সেসব অংশ দিয়ে কিছুতেই যাওয়া চলবে না—অর্থাৎ মীরাট, দিল্লি, আগ্রা, গোয়ালিয়র, ঝান্সি—এইসব

জায়গা বেহেমথ বিষবৎ পরিত্যাগ করে চলবে। মানরোর তিক্ত ও বিষণ্ণ স্মৃতিকে খামকা উশকে দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমরা যাবো সিন্ধিয়ার মধ্য দিয়ে–এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওইসব নগরের চেয়ে একদিক থেকে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক।

ইতিমধ্যে অগস্টের মধ্যে মৌশুমি ঋতুর অবসান হয়ে গেলো। সেপ্টেম্বর এলো শুকনো, স্বচ্ছ ও ঝলমলে দিন নিয়ে। তাপমাত্রাও কম, আমাদের যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায় অনেক বেশি ভালো কাটবে, সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে আমরা দু-তিনবার ক্রাল-এ গিয়েছিলুম। মাতিয়াস ফান খোইতও বম্বাই রওনা হবার উদ্যোগ করছিলেন যে কটা জন্তু তার সংগ্রহ করার ছিলো, সবই করেছেন—কিন্তু এখন আবার গাড়ি-টানা মোষ জোগাড় করতে হবে তাঁকে। সে-রাত্রে যে-মোষগুলো পালিয়ে গিয়েছিলো, তার একটাকেও ফিরে পাওয়া যায়নি। সেই জন্যেই ফান খোইত অনেক ভেবে কালোগনিকে পাঠিয়েছেন আশপাশের গ্রামে-যদি কয়েকটা মোষ জোগাড় করা যায় গাড়ি টানবার জন্য।

হুডের ক্ষতটা ক্রমশ শুকিয়ে আসছিলো। একটু সেরে উঠতেই সে ফের শিকারে বেরুবার জন্যে উশখুশ করতে লাগলো। কিন্তু কড়া ফতোয়া জারি করে দিলে ব্যাঙ্কস : রাস্তায় অনেক শিকার পাওয়া যাবে—এখন দুর্বল হাত নিয়ে শিকারে যাবার কোনো দরকার নেই।

কিন্তু আমি যে অন্তত পঞ্চাশটা বাঘ মারতে চেয়েছিলুম, হুড কাতরভাবে বললে, মাত্র উনপঞ্চাশটা হয়েছে।

বাস, ওই ঢের। পঞ্চাশ নম্বরটি না-হয় পরে মেরো।

সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ বিকেলবেলায় ফান খোইত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন যাবার আগে। কেবল বিদায় জানানোই অবশ্য তার উদ্দেশ্য ছিলো না। গাড়িটানা মোষ নাকি তার জোগাড় হয়নি, কালোগনির সব চেষ্টা ও তদন্তই নাকি ব্যর্থ হয়েছে।–অজস্র অর্থের বিনিময়েও সে একটিও মোষ কিনতে পারেনি। এখন এই ওলন্দাজ ভদ্রলোক মহা ফাঁপরে পড়েছেন—কেমন করে যে ওই জানোয়ারগুলোকে নিয়ে বন্দর অব্দি যাবেন, এ-কথা ভেবেই কূল পাচ্ছেন না।

তাহলে কী করবেন আপনি এখন? ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

কী-যে করবো, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না, ফান খাইত বিমর্ষভাবে জানালেন, অথচ কথা ছিলো সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে জন্তুগুলো বম্বাইতে গিয়ে ডেলিভারি দিতে হবে--আর মাত্র আঠারো দিন হাতে আছে আমার।

আঠারো দিন মাত্র! তাহলে তো আপনার আর একমুহূর্তও নষ্ট করলে চলবে না! বম্বাই কি এখান থেকে কম দুর?

তা জানি। কিন্তু এখন আর একটাই মাত্র উপায় আছে আমার–তাছাড়া আঠারো দিনে বম্বাই পৌঁছুনো অসম্ভব।

কী উপায়, শুনি?

কর্নেল যদি দয়া করে আমার একটা উপকার করেন, তাহলে–

বলুন, মিস্টার ফান খোইত। সার এডওয়ার্ড বললেন, আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো উপকার হয়, তো আমি সানন্দে তা-ই করবো।

মাতিয়াস ফান খোইত ঝুঁকে অভিবাদন করে এমন-একটা ভঙ্গি করলেন যেন কর্নেল মানরোর এই অনুগ্রহে তিনি শুধু আপ্লুত নয়, একেবারে প্লাবিতই হয়ে গেছেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি বললেন যে, তিনি শুনেছেন বেহেমথের ক্ষমতা নাকি অসীম-যদি বেহেমথের সঙ্গে তার চাকাওলা-খাঁচাগুলো জুতে দেয়া যায়, এবং এটোয়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে তিনি ট্রেন ধরতে পারেন। কর্নেল মানরো ব্যাঙ্কসের দিকে তাকালেন। মিস্টার ফান খোইত যা চাচ্ছেন, তা কি সম্ভব হবে?

সম্ভব না-হবার তো কোনো কারণ দেখছি না, ব্যাঙ্কস বললে, কত ওজন নিয়ে চলেছে, তা বেহেমথ টেরই পাবে না।

তাহলে তা-ই হবে, মিস্টার ফান খোইত, বললেন কর্নেল মানরো, আপনাকে আমরা এটোয়ায় পৌঁছে দেবো। হিমালয়ে একে-অন্যকে না-দেখলে মানুষ আর কোথায় পরস্পরকে দেখবে বলুন?

সেই অনুযায়ীই বন্দোবস্ত হলো। ওলন্দাজ প্রাণিতাত্ত্বিকটি ক্রল-এ ফিরে গেলেন। লোকজনের মাইনে চুকিয়ে দিতে হবে—সঙ্গে মাত্র চারজন পাহাড়িকে নেবেন তিনি, তারা

জন্তুদের দেখাশুনো করবে, বাকিদের চাকরি এখানেই শেষ। তাছাড়া যাবার ব্যবস্থাও করতে হবে।

তাহলে এই কথাই রইলো–কাল আমাদের দেখা হবে, মানরো বললেন।

আমি তৈরিই থাকবো–ক্রাল-এ গিয়ে আপনাদের ওই বাষ্পীয় দানবকে মোটেই সময় নষ্ট করতে হবে না।

এই বলে সানন্দ চিত্তে ফান খোইত ক্রাল-এ ফিরে গেলেন।

পরের দিন সকাল সাতটার সময় বেহেমথের চুল্লিতে আগুন দেয়া হলো–আবার কয়েক সপ্তাহ পরে প্রচণ্ড বাষ্পবেগে বেহেমথ কেঁপে উঠলো থরথর করে, শুরু হলো আমাদের ভারতদর্শনের দ্বিতীয় পর্যায়।

ঘণ্টা দুই পরে শুঁড় দিয়ে কুণ্ডলী-পাকানো কালো ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বেহেমথ ক্রাল-এ গিয়ে হাজির হলো। বেহেমথকে দেখেই ফান খোইত ছুটতে-ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এলেন, সাধু ভাষায় বিরাট যত বাক্য আউড়ে আবার অবিশ্রাম ধন্যবাদ দিলেন আমাদের, তারপর খাঁচাগুলো বেহেমথের পিছনে জুড়ে দেয়া হলো—এছাড়াও রইলো চাকালাগানো একটা অতিরিক্ত কামরা, সেটাতে থাকবেন ফান খোইত, তাঁর অনুচরদের নিয়ে।

ব্যাঙ্কস সংকেত করতেই বেহেমথের তীক্ষ্ণ ধাতব বাঁশিটি বেজে উঠলো, তারপর রাজকীয় চালে বেহেমথ আস্তে-আস্তে অগ্রসর হলো দক্ষিণের পথ ধরে। ফান খোইত ও তার বহর জুড়ে দেয়া সত্ত্বেও বেহেমথের চালচলনে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না।

কী, ফান খোইত? কেমন লাগছে আমাদের বেহেমথকে, ক্যাপ্টেন হুড জিগেস করলে তাকে।

আমার কি মনে হয়, জানেন ক্যাপ্টেন, মাতিয়াস ফান খোইত বললেন, হাতিটা যদি রক্তমাংসের হতো, তাহলে আরো ভালো হতো।

আমরা যে-পথ দিয়ে হিমালয়ে এসেছিলুম, ফেরার সময় আর সেই পথ না-ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম পথ দিয়ে যেতে লাগলুম। বেহেমথ বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই এই পাহাড়ি পথ দিয়ে ঘুরে-ঘুরে নেমে চললো-কোনো বাধা বা অসুবিধে হলো না পথে। ওলন্দাজ প্রাণিতাত্ত্বিকটি রোজ সকালবেলায় ছোটোহাজরির সময় আমাদের সঙ্গে এসে বসেন খানা খেতে, এবং মঁসিয় পারাজারের রন্ধনপ্রতিভার প্রতি সুবিচার করেন সবেগে ও সহাস্যে। পারাজারের রকমারি রান্না একবার যে চেখে দেখেছে, সে আর কখনও তা ভুলতে পারবে না।

রাস্তায় যখনই কোনো পাহাড়ি গ্রাম পড়লো দলে-দলে গ্রামবাসীরা এলো আমাদের বহর দেখতে। ফান খোইতের বাঘ-সিংহের খাঁচার দিকে তারা একবারও নজর দিলে না, ঘুরে-ঘুরে কেবল লক্ষ করলে বেহেমথকে আর তড়বড় করে নিজেদের ভাষায় সম্ভবত তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করলে। এর ফলে ফান খোইতের মনে যে-শোক দেখা দিতে, তার উপশম করতেন তিনি খাবার-টেবিলে।

অবশেষে দিন দশেক পরে রেলস্টেশন যখন এলো তখন ফান খোইত ট্রেন ধরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবং যে-সব অনুচর এখন আর তার লাগবে না, তাদের তিনি বিদায় দিলেন এখানেই–বাকি দু-তিনজন তার সঙ্গে যাবে বম্বাই অব্দি—সেখানে তাকে জাহাজে

উঠিয়ে দিয়ে তবে তাদের ছুটি। যাদের মাইনে তিনি চুকিয়ে দিলেন, তাদের একজন হলো দুধর্ষ শিকারি কালোগনি।

কর্নেল মানরো ও ক্যাপ্টেন হুডের প্রাণ বাঁচিয়েছিলো বলে কালোগনির উপর আমাদের প্রতি জন্মে গিয়েছিলো। চাকরি চলে-যাওয়ায় তাকে বিমর্ষ হয়ে পড়তে দেখে ব্যাঙ্কস তাকে জিগেস করলে যে সে আমাদের সঙ্গে বম্বাই অব্দি যেতে রাজি আছে কিনা। কিছুক্ষণ কী ভেবে কালোগনি প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে—আর কালোগনি সঙ্গে যাবে শুনে কর্নেল মানরো খুব খুশি হয়ে উঠলেন। সে এদিককার সবকিছু ভালো চেনে —সে স্টীম হাউসে কাজ নিলে আমাদেরই সুবিধে হবে সবচেয়ে বেশি।

ফান খোইতের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলুম অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই—কিন্তু ফান খোইতের ভাবভঙ্গিতে রইলো বিপুল নাটুকেপনা—যেন মঞ্চের ওপর কৌতুকনাট্যের দৃশ্য একটা; কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি তাঁর আতিশয্যে ভরপুর। বিশেষ করে যখন স্টীম হাউস তাকে রেলস্টেশনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো, তখন তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপস্রিয়মাণ বেহেমথকে মূকাভিনয় করে দেখাতে লাগলেন যে কস্মিনকালেও—কবরে, কি চিড়িয়াখানায়—কোথাও আমাদের দয়া তার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না। তার সেই হাত-পা নাড়া দেখতে-দেখতে আমরা এটোয়া পেরিয়ে এলুম।

বেতোয়ার পথে

১৮ই সেপ্টেম্বর বেহেমথ ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে, তা বোঝাতে গেলে একটা ছোট্ট হিশেব দাখিল করা যেতে পারে।

কলকাতা থেকে দূরত্ব ৮১২ মাইল

হিমালয়ের শিবির থেকে দূরত্ব ২৩৬ মাইল

বম্বাই থেকে ব্যবধান ১০০০ মাইল

কত-কত মাইল ভ্রমণ করেছি, সেই হিশেব করলে অবশ্য আমাদের ভারতদর্শনের অর্ধেকও এখনও হয়নি, কিন্তু হিমালয়ের গায়ে যে-সাত হপ্তা কাটিয়ে এসেছি, সে-কথা মনে থাকলে বলতে হয় যে আমরা অর্ধেকেরও বেশি সময় ইতিমধ্যেই অতিবাহিত করে ফেলেছি। কলকাতা ছেড়েছিলুম ৬ই মার্চ—আর দু-মাসের মধ্যেই আশা করা যায় হিন্দুস্থানের পশ্চিম তীরে পৌঁছুতে পারা যাবে।

১৮৫৭র বিদ্রোহে যে-সব নগর প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলো, স্থির হলো তাদের সন্তর্পণে এড়িয়ে আমরা কেবল দক্ষিণমুখো অগ্রসর হবো। মধ্যভারতের পার্বত্য এলাকায় পৌঁছুনো পর্যন্ত কোনো ঝামেলা নেই—সে-পর্যন্ত রাস্তাঘাট খুবই ভালো। তাছাড়া কালোগনি তো সঙ্গে আছেই; তার মতো একজন অভিজ্ঞ ও ওস্তাদ লোক থাকতে কোনো অসুবিধে হবার

কথা নয়-হিন্দুস্থানের এদিকটা তার যে ভালোই জানা আছে, এটা তার হাবভাব দেখে আমরা বুঝতে পারলুম।

কর্নেল মানরো তখন মধ্যাহ্নভোজের পর দিবানিদ্রায় ঢুলে পড়েছেন, এমন সময় ব্যাঙ্কস একদিন কালোগনিকে ডেকে পাঠালে।

ব্যাঙ্কস প্রথমে তাকে জিগেস করলে এদিকটাকে সে কেন এত ভালো করে চেনে। উত্তরে কালোগনি বললে যে সে আসলে যাযাবর বেদুইনদের লোক—এ-সব জায়গায় বেদেদের সঙ্গে বহুবার তাকে যাতায়াত করতে হয়েছে, সেই জন্যেই এখানকার পথঘাট তার এত চেনা হয়ে গেছে।

এখনও এ-সব অঞ্চলে বেদেরা ঘুরে বেড়ায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ–বছরের এ-রকম সময়ে তারা উত্তরে ফিরে আসে—হয়তো রাস্তায় ও-রকম কোনো দলের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে।

তা, কালোগনি, তোমাকে পেয়ে আমাদের খুব ভালো হলো। তুমি আমাদের অনেক কাজে লাগবে। আমরা আসলে বড়ো-বড়ো শহরগুলো এড়িয়ে গিয়ে খোলা জায়গা দিয়ে যেতে চাই–তুমিই তাহলে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

নিশ্চয়ই, হুজুর, ঠাণ্ডা গলায় বললে কালোগনি। তার এই হিম ঠাণ্ডা আবেগহীন গলা শুনলেই আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতে থাকে। সে আরো বললে, কীভাবে আমরা যেতে পারি তার একটা মোটামুটি খশড়া তৈরি করে দেবো কী?

তাহলে তো খুব ভালো হয়। ব্যাঙ্কস টেবিলের উপর একটা মানচিত্র বিছিয়ে ধরলে-কালোগনির কথার সঙ্গে সে মানচিত্র দেখে মিলিয়ে নিতে চায়।

সে আর এমন বেশি কথা কী? একটা সোজা পথ গেছে—দিল্লি রেলপথ থেকে বম্বাই রেলপথ অব্দি—দুটো রাস্তা এসে মিলেছে এলাহাবাদে। এটোয়া আর বুন্দেলখণ্ডের সীমান্তের মধ্যে একটাই বড়ো নদী আমাদের পেরুতে হবে—সেটা যমুনা। ওটা আর বিন্ধ্যপর্বতের মাঝখানে বেতোয়া বলে আরেকটা নদী আছে। বেশি বৃষ্টি হলে মাঝেমাঝে পথঘাট জলে ডুবে যায়—তবে মনে হয় আপনাদের এই কলের হাতি তাকে অনায়াসেই পেরিয়ে যেতে পারবে।

সেজন্যে খুব-একটা ভাবনা নেই, ব্যাঙ্কস তাকে জানালে।তারপর? বিন্ধ্যপর্বতে পৌঁছে–

আমরা একটু দক্ষিণ-পূব মুখো যাবো-একটা ভালো গিরিপথ আছে। সেখানেও কোনো অসুবিধে হবে না—গাড়ি-টাড়ি হলে এই গিরিপথ দিয়েই যায়—রাস্তাটা চেনা। এটাকে বলে শ্রীগড়ের গিরিপথ।

তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু এখানে মানচিত্রে দেখছি শ্রীগড়ের গিরিপথের পর জায়গাটা কেমন উঁচুনিচু। তার চেয়ে ভোপাল দিয়ে গেলে ভালো হয় না?

কিন্তু সেদিকে অনেক বড়ো-বড়ো শহর রয়েছে। তাদের এড়িয়ে-যাওয়া তাহলে মোটেই সম্ভব হবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সেপাইরা সেখানে বড়ো-বড়ো লড়াই। করেছিলো।

স্বাধীনতা সংগ্রাম কথাটা আমার অদ্ভুত ঠেকাে-ইংরেজরা যাকে বলে বিদ্রোহ ভারতীয়রা নিশ্চয়ই এটাকে বিদ্রোহ বলে দ্যাখে না। তাদের কাছে গোটা বিক্ষোভটাই নিশ্চয়ই স্বাধীনতার লড়াই হয়ে উঠেছিলো।

বেশ, তাহলে ভোপালের আশপাশ দিয়ে না-গিয়ে শ্রীগড় দিয়েই আমরা যাবো, বললে ব্যাঙ্কস, কিন্তু তুমি ঠিক জানো তারপর ঐ অসমতল উঁচুনিচু পথ পেরিয়ে আমরা শেষটায় ভালো রাস্তায় গিয়ে পড়বো?

একটু ঘুরে গেলে জব্বলপুরের কাছ দিয়ে আমরা বৰাই যাবার রেলপথ ধরে ফেলতে পারবো।

মানচিত্র দেখে ব্যাঙ্কস বললে, এবার বুঝলুম। আর তারপর–

তারপরে রাস্তাটা আবার দক্ষিণ-পশ্চিমমুখো এগিয়েছে-বম্বাইয়ের রেলপথের একেবারে সমান্তরালভাবে।

হুঁ, ঠিক বলেছো। তাহলে এদিকে তো বিশেষ কোনো অসুবিধে দেখছি না। আমরা তাহলে এদিক দিয়েই যাবো।

কালোগনি সেলাম ঠুকে চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কী ভেবে ফিরে দাঁড়ালে।

কিছু বলবে? ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

একটা কথা জিগেস করবো? বুন্দেলখণ্ডের ঐ শহরগুলো আপনারা এড়িয়ে যেতে চান কেন?

ব্যাঙ্কস আমার দিকে তাকালে একবার। এই লোকটার কাছ থেকে কিছুই লুকোবার নেই আসলে। অল্প দু-চার কথায় ব্যাঙ্কস তাকে কর্নেল মানরোর মনের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলে।

সব শুনে সে একটু অবাকভাবেই বললে, কিন্তু নানাসাহেবের কাছ থেকে তো কর্নেল মানরোর ভয়ের কোনো কারণ নেই—বিশেষ করে এই অঞ্চলে।

এখানেও না, অন্য-কোথাও নয়। ভয় পাবার কথা মোটেই হচ্ছে না। কিন্তু তুমি বিশেষ করে এখানকার কথা বলছো কেন? জিগেস করলে ব্যাঙ্কস।

কারণ শুনেছি কয়েক মাস আগে নানাসাহেবকে নাকি বম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু অনেক খোঁজ-খবর করেও পরে তার আর-কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। যদি কখনও তিনি ওদিকটায় গিয়েও থাকেন, এতদিনে তিনি যে আবার ফিরে এসে ভারত-চিন সীমান্ত অতিক্রম করেছেন, তাতে বোধহয় কোনো সন্দেহ নেই।

তার কথা শুনে বোঝা গেলো যে সাতপুরা পর্বতে মে মাসে কী ঘটেছিলো, সেখবর তার মোটেই জানা নেই।

মনে হচ্ছে হিমালয়ের জঙ্গলে খবর পৌঁছুতে অনেক সময় নেয়। ব্যাঙ্কস বলে উঠলো।

কালোগনি বিমূঢ়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার ধাঁধায়-পড়া ভঙ্গি দেখে মনে হলো না ব্যাঙ্কসের কথার কোনো মর্মোদ্ধার সে করতে পেরেছে।

নানাসাহেব যে মারা গেছেন, তা মনে হচ্ছে তুমি জানো না?

নানাসাহেব মারা গেছেন! কালোগনি অস্ফুট স্বরে চীৎকার করে উঠলো।

নিশ্চয়ই, বললে ব্যাঙ্কস, সরকার বাহাদুর সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছেন। নানাসাহেব নিহত হয়েছেন—

নিহত হয়েছেন? নানাসাহেব? কালোগনি মাথা নাড়লে। শুনি, কোথায় নানাসাহেব নিহত হয়েছেন বলে খবর বেরিয়েছে।

সাতপুরা পাহাড়ে।

কবে? মাস ছয়েক আগে। ২৫শে মে।

কলোগনির কালো মুখটা মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠলো। কোনো কথা না বলে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ। কী যেন ভাবছে।

আমি জিগেস করলুম, নানাসাহেবের মৃত্যুর সংবাদ মিথ্যে বলে মনে হয় তোমার? মিথ্যে মনে হবার কোনো বিশেষ কারণ আছে?

না, সাহেব। আপনারা যা বললেন, তাই আমি বিশ্বাস করেছি। বলে সেলাম করে, কালোগনি সেখান থেকে চলে গেলো।

সে চলে যেতেই ব্যাঙ্কস বললে, দেখলে, মোক্লের? এরা কেমন লোক! সিপাহী বিদ্রোহের নেতাকে এরা মর-মানুষ বলেই মনে করে না। যেহেতু এরা তাঁকে ফাসিতে ঝুলতে দ্যাখেনি, সেইজন্য কোনোদিনই এরা বিশ্বেস করবে না যে তার মৃত্যু হয়েছে।

এ-রকম হয়, আমি বললুম, নাপোলিয়র মৃত্যুর কুড়ি বছর পরেও তার সেনাদল মেনে নিতে পারেনি যে তার মৃত্যু হয়েছে।

শুড বনাম ব্যাঙ্কস

২৯শে সেপ্টেম্বর বেহেমথ আস্তে-আস্তে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলে। শ্রীগড়ের গিরিসংকটে যাবার এটাই রাস্তা।

এ-পর্যন্ত আমাদের রাস্তায় কোনো অসুবিধেই হয়নি। পেরিয়ে এসেছি ত্রিবেণী ও যমুনা, গোয়ালিয়র ও ঝান্সি, বেতোয়া—অর্থাৎ এটোয়া থেকে ৬২ মাইল দূরে চলে এসেছি আমরা।

গোয়ালিয়র ও ঝান্সি পেরুবার সময় আমরা সাবধান ছিলুম। কিছুতেই শহরের মধ্যে ঢুকিনি। কারণ এখানেই নানাসাহেবের বান্ধবী ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে ইংরেজবাহিনীকে প্রতিরোধ করেছিলেন। এখানেই সার্জেন্ট ম্যাকনীলের সঙ্গে সার এডওয়ার্ডের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এখানেই সার হিউ রোজ দু-দিন ব্যাপী একটানা লড়াইয়ে লক্ষ্মীবাঈয়ের বাহিনীর দ্বারা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হন। তান্তিয়া টোপি, বালাজি রাও ও রানী লক্ষ্মীবাঈ অবশেষে পিছু হঠতে বাধ্য হলেও সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে এখানেই প্রথম বিদ্রোহের আগুন দাউদাউ জ্বলে উঠেছিলো। সেইজন্যেই সার এডওয়ার্ডের তিক্ত ও বিষণ্ণ স্মৃতিকে একটুও উশকে দিতে চাইলুম না আমরা—বরং একটু ঘুরে এ-সব শহরের পাশ কাটিয়ে চলে এসেছি বিন্ধ্যপর্বতের সানুদেশে। জব্বলপুর এখান থেকে মাত্র ষাট মাইল দূরে—কিন্তু এখানে তাড়াতাড়ি চলবার উপায় নেই— উঁচুনিচু উবড়োখবড়ো পার্বত্যভূমি, সেইজন্যেই অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগবে জব্বলপুর পৌঁছুতে খাড়া

উৎরাই, খারাপ রাস্তা, পাথুরে জমি, হঠাৎ একেকটা ধারালো মোড় আর সরু গিরিপথ—এই সবকিছু মিলে বেহেমথের গতি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে।

তাছাড়া এখানে সবসময় সাবধানে থাকতে হচ্ছে, ব্যবস্থা রাখতে হচ্ছে কড়া পাহারার। কালোগনিই বিশেষ করে পাহারার ব্যবস্থা করার জন্যে তাড়া দিয়েছে। কারণ এদিকটায় নাকি ভীষণ দস্যুর ভয়। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল বলে এখানটায় নাকি বহু দস্যুদল আশ্রয় নিয়েছে-ফলে এখান দিয়ে যাবার সময় অত্যন্ত সাবধান হতে হয়। হয়তো কিছুই হবে না, কোনো ডাকাতদলই বেহেমথকে আক্রমণ করবে না; কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই।

অবশ্য আমাদের ভয়ের কিছু ছিলো না। প্রথমত আমরা সংখ্যায় নেহাৎ কম নই, অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে যথেষ্ট, তার উপর আস্ত একটা চলন্ত কেল্লায় করে যাচ্ছি। কাজেই বুন্দেলখণ্ডের এদিকটায় যদি খুনে ডাকাত বা ভীষণ ঠগিরা ঘাপটি মেরে লুকিয়েও থাকে তবু আমাদের আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

শ্রীগড়ের গিরিপথ অব্দি অনায়াসেই পৌঁছুনো গেলো—একটু সময় লাগলো বটে, কিন্তু কোনো বিপদ-আপদ বা অসুবিধে হলো না আমাদের। তাছাড়া দেখে মনে হলো এই সব ঘোরানো ও জটিল পাহাড়ি রাস্তা কালোগনির একেবারে নখদর্পণে। কাজেই তার উপরেই সব ভার ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো; সে-ই আমাদের এইসব পাইন বন, গভীর খাত ও উঁচু পাকদণ্ডী দিয়ে অনায়াসেই বেহেমথকে চালনা করে নিয়ে এলো।

কখনও-কখনও অবশ্য সে বেহেমথকে থামিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে চারপাশটা দেখে আসছিলো, তবে তা কিন্তু পথ চেনে না বলে নয়,-বর্ষার পর এখানকার রাস্তা অনেক

সময় থাকে প্লবিত ও পিছল, সে-রকম অবস্থায় হয়তো বেহেমথকে ও-পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক।

আবহাওয়াও চমৎকার যাচ্ছে। বৃষ্টি-বাদল নেই; জলন্ত আকাশ হালকা কুয়াশার পর্দায় ঢাকা, সেইজন্যে গরমও কম লাগছে। চাই কি সময়-সময় হুড শিকারের মৎলব এঁটে সফরিতে বেরুচ্ছে। তবে ফক্স আর সে, দুজনেই তরাইয়ের জঙ্গলের জন্য হাহুতাশ করে প্রায়ই; সেখানে যেন বন্যজন্তুর মেলা বসে গিয়েছিলো—কিন্তু এখানে বাঘসিংহের কোনো পাত্তাই নেই।

তবে সেইসব আমিষখোর জন্তুর বদলে আমরা এখানে মাঝে-মাঝে বুনো হাতির দেখা পাচ্ছি, যে-দৃশ্য এমনকী, ভারতবর্ষের অন্য-অনেক অঞ্চলেও দুর্লভ। ৩০শে সেপ্টেম্বর দুপুরবেলায় এমনকী একজোড়া হাতিকে বেহেমথের সামনে দেখা গেলো। বাঁশি বাজিয়ে বেহেমথকে সবেগে অগ্রসর হতে দেখে, তারা রাস্তা থেকে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের যেতে দিলে । বোধহয় বেহেমথের মতো প্রকাণ্ড অতিকায় হাতিকে দেখে তারা কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো।

এমনকী ক্যাপ্টেন হুড শুদ্ধু–কোনো বুনো জন্তু দেখলেই যার হাত বন্দুকের ঘোড়া টেপবার জন্যে নিশপিশ করতে থাকে-অপ্রয়োজনে এই প্রকাণ্ড সুন্দর জন্তুদের তাগ করে গুলি চালাবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা কেবল তাদের চলার ভঙ্গির প্রশংসা করতে লাগলুম।

ফান খোইত থাকলে নিশ্চয়ই এই সুযোগে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে মস্ত একটা বক্তৃতা দিয়ে বসতেন, ক্যাপ্টেন হুড মন্তব্য করলে।

এটা নিশ্চয়ই সবাই জানে যে ভারতবর্ষই আসলে মাতঙ্গ রাজ্য–যদিও এটা ঠিক যে আফ্রিকার হাতির চেয়ে ভারতের হাতি আকারে অনেক ছোটো—তবে ভারতের নানা অঞ্চলেই এদের পাওয়া যায়—ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলেও হাতি ঘুরে বেড়ায়। সাধারণত খেদা-র সাহায্যেই হাতি ধরা হয়ে থাকে; পোষা হাতিরা ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে আসে তাদের—কখনও বহু শিকারি একত্রে হাতিদের তিনদিক থেকে ঘিরে তাড়া লাগায়। বাংলাদেশে ও নেপালে এখনও ল্যাসো ব্যবহার করা হয় হাতি ধরার সময়ে। শুনে মনে হতে পারে হাতি ধরা বুঝি খুব সহজ ব্যাপার, কিন্তু বুনো খ্যাপা হাতির পাল্লায় পড়লে একেক সময় একেকটা তল্লাট তছনছ হয়ে যায়—আর বর্ষার পর অনেক সময়েই ভারতের বনজঙ্গলে খ্যাপা হাতির সন্ধান মেলে—এমনকী জনপদ পর্যন্ত নেমে আসে তারা, বাড়িঘর ভেঙেচুরে তাণ্ডব শুরু করে দেয়। কে বেশি মারাত্মক–মানুষখেকো বাঘ, না খ্যাপা হাতি-এ-তর্কের হয়তো কোনো শেষ নেই।

হাতি দুটো সরে দাঁড়িয়ে বেহেমথের পথ করে দিলে, আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হস্তিপুঙ্গবদের প্রশংসা করতে লাগলুম, স্টর আর কালু নির্বিঘ্নে হাতি দুটোকে পেরিয়ে বেহেমথকে চালিয়ে নিয়ে গেলো। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি হাতি দুটিও আমাদের পিছনপিছন আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আরো-কয়েকটি হাতির দেখা পাওয়া গেলো; একটু দ্রুত হেঁটে তারাও আগেকার দুটো হাতির সঙ্গ নিলে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই দেখা গেলো বেহেমথের

পিছন পিছন প্রায় ডজন খানেক হস্তিশাবকের শোভাযাত্রা আসছে। স্পষ্ট বোঝা গেলো বেহেমথকে দেখে তারা বিস্মিত হয়েছে, প্রায় পঞ্চাশ গজ পিছনে সেই জন্যেই তারা মিছিল করে তাকে দেখতে আসছে। আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার কোনো লক্ষণ বা তাড়া তাদের নেই, এবং আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করারও কোনো মৎসব তাদের দেখা গেলো না। ইচ্ছে করলে পবনবেগে ছুটতে পারে হাতিরা; বিন্ধ্যপর্বতের উবড়োখবড়ো রাস্তায় দ্রুত চলাই তাদের অভ্যেস। কিন্তু হাবভাব দেখে বোঝা গেলো আরো একপাল হাতিকে ডেকে এনে বেহেমথকে দেখানো ছাড়া তাদের আর-কোনো মৎলব নেই, কারণ চলতে-চলতে তারা অনবরত অদ্ভুত আওয়াজ করে-করে ডাকছিলো। সেই ডাক যে আসলে অন্য হাতিদের হাঁক পেড়ে নিয়ে-আসা, তা বুঝতে আমাদের দেরি হলো না, কারণ দূর থেকে ঠিক তেমনিভাবে তৎক্ষণাৎ অন্য হাতিদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিলো।

একটা নাগাদ দেখা গেলো প্রায় তিরিশটা হাতি পায়ে-পায়ে আমাদের অনুসরণ করে আসছে; সংখ্যাটা যে অচিরেই আরো বৃদ্ধি পাবে, সেই সম্ভাবনাটাও ছিলো তখনও। মাঝে-মাঝে এ-রকম যুথবদ্ধ হাতির পালের মুখোমুখি পড়া ভারতের জঙ্গলে নতুন ব্যাপার নয়—এবং সেই সাক্ষাৎকার পথিকদের পক্ষে সাধারণত বিশেষ উপভোগ্য ঠেকে না।

আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠার সঙ্গেই এই অদ্ভুত মিছিলটি তাকিয়েতাকিয়ে দেখতে লাগলুম।

সংখ্যা যে ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে, বললে ব্যাঙ্কস, এদিককার সব হাতিকেই দেখছি একজায়গায় জড়ো করতে চায় এরা।

কিন্তু, আমি বললুম, তারা নিশ্চয়ই অনেক দূর-দূর থেকে সব হাতিকে ডেকে আনতে পারবে না।

ডাকতে পারবে না, এ-কথা ঠিক, ব্যাঙ্কস সায় দিলে, কিন্তু এদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর-কারণ পোষা হাতিরা অনেক সময় তিন-চার মাইল দূরের বুনো হাতির গন্ধ পায়।

এরা তো দেখছি মহাপ্রস্থানে বেরিয়েছে। বললেন কর্নেল মানরো, ব্যাঙ্কস, আমাদের বোধহয় বেহেমথের গতি বাড়ানো উচিত।

বেহেমথ তার যথাসাধ্য করছে, সার এডওয়ার্ড। এই উবড়োখবড়ো উৎরাই বেয়ে চলা খুব-একটা সহজ কাজ নয়।

তাড়াহুড়ো করার কী দরকার? নতুন অ্যাডভেনচারের গন্ধে হুড উল্লসিত হয়ে উঠলো, আসুক না এরা, যতখুশি। এরা যদি আমাদের শোভাযাত্রা করে পোঁছে দিতে চায়, তাহলে ক্ষতি কী? জায়গাটা এমনিতেই উষর আর পরিত্যক্ত—এদের জন্যেই এখন ক্রমশ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে। রাজাবাদশারাও কখনও এ-রকম সংবর্ধনা পায় না।

এদের উপস্থিতিকে না-মেনে আর উপায় কী? বললে ব্যাঙ্কস, এদের হাত এড়াবার কোনো পথ তো দেখছি না।

আরে, এত ভয় পাচ্ছো কেন? জিগেস করলে ক্যাপ্টেন হুড। এটা নিশ্চয়ই জানো একটা খ্যাপা হাতি যত ভীষণ, একটা আস্ত হাতির পাল তত নয়। বেশতো শান্তশিষ্ট জীব-শুঁড়ওলা কতগুলো ভেড়া, এই আর-কী।

হুডের উৎসাহ দেখছি ক্রমশই উশকে উঠছে, বললেন কর্নেল মানরো, আমি এ-কথা মানতে রাজি আছি যে হাতির পাল যদি এমনিভাবে পিছন পিছন আসে আমাদের, তাহলে আমাদের ভয়ের কিছুই নেই; কিন্তু যদি হঠাৎ এ-কথা তাদের মাথায় ঢোকে যে এই সরু রাস্তায় আমাদের পাশ কাটিয়ে তাদের এগিয়ে যেতে হবে, তাহলে ব্যাপারটা খুবই সঙিন হয়ে উঠবে।

তাছাড়া, আমি বললুম, বেহেমথের মুখোমুখি পড়লে তাকে যে কী-রকম সংবর্ধনা জানাবে, তা-ই বা কে জানে।

যত বাজে কথা! ওরা হাঁটু গেড়ে বসে শুঁড় তুলে বেহেমথকে সেলাম ঠুকবে। বললে হুড, মনে নেই, কুমার গুরু সিং-এর হাতিরা কী-রকম সেলাম জানিয়েছিলো?

কিন্তু তারা ছিলো পোষ্য হাতি, শেখানো।

ওই বুনো হাতিগুলোও পোষ মানবে। বেহেমথের সামনে পড়লে এতই চমকে যাবে যে গভীর শ্রদ্ধা জেগে উঠবে এদের মনে।

কৃত্রিম যান্ত্রিক হাতির জন্যে হুডের প্রশংসা ক্রমেই গগনচুম্বী হয়ে উঠলো। আরো বললে, তাছাড়া হাতিরা বেশ বুদ্ধিমান হয়। তারা যুক্তি দেবে, তুলনা করবে, বিচার করে দেখবে। মানুষের মতো তারাও দুটো ভাবনাকে যোগ করে দেখতে পারে।

আমি এ-কথা মানি না, বললে ব্যাঙ্কস!

এ-কথা মানো না? তুমি? হুড বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি বুঝি কস্মিনকালেও ভারতে বাস করোনি। কেন, পোষা হাতিদের যে সবরকম ঘরোয়া কাজেই লাগানো হয়, তা তুমি জানো না? এ-কথা কি কখনও শোননি, মোক্লের, বড়ো-বড়ো লেখকরা হাতি সম্বন্ধে কী বলে গেছেন? তাদের মতে, হাতি অত্যন্ত প্রভুভক্ত—মোট বয়, ফুল তুলে নিয়ে আসে প্রভুদের জন্যে, বাজার করে, নিজের জন্যে আখ, কলা, আম কিনতে পারে, নিজেই দম চুকিয়ে দেয় জিনিশপত্রের, পাহারা দেয়, গোটা ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে শিক্ষিত ধাত্রীর চেয়েও যত্ন করে ছোটোদের নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। দয়া আছে তার, কৃতজ্ঞ জীব, স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত, কোনো উপকার কি আঘাত পেলে ভোলে না কখনও। তাছাড়া কী নরম তার মন! পারলে একটা মশামাছি পর্যন্ত মারে না। আমার এক বন্ধু নিজের মুখে বলেছে এ-কথা : একটা পাখি নাকি বসেছিলো একটা পাথরের উপর, হাতিকে বলা হলো পাখিটা পায়ের তলায় চেপ্টে মারতে! কে কার কথা শোনে! মাহুতের হুমকি, ধমক কি ডাঙশের ঘা কিছুই হাতিটাকে ওই দুষ্কর্মে লিপ্ত করাতে পারেনি। তখন তাকে বলা হলো পাখিটাকে তুলে আনতে, অমনি সে আস্তে সন্তর্পণে আলগোছে গুড় দিয়ে পাখিটাকে তুলে আনলে—এবং তাকে উড়ে যেতে দিলে। আমার বন্ধু এ-দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছে। বুঝলে, ব্যাঙ্কস, এটা তোমাকে মানতেই হবে যে হাতি এমনিতে খুব ভালো জীব, দয়া আছে, অন্যান্য জীবজন্তুর চেয়ে নানাদিক দিয়ে

ভালো-বাঁদর কি কুকুরের চেয়েও বুদ্ধিমান ও প্রভুভক্ত! শোননি ভারতীয়দের মতে হাতিদের নাকি মানুষের মতোই বুদ্ধিশুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান রয়েছে? বলে হুড তার টুপি খুলে হাতিদের দিকে ঝুঁকে অভিবাদন জানালে।

ভালো বলেছে, হুড! কর্নেল মানরো মুচকি হাসলেন। হাতিরা তোমার মধ্যে একজন সত্যিকার ভালো উকিল পেয়েছে।

আপনার কি মনে হয় না আমি ঠিক বলেছি?

হুড হয়তো ঠিক কথাই বলেছে, বললে ব্যাঙ্কস, কিন্তু তবু আমি স্যাণ্ডারসনের মতেই সায় দেবো-স্যাণ্ডারসন কেবল মস্ত শিকারিই নন, এ-সব বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞও বটে।

বটে? তা শুনি তোমার স্যাণ্ডারসন মহোদয় কী বলেছেন?

তার মতে হাতিদের তেমন-কিছু অসাধারণ বুদ্ধি নেই। হাতিদের নিয়ে যে-সব গালগল্প প্রচলিত, তা আসলে মাহুতদের আদেশ পালন করারই ফল—তারা খুবই

প্রভুভক্ত, খুব কথা শোনে, এই আরকি!

বটে!

তিনি আরো বলেছেন, ব্যাঙ্কস বললে, হিন্দুরা কেন হাতিকে জ্ঞানের প্রতীক বলে মান্য করেনি, সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। স্থাপত্যে কি ভাস্কর্যে সর্বত্র বুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধা পেয়েছে শেয়াল, ভুশুণ্ডি কাক কি বাঁদর!

ভুল! ভুল! আমি এ-কথার প্রতিবাদ করি, তীব্র স্বরে বললে হুড।

প্রতিবাদ তুমি যত পারো করো, কিন্তু তার আগে আমার কথা শুনে নাও। স্যাণ্ডারসন বলেছেন যে মগজের মধ্যে আদেশ পালন করার কোষটা হাতিদের অস্বাভাবিক বর্ধিত-হাতির মাথার খুলি ব্যবচ্ছেদ করে কোষগ্রন্থিটা পরীক্ষা করেছেন তিনি। তাছাড়া হাতিরা এত নির্বোধ যে সহজেই ফাঁদে পড়ে যায়—তাকে ভুলিয়েভালিয়ে খেদায় নিয়ে আসা যায়। যদি কখনও পালিয়েও যায়, তবু এমনই অনায়াসে তাকে আবার ধরে ফেলা হয় যে তাতে তার কাণ্ডজ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। এমনকী অভিজ্ঞতাও তাকে বিশেষ-কিছু শেখাতে পারে না।

হায়রে হস্তিশাবক! শোন, ব্যাঙ্কস তোদের কী প্রশংসাপত্র দিচ্ছেন।

আরো বলবো? ব্যাঙ্কস বললে, স্ত্রী-হাতি কিংবা হস্তীশাবককে পোষ মানানো একটা প্রাণান্তকর ব্যাপার! এরা কিছুতেই কিছু শিখতে চায় না

তাতে তো আরো-বেশি প্রমাণিত হয় যে হাতিরা আসলে মানুষেরই মতো, হুড হেসে বললে, ছেলেছোকরা কি স্ত্রীলোকের চাইতে বয়স্ক মানুষদের শেখানো বা বোঝানো অনেক সোজা নয় কি?

বন্ধু-হে, আমি আর তুমি যেহেতু বিয়ে করিনি, সেই জন্যে আমাদের কি এ-রকম একটা মন্তব্য করে ফেলা ভালো?

হা-হা-হা, এটা তুমি ঠিক বলেছো।

এককথায়, ব্যাঙ্কস বললে, হাতিদের সুবুদ্ধি কি কাণ্ডজ্ঞানের উপর বেশি নির্ভর করতে আমি আদৌ রাজি নই। যদি কোনোকিছুতে এরা একবার খেপে যায়, তাহলে এদের প্রতিরোধ করা অসম্ভব হবে। যারা আমাদের এখন দক্ষিণমুখো পৌঁছে দিতে চাচ্ছে, আমি চাই যে শিগগির তারা যেন অন্যকোনো কাজে উলটো দিকে ছুট লাগায়!

তুমি আর হুড যতক্ষণ এদের নিয়ে তর্ক করলে, ততক্ষণে কিন্তু সংখ্যায় এরা ভীষণ রকম বেড়ে উঠেছে, ব্যাঙ্কস, আস্তে, ধীর গলায় মন্তব্য কবলেন কর্নেল মানরো।

এক বনাম একশো

সার এডওয়ার্ড আদৌ ভুল বলেননি। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি হাতি এখন আমাদের পিছনপিছন ধাবমান। দল বেঁধে এগুচ্ছে তারা একযোগে, ইতিমধ্যেই স্টীম হাউসের এত কাছে এসে পড়েছে–বেহেমথের সঙ্গে তাদের দূরত্ব মাত্র দশগজ হবে এখন-যে তাদের খুব ভালো করে লক্ষ করা যাচ্ছিলো।

হুড, আমি বললুম, একবার তাকিয়ে দ্যাখো কতগুলো হাতি! এখনও কি তুমি বলতে চাও যে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই?

ফুঃ, হুড আমার কথা যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে, এরা আমাদের ক্ষতি করতে চাইবে কেন, বলো? এরা তো আর বাঘের মতো নয়, কী বলো, ফক্স?

নেকড়েদের মতোও নয়, প্রভুর কথায় ধুয়ো ধরলে অনুচরটি।

কিন্তু এ-কথায় দেখলুম কালোগনি ঘন-ঘন মাথা নাড়লে। বোঝা গেলো, সে এবিষয়ে মোটেই একমত নয়।

তোমাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, কালোগনি, ব্যাঙ্কস বললে।

কালোগনি কেবল বললে, বেহেমথের বেগ কি আর বাড়ানো যায় না?

বেশ কঠিন কাজ, ব্যাঙ্কস বললে, তবু একবার চেষ্টা করে দেখি।

এই বলে ব্যাঙ্কস বারান্দা থেকে গিয়ে হাওদায় উঠলো। স্টর দাঁড়িয়েছিলো হাওদায়। কী কথা হলো দুজনে, তারপরেই বেহেমথের বেগ আরো বেড়ে গেলো। বেড়ে গেলো, তবে অতি সামান্যই, কারণ রাস্তাটা বন্ধুর। কিন্তু বেহেমথের গতি যদি দ্বিগুণ বাড়ানো হতো, অবস্থাটা তবু রইতো তথৈবচ–কারণ হাতির পালও সেই তুলনায় গতি বাড়িয়ে দিলে।

ঘণ্টা কয়েক কেটে গেলো এইভাবেই। শেষে নৈশভোজ সেরে আমরা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। পিছনে সোজা চলে গেছে রাস্তাটা-কোনো বাঁক না-নিয়ে মাইল দু-তিন { অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করলুম ইতিমধ্যে হাতিরা সংখ্যায় আরো বেড়েছে। গুনবার চেষ্টা করে দেখলুম, অন্তত একশো হবে তারা সংখ্যায়। দু-তিনটি সারি ধরে এগুচ্ছে তারা, চুপচাপ, একই তালে, একই ছন্দে, শুঁড় শূন্যে তোলা। জোয়ারের জল যেমন ভাবে এগোয়, তেমনি অনিবার্য ভঙ্গি তাদের। এখন সব শান্ত, কিন্তু একবার খেপে উঠলে কী-যে হবে কে জানে।

এদিকে সব ঝাঁপসা হয়ে এসেছে। চঁাদ ওঠেনি। তারাও দেখা যাচ্ছে না আকাশে–পাৎলা একটা কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে এর মধ্যেই। ব্যাঙ্কস ঠিকই বলেছিলো : অন্ধকারে এ-রকম বিশ্রী রাস্তায় এগুনো দুঃসাধ্য হবে। সামনে উপত্যকাটা একটু চওড়া হলেই বেহেমথকে থামিয়ে দিয়ে রাতের মতো বিশ্রাম নেয়া হবে, এটাই ঠিক হয়েছিলো খাবার টেবিলে।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসতেই হাতিদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেলো, যেটা সারাদিনে একবারও দেখা যায়নি। কেমন যেন একটা চাপা গর্জন করলে তারা, তারপরেই আরো-একটা অদ্ভুত ডাক উঠলো তাদের মধ্যে, অনেকটা দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দের মতো।

মানবরা জিগেস করলেন, হঠাৎ এই ডাকাডাকির অর্থ কী?

এ-রকম শব্দ তারা করে, কালোগনি জানালে, শত্রুর সামনে পড়লে।

তার মানে এরা আমাদের শত্রু বলে মনে করছে? ব্যাঙ্কস বললে।

তা-ই তো আশঙ্কা করছি, উত্তর দিলে কালোগনি।

রাত নটা নাগাদ আমরা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত একটি সমতলভূমিতে এসে পৌঁছুলুম–আধমাইল চওড়া গোল একটা চত্বর যেন—এখান থেকেই রাস্তা গেছে পুটুরিয়া হ্রদের দিকে—যেখানে গিয়ে আমরা বম্বাইয়ের রাস্তায় পৌঁছুবো। কিন্তু হ্রদটা এখনও দশ মাইল দূরে-এই অন্ধকার রাতে সেদিকে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ব্যাঙ্কস থামবার সংকেত করলে, অমনি বেহেমথ থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু চুল্লি নিভিয়ে ফেলা হলো না। স্টরকে আগেই বলা হয়েছিলো এঞ্জিন চালু রাখতে, যাতে মুহূর্তের মধ্যে আবার রওনা হয়ে পড়া যায়।

মানরো তাঁর ঘরে চলে গিয়েছেন, কিন্তু ব্যাঙ্কস আর হুড বারান্দায় বসে আছে। আমারও একা শুয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিলো না, অন্যরাও তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু হাতিরা হঠাৎ স্টীম হাউস আক্রমণ করলে কী-যে করবো, তা-ই ঠিক করতে পারছিলুম না আমরা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সেই চাপা সুরে বাজ পড়ার মতো আওয়াজ শোনা গেলো আমাদের চারপাশে। হাতির পালটা সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা কি তবে বেহেমথের পাশ কাটিয়ে আরো দক্ষিণে চলে যাবে? তা-ই মনে হলো, কারণ রাত সোয়া-এগারোটা নাগাদ আর-কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেলো না; সব হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ হয়ে গেছে। শুধু বেহেমথের এঞ্জিনের ফোঁশ-ফোঁশ আওয়াজ ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই কোথাও।

কেমন? ঠিক বলিনি? হাতিগুলো নিজেদের পথে চলে যাবে, বললে হুড।

উঁহু! আমি ততটা নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। বললে ব্যাঙ্কস, তবু দেখা যাক। বলে সে হাঁক পাড়লে, স্টর! সন্ধানী আলোটা জ্বালো দেখি।

তক্ষুনি দুটো তীব্র বিজলি বাতি জ্বলে উঠলো বেহেমথের চোখে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশে দেখা হলো আলো ফেলে।

দেখা গেলো, হাতিরা স্টীম হাউসকে ঘিরে স্থিরভাবে চুপচাপ শুয়ে আছে। ওই তীব্র আলো পড়ে তাদের কালো পাহাড়প্রমাণ শরীরগুলো কী-রকম ভুতুড়ে দেখালো–কেমন যেন অতিকায় ও প্রাগৈতিহাসিক। আলো পড়তেই যেন খোঁচা খেয়ে জেগে গেলো তারা।

শুঁড় উঠে গেলো শূন্যে, চোখা দাঁতগুলো উদ্যত হলো অস্ত্রের মতো, চাপা রাগি গুমগুমে গর্জন উঠলো।

আলো নিভিয়ে ফ্যালো, এক্ষুনি, ব্যাঙ্কস নির্দেশ দিলে।

তক্ষুনি আলো নিভে গেলো হঠাৎ, আর অমনি যেন মন্ত্রবলে সব চাঞ্চল্যও থেমে গেলো মুহূর্তে।

দেখলে তো, স্টীম হাউসকে ঘিরে ফেলেছে এরা। বললে ব্যাঙ্কস।

হুম। হুডের বিশ্বাস এতক্ষণে একটা মস্ত ঝাঁকুনি খেলো।

কিন্তু কী করা যায় এখন? কালোগনির কাছে পরামর্শ চাওয়া হলো। সে তার উদ্বেগ চাপা দেবার কোনো চেষ্টাই করলে না। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে যাওয়া যায় না? উঁহু, অসম্ভব! তাছাড়া তাতে কীই-বা লাভ হবে? হাতির পাল যে অন্ধকারেও আমাদের অনুসরণ করবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তাছাড়া রাতের বেলায় এই পাহাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে-পড়ার অনেক বিপদ আছে। কাজেই আলো ফোটবার আগে রওনা হবার কোনোরকম চেষ্টা না-করাই ভালো। হাতির পালকে না-চটিয়ে তখন আমরা চলে-যাওয়ার একটা আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারি।

কিন্তু তখনও যদি হাতির পাল পাছু না-ছাড়ে? আমি জিগেস করলুম।

তখন আমরা এমন-কোথাও যাবার চেষ্টা করবো, যেখানে তারা আর বেহেমথের নাগাল পাবে না, বললে ব্যাঙ্কস।

বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করবার আগে এমন কোনো জায়গা কি পাবো আমরা? নাছোড় হুড জানতে চাইলো।

একটা জায়গা অবিশ্যি আছে, বললে কালোগনি।

কোথায়?

লেক পুটুরিয়া।

এখান থেকে হ্রদটা কতদূরে?

প্রায় ন মাইল।

কিন্তু হাতিরা তো সাঁৎরাতে পারে—প্রায় সমস্ত দিনই তারা জলে কাটিয়ে দিতে পারে! বললে ব্যাঙ্কস। ওরা যদি লেক পুটুরিয়া অব্দি আমাদের ধাওয়া করে যায়, তাহলে তো অবস্থা আরো সঙিন হয়ে পড়বে।

কিন্তু তাছাড়া তো এদের হাত এড়াবার আর-কোনো উপায় দেখছি না।

তাহলে তা-ই করা হোক। ব্যাঙ্কস রাজি হলো।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তাছাড়া অবিশ্যি আর-কিছু করারও ছিলো না। হাতিগুলো হয়তো জলে নেমে পড়ার ঝুঁকি নেবে না; যদি-বা নেয়, তাহলে তাদের এড়িয়ে যাবার জন্যে অনা-কোনো উপায় তখনই না-হয় ভাবা যাবে।

আমরা অধীরভাবে দিনের অপেক্ষা করতে লাগলুম। তখন রাত শেষ হতে বেশি বাকিও ছিলো না। কিন্তু দিন হলে দেখা গেলো, একটি হাতিও নড়েনি—স্টম হাউসকে তারা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে। এবার দিনের বেলায় কয়েকটা হাতি এসে একেবারে বেহেমথের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। ব্যাঙ্কস বলে দিয়েছিলো কেউ যেন কিছুতেই হাতিদের চটিয়ে না-দিই। হাতিরা নিশ্চয়ই এখন নিশ্চল বেহেমথকে ঘিরে বুঝতে চাচ্ছে হাতিরই মতো দেখতে এই অতিকায় দানবটা কোন আজব কিম্ভূত জন্তু। তাদেরই কোনো আত্মীয় কি? তার ক্ষমতা তাদের চেয়ে বেশি, এটা কি তারা বুঝতে পারছে? আগের দিন তারা ভালো করে দেখতে পায়নি তাকে, কারণ সারাক্ষণই একটু দূরে-দূরে ছিলো। কিন্তু এখন তারা কী করবে, যখন ঘোঁৎ করে আওয়াজ করে গুড় দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া ছাড়বে বেহেমথ? যখন দেখবে যে মস্ত পা ফেলে-ফেলে বেহেমথ দুটো আস্ত বাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে, তখন তাদের সকলের প্রতিক্রিয়া কী হবে?

কর্নেল মানরো, ক্যাপ্টেন ইড, কালোগনি আর আমি স্টীম হাউসের সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়ালুম; সার্জেন্ট ম্যাক-নীল তার সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়ালো পিছনে। কালু চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে কেবলই জ্বালানি দিয়ে স্টীম বাড়িয়ে চললো। ব্যাঙ্কস রইলোস্টরের সঙ্গে হাওদায়, চাকায় হাত দিয়ে প্রস্তুত, যাতে যে-কোনো দিকে স্টীম হাউসকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়!

অবশেষে যাবার মুহূর্ত এলো। ব্যাঙ্কসের ইঙ্গিতে স্টর স্প্রিং ধরে টান দিলে, তীব্র একটা কানে-তালা-ধরানো বাঁশির আওয়াজ হলো। আশপাশের হাতিরা মাথা তুলে একটু সরে দাঁড়ালো পিছনে, সামনে কয়েক ফুট জায়গা ফাঁকা করে দিলে।

বেহেমথের শুঁড় দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এলো, চাকাগুলো গড়িয়ে গেলো সামনের দিকে, বেহেমথ চলতে শুরু করে দিলে।

বেহেমথকে চলতে দেখেই সামনের হাতিদের মধ্যে অদ্ভুত-একটা সাড়া পড়ে গেলো। ভীষণ অবাক হয়ে গেলো তারা, কী-রকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে সরে গেলো সামনে থেকে, আর রাস্তা করে দেয়ার ফলে বেহেমথ সামনের দিকে এগিয়েই চললো।

কিন্তু হাতিরাও সঙ্গ ছাড়লে না কিছুতেই। তারাও পিছনে আসতে লাগলো, আগেরই মতে, উপরন্তু এবার দু-পাশেও হাতির পাল বেহেমথের সমান্তরভাবে এগুতে লাগলো। যেমনভাবে ঘোড়সোয়াররা রাজারানীর গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে এগোয়, অনেকটা সেইভাবে। এই চমকপ্রদ পুরো দলটা চললো আশ্চর্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে, তাড়াহুড়ো করলো না, কোনো উত্তেজনা প্রকাশ করলো না—কেবল বেহেমথের গতির সঙ্গে সমানে তাল রাখতে লাগলো।

এরা যদি এইভাবেই আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে হ্রদ পর্যন্ত যায়, বললেন কর্নেল মানরো, তাহলে আমি কোনো আপত্তি করবো না।

কিন্তু রাস্তা যখন সংকীর্ণ হয়ে যাবে, তখন কী হবে? আশঙ্কা প্রকাশ করলে কালোগনি।

ঘণ্টা তিনেক কেটে গেলো, আমরা আট মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি–ওর মধ্যে নতুন-কিছুই ঘটেনি। হাতিদের দেখে-দেখে আমরা কী-রকম যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছি —প্রথম যে-চমক আর ভয়টা ছিলো, তা ক্রমশই থিতিয়ে গিয়ে ভোতা হয়ে আসছে। হ্রদটা মাত্র আর মাইল দু-এক দূরে-সেখানে গিয়ে একবার পৌঁছুতে পারলেই আরকোনো ভয় থাকবে না, আমরা ভাবলুম।

এই জায়গাটা ঠিক বন্য নয়, কিন্তু মরুভূমির মতো ফাঁকা। কোনো গ্রাম পড়লো নাপথে, একটা গোলাবাড়িও নয়, কোনো পথিক পর্যন্ত দেখতে পেলুম না এ-পর্যন্ত। বুন্দেলখণ্ডের এই পার্বত্যপ্রদেশে আসার পর থেকে একটি মানুষও আমাদের চোখে পড়েনি।

এগারোটা নাগাদ উপত্যকাটা সংকীর্ণ হয়ে এলো, রাস্তার দু-পাশে উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো পাহাড়—এবং আবার আমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। হাতিরা যদি আমাদের পিছন পিছন আসতো, কিংবা এগিয়ে যেতে সামনে, তাহলে কোনো আশঙ্কাই ছিলো না। দু-পাশে কুচকাওয়াজ করে আসছে অনেকে। হয় বেহেমথের ধাক্কায় তারা এখানে চেপ্টে মরবে, নয়তো চিৎপটাং হয়ে গড়িয়ে পড়ে যাবে খাদে।

রাস্তাটা সরু হয়ে আসছে দেখেই হাতির পাল দু-ভাগ হয়ে কেউ চলে গেলো সামনে, কেউ-বা পিছনে। আর তারই ফলে বেহেমথের পক্ষে এগুনো বা পিছোননা অসম্ভব হয়ে উঠলো।

ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে হয়ে উঠলো তো, মানরো মন্তব্য করলেন।

হ্যাঁ, বললে ব্যাঙ্কস, এবার দেখছি সোজা এদের উপর দিয়েই বেহেমথকে চালিয়ে নিতে হবে।

তাহলে তা-ই করো! হুড বলে উঠলো, বেহেমথের লোহার দাঁত ওদের উজবুক গজদন্তের চেয়ে অনেক জোরালো, সন্দেহ নেই। পরিবর্তমান হুডের চোখে বুদ্ধিমান হাতিরা ইতিমধ্যেই গবেট ও উজবুকে পরিণত হয়ে গেছে।

ম্যাক-নীল বললে, কিন্তু বেহেমথ একা, আর ওরা একশো।

এগোও, যা-হয় হবে। ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলে, না-হলে হাতির পাল শেষটায় আমাদের পিষে মারবে।

বেহেমথের শুঁড় থেকে ভলকে-ভলকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এলো, সামনের হাতিটার গায়ে তার চোখা লোহার দাঁত বিধে গেলো মুহূর্তে। হাতিটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো, আর তৎক্ষণাৎ পুরো দলটা থেকে একযোগে একটা চাপা রাগি গর্জন উঠলো। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের হাতে বুলেটভরা রাইফেল, এমনকী রিভলবারগুলোয় পর্যন্ত গুলি ভরা। অন্তত কোনো প্রতিরোধ না-করে বেহেমথ মাথা নোয়বে না!

আক্রমণটা প্রথমে এলো একটা মস্ত পুরুষ হাতির কাছ থেকে; হাতিটা কেবল অতিকায় নয়, দেখতে সাংঘাতিক, ভীষণ; পিছনের পা মাটিতে রেখে সে বেহেমথের মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো।

একটা গণেশ। কালোগনি চেঁচিয়ে উঠলো।

ফুঃ, হুড তাচ্ছিল্য করে কাঁধ ঝাঁকালে, হাতিটার মাত্র একটাই দাঁত! সেইজন্যেই তো সে আরো-ভীষণ, কালোগনি জানালে।

গণেশ বলে এক-সেঁতো পুরুষ হাতিকে—বিশেষ করে তার ডান দিকের দাঁতটা–থাকলে সে আরো ভীষণ হয়ে ওঠে। গণেশরা অসাধারণ ডাকাবুকো-কোনো-কিছু রেয়াৎ করে না, ভয় করে না। গণেশের অকুতোভয় পরাক্রম আমরা তক্ষুনি বুঝতে পারলুম।

বেপরোয়া একটা গর্জন করে উঠলো গণেশ, ক্রুদ্ধ ও স্পর্ধিত; শুঁড়টা শুন্যে তোলা, সেই একটামাত্র দাঁত উঁচিয়েই সে ছুটে এলো।

লোহার পাতের গায়ে এমন ভয়ংকরভাবে তার দাঁতটা লাগলো যে সমস্ত স্টীম হাউস থরথর করে কেঁপে উঠলো;ইস্পাতের চাদরে মোড়া না-থাকলে বেহেমথ নিশ্চয় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেতো; কিন্তু বেহেমথ নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যেতে থাকলো সামনে-আর সেই প্রচণ্ড সংঘাতে গণেশের দাঁতটা দু-টুকরো হয়ে ভেঙে গেলো। কিন্তু তবু সেই বেপরোয়া গণেশ সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে বেহেমথকে–আর তার ডাকে সাড়া দিয়ে পুরো হাতির পালটা সামনে স্থির দাঁড়িয়ে রইলো, অনড় মাংসপিণ্ডের স্কুপের মতো—আর পিছন থেকে অন্য হাতিরা এসে ধাক্কা দিলে বেহেমথকে। উদ্দেশ্য, দুই দলের মধ্যে পড়ে বেহেমথ চূর্ণ হয়ে যাক।

থামলে চলবে না, তাহলে মুহূর্তে তারা বেহেমথকে কাৎ করে ফেলবে; কোনোরকম ইতস্তত না-করে আমাদের উলটো আক্রমণ করতে হবে এবার। রাইফেলগুলো উদ্যত হলো হাতে। হুড তারস্বরে চেঁচিয়ে বলে দিলে, একটা গুলিও বাজে খরচ কোনো না। শুঁড়ের গোড়ায় গুলি কোরো-কিংবা চোখ দুটোর মাঝখানে, কপালে। ওগুলোই হলো আসল জায়গা।

হুডের কথা শেষ হবার আগেই কয়েকটা বন্দুক গর্জে উঠলো, সেই সঙ্গে হস্তীকুলের মধ্য থেকে উঠলো কাতর চীৎকার। তিন-চারটে হাতি মারাত্মক জায়গায় গুলি লেগে পড়ে গেলো পিছনে ও দু-পাশে—আর সেইজন্যেই বাঁচোয়া, সামনে পড়লে তাদের মৃতদেহগুলোই বেহেমথের কাছে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়াতো। আর্তনাদ শুনে সামনের হাতিগুলো একপাশে সরে দাঁড়ালোবেহেমথ এগিয়ে চললো, নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত।

গুলি ভরে নাও বন্দুকে, হুড বললে।

ততক্ষণে হাতিরা আবার সবেগে একযোগে আক্রমণ করেছে বেহেমথকে। আমরা হাল ছেড়ে দিলুম। কারণ হাতিরা যখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তখন কার সাধ্য তাদের রোধ করে, ঠেকায়!

এগোও সামনে, ব্যাঙ্কস নির্দেশ দিলে স্টরকে।

গুলি করে, আবার! হুডের চীৎকার শোনা গেলো।

হাতির ক্রুদ্ধ গর্জন, বেহেমথের তীক্ষ্ণ বাঁশি, আর আমাদের রাইফেলের শব্দ–সব মিলে যেন একটা তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। গোলমালে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করার উপায় নেই। মাংসে গুলি লাগছে, তবে তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। দু-একটা গুলি কেবল কারুকারু দুই চোখের মাঝখানে লাগলো, আর সেই হাতিগুলিই শুধু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। যারা কেবল আহত হলো তারা আরো-রাগিভাবে এগিয়ে গেলো বেহেমথের দিকে—স্টীম-হাউসের দেয়ালশুদু যেন তাদের চাপে ভেঙে যাবে।

বেহেমথের স্টীমের আওয়াজ হচ্ছে ফেস-ফেস-সেও যেন অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো গর্জাচ্ছে—যেন আদিম কোনো আবেগে ছুটে যাচ্ছে সামনে; আর তার লোহার শুঁড় সামনে যাকে পাচ্ছে আঘাত করছে প্রচণ্ড, তার ইস্পাতের দাঁত বিধে যাচ্ছে কারু-কারু গায়ে-থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে সে এগুচ্ছে-আর ইতিমধ্যে দূরে দেখা যাচ্ছে হ্রদের জল।

হঠাৎ, এমন সময়, সামনের বারান্দায় একটা প্রকাণ্ড শুড ল্যাসোর মতো বিদ্যুৎবেগে নেমে এলো—সেই জীবন্ত ল্যাসো মুহূর্তে কর্নেল মানরোকে তুলে নিতে পেঁচিয়ে, কিন্তু মস্ত একটা কুঠার হাতে লাফিয়ে পড়লো কালোগনি, প্রচণ্ড আঘাতে দুখানা করে দিলে সেই শুঁড়টা।

তারপর থেকে লড়াইটা আরো-প্রচণ্ড হয়ে উঠলো—আমরা অবিশ্রাম গুলি চালিয়ে গেলুম, আর কালোগনি সারাক্ষণ কর্নেল মানরোকে আড়াল করে রাখলে সব বিপদ থেকে, চোখে-চোখে রাখলে সবসময়।

বেহেমথের ক্ষমতার এটাই অগ্নিপরীক্ষা। যেন কোনো প্রচণ্ড গজালের মতো সে ভেদ করে যাচ্ছে এই মাংসস্তূপ।

হঠাৎ, এমন সময়, পিছনে স্টীম হাউসের দ্বিতীয় বাড়ি থেকে প্রচণ্ড শোরগোল উঠলো। একপাল হাতি দ্বিতীয় বাড়িটাকে পাথরের গায়ে উলটে পিষে ফেলার চেষ্টা করছে।

ব্যাস চেঁচিয়ে সবাইকে দ্বিতীয় বাড়িটা থেকে চলে আসতে বললো। ফক্স, গৌমি আর ম্যাক-নীল ততক্ষণে চলে এসেছে সামনের বারান্দায়।

পারাজার কোথায়? হুড জিগেস করলে।

সে তার রান্নাঘর ছেড়ে কিছুতেই বেরুবে না, ফক্স বললে।

আসতেই হবে তাকে—পাঁজাকোলা করে ওকে নিয়ে এসো।

মঁসিয় পারাজার কিছুতেই তার রসুইখানা ছেড়ে বেরুবে না, কিন্তু তখন তর্কাতর্কি করার সময় নেই, গৌমি তাকে জোর করে কাঁধে তুলে নিয়ে এলো।

সবাই এসেছো? ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

হ্যাঁ, সাহেব, গৌমি জানান দিলে।

জোড়া খুলে দাও।

তার মানে? স্টীম হাউসের আধখানা ফেলে যাবো আমরা?

তাছাড়া আর উপায় নেই। বিপদের সময় পণ্ডিতেরা আদ্ধেক ছেড়ে যান! ব্যাঙ্কস জানালে।

সংযোগ-শিকল ছিন্ন করে তক্ষুনি দ্বিতীয় বাড়িটাকে আলাদা করে দেয়া হলো। আর পর মুহূর্তেই ক্রুদ্ধ খ্যাপা হাতিদের পায়ের তলায় গোটা বাড়িটা লণ্ডভণ্ড শতখণ্ড হয়ে গেলো। দ্বিতীয় বাড়িটার বদলে হাতিরা যদি সামনের বাড়িটা আক্রমণ করতো...আমি আর ভাবতে পারলাম না।

লেক পুটুরিয়া আর মাত্র কয়েক গজ দূরে তখন।

স্টর পূর্ণবেগে চালিয়ে দিলে বেহেমথকে—বেহেমথের শুঁড় দিয়ে তখন গরম বাষ্প বেরুচ্ছে সামনে, ছ্যাকা দিচ্ছে সামনের হাতিদের-যেমন দিয়েছিলো একবার ফরুনদীর তীর্থযাত্রীদের।

একবার হ্রদে পৌঁছুতে পারলেই আমরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হবো। হাতিরাও বোধকরি সেটা বুঝতে পেরেছিলো-ক্যাপ্টেন হুড যে তাদের বুদ্ধির কথা বলছিলো, এটাই তার প্রমাণ। তারা একটা মরীয়া শেষ চেষ্টা করলে বেহেমথকে বাধা দিতে।

বারেবারে গর্জন করে উঠছে আমাদের বন্দুক। বেহেমথের শুঁড় দিয়ে বেরিয়ে আসছে গরম বাষ্প, যেন রাগে ফেঁশ-ফেঁোশ করছে এই অতিকায় লৌহদানব। এত জোরে ছুটছে যে হঠাৎ যে-কোনো সময় স্টীম হাউস উলটে যেতে পারে-সামনে তখনও কয়েকটা হাতি শুঁড় তুলে একটা শেষ চেষ্টা করলে, কিন্তু এক ঝটকায় তাদের সরিয়ে দিয়ে দুর্ধর্ষ

বেহেমথ জলে নেমে পড়লো–এবং জলে নেমেই শান্ত জলে ভেসে চললো, জাহাজের মতো।

দু-তিনটে হাতিও জলে নেমে পড়েছিলো, কিন্তু ধাবমান বেহেমথ থেকে কয়েকটা গুলি ছুটে আসতেই তারা আবার চটপট উঠে পড়লো ডাঙায়।

কী, ক্যাপ্টেন? ব্যাঙ্কস জিগেস করলে ঠাণ্ডা গলায়, ভারতীয় হস্তিকুলের ভদ্র ও সুমধুর স্নিগ্ধ সম্ভাষণ কেমন লাগলো।

ধেৎ! হুড বলে উঠলো, এরা আবার বন্য জন্তু নাকি। এই একশোটা উজবুকের জায়গায় যদি তিরিশটা বাঘ হতো, তাহলে কী হতো একবার ভাবো দেখি-এই অদ্ভুত গল্পটা শোনাবার জন্যে আমাদের একজনও যে আর বেঁচে থাকতো না, এটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি!

লেক পুটুরিয়া

বেহেমথ যখন লেক-পুটুরিয়ার মাঝখানে ভাসছে, তখন এক-এক করে আমরা খতিয়ে দেখছি ক্ষতির পরিমাণ। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিলো মঁসিয় পারাজারের জন্যে; রান্নাঘরটা হারিয়ে বেচারি ভারি মনমরা হয়ে গেছে। এদিকে আমাদেরও এতক্ষণে ক্ষুধার উদ্রেক হচ্ছে, সকালবেলায় সেই কখন তাড়াহুড়ো করে ছোটোহাজরি সেরেছিলুম—তারপরে মার-কিছু খাওয়া হয়নি। এখন যতক্ষণ-না জব্বলপুর পৌঁছুনো যাচ্ছে, খাওয়া-দাওয়ার কোনো উপায় নেই। ওদিকে বেহেমথের জ্বালানিও শেষ হয়ে গিয়েছে, স্টীম কমে আসছে, কমে এসেছে গতিবেগ; তার উপর সন্ধে হতে-না হতেই সব কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেলো। সকলেরই মুখ খুব গম্ভীর-এ অবস্থায় কী-যে করণীয়, কিছুই স্থির করে ওঠা যাচ্ছে না। স্রোত আর হাওয়া যতক্ষণ-না আমাদের তীরে পৌঁছে দিচ্ছে, ততক্ষণ এই হ্রদের মাঝখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে-থাকা ছাড়া আর-কিছু করার নেই।

শোনো, কালোগনি, হ্রদটা কত বড়ো, তোমার জানা আছে?

আছে সাহেব, কিন্তু এই কুয়াশায় ঠিক বোঝা কঠিন—

আন্দাজ করেও বলতে পারবে না আমরা তীর থেকে কত দূরে আছি?

একটু ভেবে কালোগনি বললে, দেড় মাইলের বেশি হবে না।

পুব তীর থেকে?

হ্যাঁ। অথাৎ ওই তীরে গিয়ে পৌঁছুলে আমরা জব্বলপুরের রাস্তায় গিয়ে পড়বো?

হ্যাঁ।

তাহলে জব্বলপুরেই আমাদের সব রশদপত্তর জোগাড় করতে হবে। বললে ব্যাঙ্কস, কিন্তু তীরে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে? জ্বালানি নেই বলে হাওয়ার উপর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে আমাদের। কয়েক ঘণ্টাও লাগতে পারে, আবার পুরো দু-দিনও কেটে যেতে পারে। অথচ খাবারদাবারও কিছু নেই!

কিন্তু, কালোগনি বললে, আমাদের মধ্যে কেউ-একজন আজ রাতেই ডাঙায় পৌঁছুবার চেষ্টা করলে হয় না?

কেমন করে পৌঁছুবে—উপায় কই?

কেন? সাঁৎরে।

এই কুয়াশায় দেড় মাইল সাঁৎরে যাবে? এ-তো মরতে যাওয়া—

বিপদ আছে বলেই কোনো চেষ্টা করবো না, তা কী হয়? কালোগনি বললে।

তুমি যেতে চাও সাঁৎরে? কর্নেল মানরো জিগেস করলেন।

হ্যাঁ, কর্নেল। আমি এই কুয়াশাতেও তীরে পৌঁছুতে পারবো?

একবার তীরে পৌঁছুতে পারলে, ব্যাঙ্কস বললে, অবশ্য কোনো ভয় নেই। জব্বলপুর থেকে তাহলে চটপট সাহায্য নিয়ে আসতে পারবে।

আমি এক্ষুনি রওনা হয়ে পড়তে রাজি আছি, কালোগনি বললে।

ভেবেছিলুম এ-কাজে রাজি হবার জন্যে কালোগনিকে ধন্যবাদ জানাবেন কর্নেল মানরো। কিন্তু তার মুখের দিকে স্থির চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মানরো শেষে হাঁক পাড়লেন, গৌমি।...তুমি ভালো সাঁতার কাটতে পারে?

হ্যাঁ, সাহেব। গৌমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

এ-রকম কুয়াশার মধ্যে মাইল দেড়েক সৎরে যেতে পারবে তুমি?

তা পারবো।

বেশ। কালোগনি বলছে সে সৎরে তীরে চলে যাবে-তীর থেকে জব্বলপুর বেশি দূরে নয়। এখন বুন্দেলখণ্ডের এদিকটায়-কি জলে, কি ডাঙায়–একজনের চেয়ে দুজন বুদ্ধিমান ও সাহসী লোকের সফল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি! তুমি কালোগনির সঙ্গে যাবে?

নিশ্চয়ই সাহেব! গৌমি বললে।

আর-কারু অবিশ্যি দরকার ছিলো না, বললে কালোগনি, তবে কর্নেল মানরো যখন বলছেন, তাহলে গৌমিও না-হয় সঙ্গে চলুক।

তাহলে আর দেরি কোরো না, ব্যাঙ্কস বললে, আর সাবধানে যেয়ো-সাহসের চেয়েও সতর্কতা অনেক সময় বেশি কাজে লাগে।

কর্নেল মানরো গৌমিকে একপাশে ডেকে নিয়ে সংক্ষেপে দু-এক কথায় কী-সব নির্দেশ দিলেন। পাঁচ মিনিট পরেই গৌমি আর কালোগনিংমাথায় দুটি কাপড়ের পুটুলি বেঁধে নিয়ে জলে নেমে পড়লো। একটু পরেই ঘন কুয়াশায় তারা মিলিয়ে গেলো–তাদের আর দেখা গেলো না।

কালোগনিকে একা পাঠাতে কর্নেল মানরো কেন রাজি হচ্ছিলেন না, তা আমার দুর্বোধ্য ঠেকছিলো। আমার ধন্ধের কথাটা জিগেস করতেই মানরো বললেন, মঁসিয় মোক্লের, কালোগনিকে কখনও অবিশ্বাস করার কোনো কারণ আমি পাইনি-তবু এখন তার কথাবার্তার সুর আমার কেন যেন ভালো ঠেকছিলো না।

মানে? ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

এভাবে সাঁৎরে যাবার পিছনে ওর নিশ্চয় আয়ো-কোনো মৎলব আছে। আমার মনে হয় না ও জব্বলপুরে সাহায্য আনতে যেতো।

কিন্তু, কর্নেল, কালোগনি আমাদের অনেকবার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে বিশেষ করে আপনাকে তো সবচেয়ে বেশি! অথচ আপনিই এখন ওকে অবিশ্বাস করছেন। কেন, বলুন তো? আর তাছাড়া আমাদের হঠাৎ বিপদে ফেলে ওর কী-ই বা লাভ হবে?

তা জানি না। হয়তো সব যখন বুঝতে পারবো, তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না। তবে গৌমিকে আমি বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছি-বলেছি কালোগনিকে যেন সবসময় চোখে-চোখে রাখে। কর্নেল মানবরা এর চেয়ে বেশি আর কিছুই ভেঙে বলতে রাজি হলেন না।

রাতটা কেটে গেলো স্তব্ধ, কুয়াশাঢাকা, প্রলম্বিত। পাঁচটার সময় পর্যন্ত কুয়াশা সরলো না, আলো ফুটলো না একফোঁটা। অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর-কিছু করার নেই। কর্নেল মানরো, ম্যাক-নীল আর আমি বসে আছি সামনে, ফক্স আর মঁসিয় পারাজার পিছনে, ব্যাঙ্কস আর স্টর হাওদায়, আর ক্যাপ্টেন হুড বেহেমথের কাঁধে, শুঁড়ের কাছে—যেন মাস্তুলে টঙের উপর বসে আছে কোনো নাবিক।

বেলা দুটো নাগাদ হাওয়া উঠলো। সূর্যের প্রথম রশ্মি ফুটলো কুয়াশা ছিড়ে, আস্তে আস্তে কুয়াশা সরে গেলো, দিগন্ত পর্দা তুলে দিলে।

ডাঙা! ঠিক নাবিকদের মতোই চেঁচিয়ে বললে ক্যাপ্টেন হুড।

দক্ষিণ-পুব দিকে ডাঙা পড়ে আছে, গাছপালা ঢাকা! আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে মেঘের কোলে পাহাড়।

হাওয়া আস্তে-আস্তে আমাদের তীরে পৌঁছে দিয়ে গেলো।

ফাঁকা তীর-শুধু কতগুলো গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই। বেহেমথ তীরে এসে ঠেকলো। কিন্তু স্টীম ছাড়া তাকে ডাঙায় তোলা মুশকিল।

আমরা সবাই ডাঙায় নেমে পড়লুম। ব্যাঙ্কস তাড়াতাড়ি জ্বালানির জোগাড়ে শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। যাতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জব্বলপুর রওনা হওয়া যায়, সেদিকে নজর রেখেই সে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সবাই মিলে হাত লাগিয়ে কাঠকুটো ডালপালা জড়ো করছি, যাতে এক-ফোঁটা সময় নষ্ট না-হয়। কেবল কালু বসে বসে চুল্লিতে কাঠ গুঁজে দিচ্ছে আর গরম করে নিচ্ছে এঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্টীম বেশ চাপ দিতে লাগলো। তাহলে এবার জব্বলপুর রওনা হওয়া যাক, বললে ব্যাঙ্কস।

কিন্তু স্টর রেগুলেটরে হাত দেবার আগেই গাছপালার আড়াল থেকে আচমকা একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠলো। পরক্ষণেই প্রায় দেড়শোজন ভারতীয় বনের মধ্যে থেকে ছুটে এলো স্টীম হাউসের দিকে-মুহূর্তের মধ্যে আক্রান্ত হলো হাওদা ও গাড়ি-কিছু বুঝে ওঠবার আগেই আমাদের কয়েদ করে তারা স্টীম হাউস থেকে নামিয়ে নিলে। মুক্তির চেষ্টা করা বৃথা, কারণ শক্ত করে তারা ধরে রেখেছে আমাদের, চোখে মুখে দয়া বা মমতার লেশমাত্র নেই।

তাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ মুহূর্তের মধ্যে গোটা স্টীম হাউসটাই লণ্ডভণ্ড করে দিলে — আশবাবপত্তর কিছুই রইলো না আস্ত, মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো আমাদের স্টীম হাউসে!

বেহেমথকেও তারা ধ্বংস করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু আগুন বা কুঠার কিছুই বেহেমথের গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারলে না। ক্যাপ্টেন হুড রাগে চাচাতে লাগলো। কি কেউ তার দিকে দৃকপাতও করলে না।

স্টীম হাউস পুড়ে ছাই হয়ে গেলে পর ভিড়ের মধ্য থেকে দৃপ্ত পদক্ষেপে একজন এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। নিশ্চয়ই দলের সর্দার। অন্য লোকেরা তৎক্ষণাৎ তার পাশে মাথা নত করে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলো। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে আরেকটা লোক এগিয়ে গেল সর্দারের দিকে। এবং তক্ষুনি সব রহস্যের অবসান হয়ে গেলো। দ্বিতীয় লোকটি আর-কেউ নয়—কালোগনি।

আশপাশে গৌমির কোনো চিহ্ন নেই।

কালোগনি সোজা এগিয়ে গেলো মানরোর দিকে, আঙুল তুলে দেখালো সে কর্নেলকে, এই-যে সেই! সে বললে।

তক্ষুনি কোনো কথা না-বলে মানরোকে তারা টেনে নিয়ে গেলো—কোনো কথা বলবারও অবসর দেয়নি। হুড, ব্যাঙ্কস ও আমরা বাকি সবাই খামকাই নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু তারা আমাদের ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলে।

মানরোকে নিয়ে দলটা দক্ষিণ দিকে বনের আড়ালে চলে গেছে। মিনিট পনেরো পরে রক্ষীরাও আমাদের ফেলে রেখে ছুটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

অনুসরণ করে কোনো লাভ নেই, জানি। কারণ তাতে সার এডওয়ার্ডকেই অযথা আরো বিপন্ন করা হবে। বুঝতে বাকি ছিলো না যে কালোগনির আক্রমণের লক্ষ্য কেবল সার এডওয়ার্ডই।

কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই তার নিজের কোনো স্বার্থ তাতে সিদ্ধ হবে না। তবে কার আদেশ সে পালন করছে? নানাসাহেব নামটা যেন কোনো একটা অতিকায় অলুক্ষুণে শক্তির মতো আমার মনের মধ্যে ভিড় করে এলো।

+

মঁসিয় মোক্লের-এর পাণ্ডুলিপি এখানে এসেই শেষ হয়েছে। ভারত ভ্রমণে আসা এই ফরাশি যুবাপুরুষ এর পরেকার ঘটনাগুলো আর স্বচক্ষে দ্যাখেননি—কীভাবে এই গ্রন্থিল কাহিনীর সবগুলো জট এরপর হুড়মুড় করে খুলে গিয়েছিলো, তিনি অবশ্য তার প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলেন না। কিন্তু পরে যখন সব জানা গেলো, তখন তাদের গল্পের মতো করে একজায়গায় করে দেয়া হলো, যাতে মঁসিয় মোক্লের-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত একটা মোটামুটি সম্পূর্ণ চেহারা নিতে পারে।

মুখোমুখি

বন্দীকে নিয়ে চলেছে কালোগনি। সদলবলে। এতকাল সে তাকে নিজের জীবন পদেপদে বিপন্ন করেও বাঁচিয়েছে নানা বিপদ থেকে, সাপ-বাঘ-হাতির পাল সব-কিছুর হাত থেকে নিজের জীবন বারেবারে বিপন্ন করে কর্নেল মানরোকে সে বাঁচিয়েছিলো কেবল এই মুহূর্তটির জন্যেই; নানাসাহেবের পরম শত্রুকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে প্রভুর কাছে তুলে-দেয়া—এতদিন এই ছিলো তার ধ্যান, জ্ঞান আর স্বপ্ন। সেইজন্যেই তরাইয়ের সেই গভীর জঙ্গলে ওলন্দাজ প্রাণিতাত্ত্বিক মাতিয়াস ফান খোইতের কাছে সে চাকরি নিয়েছিলো; এইজন্যেই নানাভাবে সে উপার্জন করছিলো আস্ত স্টীম-হাউসের বিশ্বাস–সেই-যে মহরমের দিন ভোপালে নানাসাহেব তার কাঁধে দায়িত্ব তুলে দিলেন, তারপর থেকে কায়মনোবাক্যে সে কেবল এই পরিকল্পনাই চরিতার্থ করবার জন্যেই নিজের জীবনটাকে নিয়ে বারেবারে ছিনিমিনি খেলেছে। কেউ বুঝতে পারেনি তার উদ্দেশ্য কী, স্বপ্ন কী, সাধ কী—নিজের সব অনুভূতিকে সে এতদিন চাপা দিয়ে রেখে এসেছে।

কেবল যখন লেক পুটুরিয়া সারে পেরুবার সময় গৌমি তার সঙ্গে এলো, তখন মুহূর্তের জন্যে তার চোখটা ধ্বক করে জ্বলে উঠেছিলো। অনেক কষ্টে সে তখন নিজেকে সংবরণ করে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তীরে পৌঁছে নানাসাহেবের আরেকজন অনুচর নাসিম ও তার দলের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তার একটুও দেরি হয়নি, কারণ এ-সব জায়গার পথঘাট সব তার নখদর্পণে। কেবল যখন অন্ধকারে নাসিমের সঙ্গে সে কথা বলছিলো তখন গৌমি সব বুঝতে পেরে বিদ্যুৎবেগে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছে—এইটুকুই যা খুঁত থেকে গেলো কাজটায়। কোথায় যে সে কেটে পড়লো, তা

আর বোঝাই গেলো না। কিন্তু যাক—সে একা এতজনের হাত থেকে নিশ্চয়ই মানরোকে উদ্ধার করে নিতে পারবে না। তাছাড়া অহেতুক রক্তপাতে কালোগনির বিষম বিরাগ—সেইজন্যেই হুড, ব্যাঙ্কস বা মোক্লেরদেরও সে কিছুক্ষণ আটকে রেখে পরে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলো। যে জটিল গোপন রাস্তা দিয়ে তারা এখন নানাসাহেবের আস্তানায় চলেছে, সাধ্য কি এরা, এই বিদেশীরা, তা খুঁজে বার করে?

কেবল একবার সে ধরা পড়ে যাচ্ছিলো স্টীম হাউসে থাকার সময়–যখন ব্যাঙ্কস তাকে নানাসাহেবের মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলো। আরেকটু হলেই গুজবটায় সে বিশ্বাস করে বসতো। কিন্তু কে জানে, আসল ব্যাপারটা কী হয়েছিলো। গোরা সেপাইদের

তো ভুল হতেই পারে। হামেশাই হয়ে এসেছে এতকাল।

আপন মনে এ-সব ভাবতে-ভাবতে একটু মুচকি হাসলে কালোগনি।

রাত হয়ে এসেছে। রায়পুরের কেল্লা দেখা যাচ্ছে, দূরে। নাসিম বলেছে নানাসাহেব এখন সেখানে আছেন। পঁচিশ মাইল রাস্তা একটানা হন্তদন্ত এসেছে তারা, ঘিরে রেখেছে মানরোকে, একবারও তার উপর থেকে নজর সরায়নি।

কেল্লার কাছে যেতেই কে-একজন এগিয়ে এলো আস্তে, দর্পিত পদক্ষেপে।

কে? কালোগনি তার সামনে গিয়ে নুয়ে অভিবাদন করলে, সসম্ভ্রমে চুম্বন করলে তার বাড়িয়ে-দেয়া হাত–লোকটি আস্তে কালোগনির পিঠ চাপড়ে এগিয়ে এলো বন্দীর দিকে। চোখ দুটো তার বাঘের চোখের মতো জ্বলছে, সর্বাঙ্গ কী-একটা চাপা রাগে টান-টান।

লোকটি কাছে আসতেই মানরো চিনতে পারলেন।ওঃ! বালাজি রাও! মানরোর গলায় প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটে উঠলো।

ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো, চাপা স্বরে লোকটি আদেশ করলে।

নানাসাহেব? মানরো চিনতে পেরে এক-পা পেছিয়ে গেলেন।নানাসাহেব বেঁচে আছে?

সন্দেহ কী! আগুনের শিখার মতো তেজিয়ান মানুষটিকে দেখে চিনতে ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু সাতপুরা পর্বতে তাহলে কে মরেছিলো?

মরেছিলেন ধুন্ধুপন্থের ভাই, বালাজি রাও।

দুই ভাইকেই দেখতে এতই-একরকম যে বাইরের লোকের ভুল-হওয়া বিচিত্র ছিলো। দুজনেরই মুখে ছিলো বসন্তের দাগ, একই হাতের একই আঙুল হারিয়ে ছিলেন দুজনে, একই কঠোর প্রতিজ্ঞায় দুজনেরই চিবুক ছিলো তীক্ষ্ণ ও সুদৃঢ়; আর তাতেই লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের গোরা সেপাই ভুল করে বসেছিলো।

আর এই ভুলেরই সুযোগ নিয়েছিলেন নানাসাহেব। মৃত্যুর সংবাদ সরকারিভাবে সমর্থিত হয়েছিলো বলে নিরাপত্তা হয়েছিলো অটুট, কারণ এটা তিনি জানতেন যে সরকার নানাসাহেবের মতো তন্নতন্ন করে তার ভাই বালাজি রাওকে খুঁজবে না—কারণ বালাজি রাও কখনোই বিদ্রোহীদের প্রকাশ্য নেতৃত্বে অবতীর্ণ হননি। সেইজন্যেই নানাসাহেব এই মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দিতে কোনো বাধা দেননি—বিদ্রোহের আগুন নতুন করে

জ্বালাবার আগে তার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করার এটাই সুবর্ণ-সুযোগ বলে ভেবেছিলেন তিনি। আর দৈবও ছিলো তার সহায়। কর্নেল মানবোও এই সময় কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন বম্বাই আসবেন বলে-পথে কোনোরকমে একবার যদি তাকে বুন্দেলখণ্ডে বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্যদেশে নিয়ে আসা যায়, তাহলে তিনি দেখে নেবেন তার চিরশত্রুকে। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কালোগনির হাতে সব ভার তুলে দিয়ে সেইজন্যেই নিশ্চিন্তে কেবল এই মুহূর্তটিরই প্রতীক্ষ করছিলেন নানাসাহেব।

অবশেষে এতদিনে সব প্রতীক্ষর অবসান হলো। এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল মানরো-বন্দী, নিরস্ত্র, নিঃসহায়, একাকী। জ্বলজ্বলে ক্ষুধিত চোখে নানাসাহেব তাকিয়ে রইলেন। মানরোও মুখ ফিরিয়ে নিলেন না। দশ বছর আগে যখন দেশজোড়া আগুন জ্বলেছিলো তখন এঁরা একবার পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এখন, রাতের অন্ধকারে, রায়পুরের কেল্লার পাশে, বিদ্রোহী ভারতীয়দের মধ্যে, আবার এঁরা দাঁড়িয়েছেন পরস্পরের মুখোমুখি।

অবশেষে নানাসাহেবের গম্ভীর গলা স্তব্ধতা ভেঙে গমগম করে উঠলো।মানরো, তোমার মনে আছে–তোমারই আদেশে পেশওয়ারে একশো কুড়ি জন বন্দীকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো? তারপর থেকে এতদিনে আরো অন্তত বারোশো সেপাই ওইভাবে মারা গিয়েছে। লাহোরে তোমরা পলাতক মানুষদের নির্বিচারে বধ করেছে, আবালবৃদ্ধবনিতা কাউকে বাদ দাওনি, দিল্লি দখল করে বাদশাভবনের মানুষদের তোমরা এককোঁটা দয়া দেখাওনি; লক্ষ্ণৌতে মারা গেছে ছশোরও বেশি ভারতীয়; পঞ্জাবে তিন হাজারেরও বেশি ভারতীয়কে তোমরা কোনো বাছবিচার না-করে নৃশংসভাবে হত্যা

করেছো। কেন? না, আমার দেশবাসী আজাদি চেয়েছিলো, স্বাধীনতা চেয়েছিলোআর স্বাধীনতার বদলে তোমরা তাদের রক্ত ঝরিয়েছে অবিশ্রাম...

মৃত্যু! মৃত্যু চাই, নানাসাহেবের অনুচরেরা গর্জন করে উঠলো।

নানাসাহেব হাত নেড়ে তাদের চুপ করতে নির্দেশ দিলেন। মানরো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন নিরুত্তর।

মানরো, মনে আছে ঝান্সির রানী তোমার হাতেই মরেছিলেন?

মানবরা তবু চুপ করে রইলেন।

চার মাস আগে, চাপা দীপ্ত স্বরে নানাসাহেব বললেন, আমি বলে ভুল করে আমার ভাইকে তোমরা মেরেছে

মৃত্যু চাই! মৃত্যু! ক্রুদ্ধ কোলাহল উঠলো।

মানরো, আবার নানাসাহেবের গলা গমগম করে উঠলো অন্ধকারে, তোমারই পূর্বপুরুষ জনৈক হেকটর মানরোর শাস্তি দেবার বর্বর পদ্ধতি ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, এ-কথা জানো? জ্যান্ত মানুষদের কামানের গোলায় বেঁধে উড়িয়ে দেবার নৃশংস পথটা সে-ই প্রথম দেখায়—

এই কথায় আবার চাপা রাগে, অন্ধকারে, কালো মানুষগুলো গর্জন করে উঠলো। আবার তাদের শান্ত করে সেই গম্ভীর মরাঠা গলা শোনা গেলো, এইসব ভারতীয় যেভাবে

মৃত্যুবরণ করেছে, তোমাকেও ঠিক সেইভাবে মরতে হবে মানরো–তোমারই পূর্বপুরুষের দেখানো উপায়ে। দেখেছো এই কামান? আঙুল তুলে নানাসাহেব কেল্লার পাশের মস্ত কামানটি দেখালেন।গোলা ভরা আছে এই কামানে। এর মুখে তোমায় বেঁধে দেয়া হবে, তারপর কাল যখন সূর্য উঠবে তখন কামানের গর্জন শুনে বিন্ধ্যপর্বতের দিক-দিগন্তে এই বার্তা ছড়িয়ে যাবে যে অবশেষে মানরোর উপর নানাসাহেবের প্রতিশোধ নেয়া হলো।

এই কথা বলে গম্ভীর পায়ে নানাসাহেব কেল্লায় গিয়ে ঢুকলেন। মানরোকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো কামানের পাশে। সেইখানেই তাঁর দড়িবাঁধা দেহটা ফেলে রেখে অন্যরাও চলে গেলো কেল্লায়।

স্যার এডওয়ার্ড একা পড়ে রইলেন তাঁর মৃত্যু ও তাঁর ভগবানের মুখোমুখি। এবং সম্ভবত হেকটর মানরোর বর্বর প্রথারও।

কামানের মুখে

স্তব্ধ কালো রাত; আর তারই মধ্যে সেই ভীষণ কামানটা একটা প্রকাণ্ড কালো দৈত্যের মতো মানরোর দিকে যেন তর্জনী নির্দেশ করে রয়েছে। মানরো পড়ে আছেন কামানের নলটার ঠিক সামনে, আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা। কাছেই একটি ভারতীয় দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুক হাতে পাহারায়। কেবল মাঝে-মাঝে রাতের স্তব্ধতাকে আরো-প্রকট করে কেল্লার ভিতর থেকে তুমুল হৈ-হল্লার আওয়াজ আসছে-বোধহয় মানরোকে হাতে পেয়ে এই ক্ষুব্ধ মানুষগুলো এখন সোল্লাসে পানভোজনে মত্ত।

কেল্লার পাশেই একটা গভীর খাত। পাহারাওলাটি একবার খাতের কাছে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অন্ধকারে কী যেন তাকিয়ে দেখলো, তারপর আবার এসে দাঁড়ালে কামানের কাছে। হাই তুললো সে একবার-বোঝা গেলো ঘুমে তার চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে। তারপর আস্তে-আস্তে একসময় বন্দুকটা ধরে কামানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে ঢুলতে লাগলো।

ছমছমে রাতটা আরো-কালো ও ঘুটঘুট্টে হয়ে এলো যেন। ভারি মেঘ ঝুলে আছে নিশ্চল। আবহাওয়ায় কেমন যেন একটা চাপা অস্বস্তির ভাব।

মানরো পড়ে-পড়ে সাত-পাঁচ ভাবছেন। কানপুরে যখন আগুন লাগলো, তখন সেই রক্তারক্তির মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন তার স্ত্রী-কেউ আর তার খোঁজ পায়নি —

সবাই একরকম ধরেই নিয়েছে যে তিনি মারা গেছেন। আজ দশ বছর সারাক্ষণ ১৮৫৭-র সেই জ্বলন্ত দিনগুলি তাকে অবিশ্রাম যন্ত্রণা দিয়েছে-কাল ভোরে সবকিছুর অবসান!

একটা শেষ চেষ্টা করলেন মানরো বাঁধন খোলার—কিন্তু চেষ্টার ফলে দড়িগুলো যেন গায়ে আরো কেটে-কেটে বসে গেলো। অসহায় ও অক্ষম ক্ষোভে চাপা গর্জন করে উঠলেন মানরো। আর সেই পাহারাওলাটি ধড়মড় করে জেগে উঠলো। একবার কাছে এসে সে দেখে গেলো বন্দীকে, জড়ানো গলায় বললে : কাল ভোরবেলায় বুঝলেগুড়ুম গুম! ফর্দাফাই চিচিংকার!

বলে আবার সে ফিরে গিয়ে ফের কামানের গায়ে হেলান দিয়ে ঢুলতে লাগলো, আর মানরোর জাগ্রত চোখের উপর ছবির মতো ভেসে গেলো সিপাহী বিদ্রোহের অসংখ্য দৃশ্য। নৃশংসতার, বর্বরতার রক্তাক্ত সব ছবি। নিচু মেঘগুলো তাকিয়ে আছে তার দিকে কালো আকাশ থেকে। রাত কত হবে কে জানে।

হঠাৎ চটকা ভেঙে গেলো তার, দূরে তাকিয়ে দেখলেন মশালের ক্ষীণ আলো। কে যেন এগিয়ে আসছে এই দিকে, আস্তে, পা টিপে টিপে, চুপি-চুপি, সন্তর্পণে; সেপাইদের ব্যারাক পেরিয়ে, কেল্লার পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে এই কামানেরই দিকে।

কে আসছে? গৌমি? ব্যাঙ্কস, হড, ও মোক্লের? না কি অন্য কেউ নানাসাহেবেরই কোনো অনুচর? আশা আছে তার উদ্ধারের, না কি অবশেষে এখানেই কামানের মুখে উড়ে যাবে তাঁর ছিন্ন দেহ? যেমনভাবে নেটিভদের উড়িয়ে দিয়ে মজা পেতেন হেকটর মানরো।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে মশাল হাতে।কে, বোঝা যাচ্ছে না—শুধু দেখা যাচ্ছে। ঢিলে কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা তার-হাতে মশাল, জ্বলন্ত, দাউদাউ।

মানরো নড়তে পারছিলেন না; এমনকী নিশ্বেস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে-যদি ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যায় অন্ধকারে-মশাল নিভে যায় দপ করে আলেয়ার মতো! পড়ে রইলেন ভারি কোনো ধাতুর মূর্তির মতো, রুদ্ধশ্বাস ও নিস্পন্দ! পাহারাওলাটা যদি জেগে যায়, সাবধান, চেঁচিয়ে বলে দিতে চাইলেন তিনি সেই ছায়ামূর্তিকে, হুঁশিয়ার! আর সেই ছায়ামূর্তি যেন ভেসে আসতে লাগলো হাওয়ায়—আস্তে, চুপি-চুপি, নিঃশব্দে, এই কামানের দিকে।

যদি সে ওই পাহারাওলার গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়! মানরেরার বুক ধ্বক করে লাফিয়ে উঠলো ...না, তার সম্ভাবনা নেই। কারণ লোকটা কামানের বাঁ-পাশে হেলান দিয়ে ঢুলছে আর সেই অদ্ভুত ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে ডানদিক দিয়ে—মাঝেমাঝে থেমে পড়ছে, মশালের আলোয় দেখছে চারপাশ, কিন্তু তারপরেই আবার এগিয়ে আসছে, ধীরে-ধীরে।

শেষকালে সে মানরোর এতই কাছে এসে পড়লো যে তিনি তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। দেখলেন এক মাঝারি উচ্চতার মানুষ, আপাদমস্তক একটা ঢোলা কাপড়ে মোড়া। একটাই হাত দেখা যাচ্ছে তার, সেই হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল।

পাগল? মানরো হঠাৎ যেন প্রচণ্ড এক হতাশায় ভরে গেলেন।পাগলটা কেল্লার আশপাশে বারেবারে ঘুরে বেড়ায় বলেই তারা আর এর দিকে কোনো নজর দেয়নি। ঈশ,

পাগলটার হাতে যদি মশালের বদলে কোনো ছোরা থাকতো তাহলে হয়তো আমি কোনোরকমে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এই দড়িগুলো কেটে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারতুম।

ছায়ামূর্তি মোটেই পাগল নয়, তবে মানরো অনেকটা ঠিকই ধরেছেন।

এ হলো নর্মদাতীরের সেই উন্মাদিনী, সেই অর্ধচেতন প্রাণী—গত চার মাস ধরে বিন্ধ্যপর্বতে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এলোমেলো, আর সে স্বাভাবিক নয় বলেই গোরা তাকে মাঝে-মাঝে খেতে দিয়েছে, সসম্ভ্রমে তার পথ ছেড়ে দিয়েছে সর্বত্র। নানাসাহেব কিংবা তার অনুচরেরা মোটেই জানেন না কেমন করে বহ্নিশিখা সাতপুরা পাহাড়ে নিজের অজ্ঞাতসারে গোরা সেপাইদের পথ দেখিয়ে এনেছিলো। জানতেন না বলেই বহ্নিশিখার উপস্থিতি কোনোদিনই তাদের মধ্যে কোনো আশঙ্কা বা সন্দেহের উদ্রেক করেনি। কতবার সে আপনমনে ঘুরতে-ঘুরতে রায়পুরের কেল্লায় এসে পড়েছে-কিন্তু কেউ তাকে কস্মিনকালেও তাড়িয়ে দেবার কথা ভাবেনি। সম্ভবত দৈবই আজ তার এই উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যহীন লক্ষ্যহীন নৈশভ্রমণকে এখানে এনে শেষ করে দিলো।

মানরো এই উম্মাদিনীর কথা কিছুই জানতেন না। বহ্নিশিখার নাম তিনি কোনো দিনই শোনেননি। অথচ তবু যেই সে মশাল হাতে এদিকে এগিয়ে এলো তার হৃৎপিণ্ড যেন কেমন অস্বস্তিভরে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগলো।

অতি ধীরে, একটু-একটু করে, সেই উম্মাদিনী এগিয়ে এলো কামানের কাছে। তার মশাল নিভু নিভু; ক্ষীণ শিখা থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে, বন্দীর মুখোমুখি

পড়েও সে যেন তাকে দেখতে পাচ্ছে না, যেন তার চোখ দুটো তাকিয়ে আছে কোনো অদৃশ্য-কিছুর দিকে, পার্থিব কোনোকিছুই আর তার চোখে পড়বে না যেন কোনোদিনও।

সার এডওয়ার্ড পড়ে রইলেন স্তব্ধ ও অনড়। এই উম্মাদিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাই তিনি করলেন না। অবশেষে সে ফিরে দাঁড়ালে, তাকিয়ে দেখলে সেই প্রকাণ্ড কামনটাকে—কালো লোহার সেই কামানে মশালের কাপা-কাপ শিখা পড়ে কেমন যেন ভুতুড়ে হয়ে উঠলো।

জানে কি এই উম্মাদিনী কামান কেমন করে ছেড়ে—যা এখন প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো পড়ে আছে এখানে, যার মুখে পড়ে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একজন দুর্ভাগা মানুষ–সকালের আলো ফুটলেই যার কালো নলটা আগুন আর বারুদ উগরে দেবে, সেই কামান কাকে বলে তা কি সে জানে?

না বোধহয়। বহ্নিশিখা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে–নেহাৎই যেন দৈবচালিত; ঠিক এইখানেই না-দাঁড়িয়ে থেকে সে বিন্ধ্যপর্বতের যে-কোনোখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো এখন। হয়তো সে এরপর আবার পাকদণ্ডী বেয়ে ঘুরে-ঘুরে নেমে চলে যাবে–যেদিকে তার দু-চোখ যায়। মানরো তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। দেখলেন সে কামানটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো পাহারাওলার দিকে। যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে, কিন্তু কাছে গিয়েই সে আবার ফিরে দাঁড়ালে-এবার এগিয়ে এলো বন্দীর দিকে—কাছে এসে দাঁড়ালে, নিশ্চল ও নির্বাক। মানরোর বুকের ভিতরটা এমন ভাবে লাফাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি কোনো বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

আরো-কাছে চলে এলো বহ্নিশিখা-মশাল নামিয়ে তাকিয়ে দেখলো বন্দীর মুখ। তার নিজের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা, কেবল চোখ দুটো জ্বলছে তীব্রভাবে, জ্বরাতুর ও ঘোলাটে। মানরো মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলেন।

হঠাৎ হাওয়া এলো দমকা। সরে গেলো বহ্নিশিখার মুখের গুণ্ঠন, দপ করে উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠলো মশাল, ক্ষণিকের জন্যে।

চাপা, অস্ফুট একটা কাতর ডাক বেরিয়ে এলো বন্দীর মুখ দিয়ে : লরা!

মানরোর মনে হলো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি নিজেই বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। মুহূর্তের জন্যে চোখ বুঝলেন তিনি, তারপর আবার চোখ খুলে তাকালেন সেই উন্মাদিনীর দিকে। লরা! লেডি মানরো! তাঁর স্ত্রী–এখানে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে! লরা!–তুমি! সত্যি তুমি?

লেডি মানরো কোনো কথাই বললেন না। মানরোকে তিনি চিনতেই পারেননি। এমনও মনে হলো না যে তার কোনো কথা কানে গেছে।

লরা! তুমি পাগল হয়ে গেছো? পাগল?-কিন্তু বেঁচে তো আছো।

চিনতে মোটেই ভুল হয়নি সার এডওয়ার্ডের। সত্যি, লেডি মানরোই। লরাকে চিনতে তার কোনোদিনই ভুল হবে না।

কানপুরের সেই বীভৎস রক্তারক্তি দেখে লরার সংবেদনশীল স্পর্শাতুর মন এমনএকটা বিষম ধাক্কা খায় যে কেবল স্মৃতিই যে হারিয়ে যায় তা নয়, মাথায় চোট লেগে কেমন-একটা অপার্থিব ঘোরের মধ্যে যেন পড়ে যান তিনি। তারপর থেকেই লোকে দেখতে পাচ্ছে এই উম্মাদিনীকে, তারা যার নাম দিয়েছে বহ্নিশিখা, যে চুপচাপ উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন গন্তব্যহারা ঘুরে বেড়ায় বিন্ধ্যপর্বতের কোলে, নর্মদার তীরে, লোকালয়ের বাইরে কি ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামগুলোয়।

মানরো আবার তাকে নাম ধরে ডাকলেন, লরা! আর যখন দেখলেন লেডি মানরোর চোখ তেমনি ভাবভাষাহীন শিখার মতো জ্বলছে অন্ধকারে, কী-রকম একটা প্রচণ্ড কষ্টে ভরে গেলেন, দুমড়ে গেলেন। নানাসাহেব কিছুতেই কল্পনাও করতে পারবেন না কোন প্রচণ্ড কষ্টে এখন তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

যদি জাগে তো জাগুক এই পাহারাওলা। যদি শোনে তো শুনুক সমস্ত কেল্লা। লরা! লরা! গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে মানরো ডাকলেন।

লরা তখন তেমনি জ্বরাতুর অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন মানোর দিকে। একবার মাথা নাড়লেন তিনি ডাক শুনে যেন উত্তর দিতে চান না, এমনি ভঙ্গি। আবার গুণ্ঠনে ঢেকে গিয়েছে তার মুখ, মশালও আবার কেঁপে কেঁপে ক্ষীণ শিখায় জ্বলছে। লরা দু-এক পা পেছিয়েও গেলেন। চলে যাচ্ছেন?

লরা! কাতরভাবে ডেকে উঠলেন মানরো, যেন এই কাতর কণ্ঠস্বরে তিনি বিদায়ের সমস্ত বেদনাকে ভরে দিতে চাচ্ছেন।

হঠাৎ কামানটার দিকে চোখ পড়লো লরার। কেমন যেন টান দিলো তাকে এই প্রকাণ্ড জিনিশটা। হয়তো মনে পড়ে গেলো কানপুরের সেই আগুন-ওগরানো কামানগুলো, হয়তো তার কানে গর্জন করে উঠেছে সেই আগুনজ্বলা অতীত। মশালের আলো পড়লো সেই বিকট ইস্পাতের খোলে। এখন যদি একটুকরো আগুনের ফুলকি পড়ে কামানের গায়ে তাহলেই প্রচণ্ড নিনাদের সঙ্গে-সঙ্গে মানরোর ছিন্ন দেহ উড়ে যাবে তিন শূন্যে। তাহলে জগতে যিনি মানবোর সবচেয়ে প্রিয়, তাঁরই হাতে তার মৃত্যু লেখা? এর চেয়ে নানাসাহেব এসে কেন তাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তিনি কি তাহলে চীৎকার করে কেল্লার সেই জল্লাদগুলোকে এই বধ্যভূমিতে আহ্বান করবেন?

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন মানরোর হাত চেপে ধরলো। না, স্বপ্ন নয়, সত্যি। কার যেন বন্ধু-হাত দড়ি কেটে দিচ্ছে। কোন দেবতার দয়ায় কে-একজন এখানে এসে পড়েছে তাকে মুক্তি দিতে।

দড়িগুলো পড়ে গেলো। শিরার মধ্যে রক্ত যেন ফেনিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলেন মানরো—আরেকটু হলেই মুক্তির আনন্দে তিনি চেঁচিয়ে উঠতেন।

পাশে তাকিয়ে দেখলেন গৌমি দাঁড়িয়ে আছে ছুরি হাতে। ছায়ার মতো।

কালোেগনি যখন অন্ধকারে তার দলবলের সঙ্গে মিশে যায়, তখনই সে পুরো ব্যাপারটা চট করে বুঝে নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিলো। আড়ি পেতে শুনেছিলো যে মানরোকে ধরে তারা রায়পুরের কেল্লায় নিয়ে আসবে—যেখানে নানাসাহেব নিজের মুখে উচ্চারণ করবেন তার মৃত্যুদণ্ড, স্বাক্ষর করবেন তার মৃত্যুর পরোয়ানায়। কোনো দ্বিধা না-

করে তক্ষুনি গৌমি রায়পুরের কেল্লার কাছে এসে লুকিয়ে থাকে। তারপর নিঝুম রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে বেরিয়ে এসেছে লুকোনো জায়গা ছেড়ে, প্রভুকে মুক্তি দিতে।

ফিশফিশ করে গৌমি বললে, সকাল হয়ে আসছে, আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে–আর একটুও সময় নেই।

আর লেডি মানরো? কামানের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই অদ্ভুত গুণ্ঠনবতী মূর্তিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিগেস করলেন মানরো।

উনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন! গৌমি কোনো ব্যাখ্যা চাইলো না।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলে, গৌমি আর কর্নেল যেই লরার দিকে এগিয়ে গেলেন লরা পালাতে চাইলেন তাদের হাত এড়িয়ে। তাঁর হাত থেকে মশালটা পড়ে গেলো কামানে। পরক্ষণেই বিন্ধ্যপর্বতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত থরোথরো কাঁপিয়ে দিয়ে গর্জন করে উঠলো কামান!

বেহেমথ

সেই প্রচণ্ড শব্দে লেডি মানরো মূর্ছিত হয়ে তাঁর স্বামীর গায়ে ঢলে পড়লেন। মুহূর্তমাত্র দেরি না-করে মানরো স্ত্রীর অচেতন দেহ বহন করে ছুটে গেলেন চত্বর পেরিয়ে। হঠাৎ জেগে-ওঠা পাহারাওলাকে কিছু টের পাবার অবসর না-দিয়েই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে গৌমি, তারপরে প্রভুর পিছন-পিছন ছুটে চলে গেলো।

কেল্লার পাশের পাকদণ্ডী দিয়ে তারা সবে নেমে পড়েছেন, এমন সময় কেল্লা থেকেপিল-পিল করে ছুটে এলো হঠাৎ জেগে-ওঠা ভ্যাবাচাকা মানুষগুলি। কী হয়েছে, তারা কিছুই বুঝতে পারছিলো না—আর এই ফাঁকে মানরোরা আরো-খানিকটা ছুটে গেলেন পাকদণ্ডী বেয়ে।

নানাসাহেব ক্বচিৎ এই কেল্লায় রাত কাটাতেন। মানরোকে কামানের মুখে বেঁধে তিনি গিয়েছিলেন একটা ছোটো সভায়—যেখানে এদিককার আরো কয়েকজন বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে তার গোপন শলা-পরামর্শ হবে। দিনের বেলায় বেরুবার উপায় নেই বলে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরোন তিনি–ফিরে আসেন শেষ রাতে। এটাই তাঁর ফিরে-আসার সময়।

কালোগনি, নাসিম ও তাদের অনুচরেরা—শতাধিক মানুষের একটা বাহিনী-নিশ্চয়ই এক্ষুনি পলাতকদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। ব্যাপারটা বুঝতে কেবল যে-সময়টুকু

লাগবে–তবে পাহারাওলার ছুরিকাবিদ্ধ মৃতদেহ দেখে নিশ্চয়ই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে তাদের একটুও দেরি হবে না।

দেরি হলোও না। কালোগনির রোষ মুহূর্তের মধ্যে তীব্র দাঁতচাপা শপথের আকারে বেরিয়ে এলো। নানাসাহেব ফিরে এলে কী জবাবদিহি দেবে সে? এক্ষুনি তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে বন্দীর খোঁজে।

কোথায় আর যাবে তারা? বন্দী আর তার সঙ্গীরা? এই পাহাড়ি জায়গায় সব তাদের চেনা। লোকালয়ে পৌঁছুবার আগেই তারা ধরে ফেলবে পলাতকদের।

পাকদণ্ডী বেয়ে-বেয়ে মানরোরা তখন ছুটে নেমে যাচ্ছেন। পাহাড়ের কোলে ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়ছে তখন। হঠাৎ উপর থেকে মস্ত কোলাহল ভেসে এলো। কালোগনি দেখতে পেয়েছে তাদের। মানরো! ওই তো মানরো! চীৎকার করে সে বলছে সবাইকে।

পরক্ষণেই এক লাফে কালোগনি নেমে এলো পাকদণ্ডী বেয়ে—পিছনে ছুটে এলো তার অনুচরেরা, প্রচণ্ড কোলাহল করে।

কোথাও লুকোবার উপায় নেই। কেবল সামনে ছুটে যেতে হবে। মানরো মনেমনে সব স্থির করে ফেলেছেন। নানাসাহেবকে আর তিনি জ্যান্ত ধরা দেবেন না বরং গৌমির ছুরিটা আমূল বসিয়ে দেবেন নিজের বুকে, তবু না।

গৌমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আর-একটু ...পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা জব্বলপুরের রাস্তায় এসে পড়বে।

কিন্তু গৌমির মুখের কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেলো সামনে থেকে দুটি লোক দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। ততক্ষণে আলো ফুটেছে, মুখ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। আর সেইজন্যেই পরস্পরকে চিনতে কারু একফোঁটা দেরি হলো না। দু জনেরই ঘৃণা ও রোষ যেন দুটি নাম হয়ে ফেটে পড়লো সেই পাহাড়ি রাস্তায়।

মানরো!

নানাসাহেব?

কামানের আওয়াজ শুনে নানাসাহেব খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছিলেন। কেনযে তার ফিরে-আসার আগেই তার আদেশ অমান্য করে কামান গর্জে উঠলো, এটা তার দুর্বোধ্য ঠেকেছিলো। তার সঙ্গে মাত্র একটিই অনুচর। কিন্তু সেই অনুচরটি কোনো সময় পাবার আগেই আর্তনাদ করে গৌমির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো। গৌমির ছুরিটা অকস্মাৎ প্রচণ্ড রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছে।

নানাসাহেব অন্যদের ডাক দিলেন, শিগগির এসো এখানে?

হ্যাঁ, এখানে, বলেই গৌমি লাফিয়ে পড়লো নানাসাহেবের উপর। উদ্দেশ্য নানাসাহেবকে ব্যস্ত রাখা—যাতে মানরো এই ফাঁকে পালিয়ে যেতে পারেন।

নানাসাহেব এক ঝটকায় নিজেকে গৌমির হাত থেকে মুক্ত করে নিলেন। কিন্তু গৌমি পরক্ষণে কঠোর হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো, তারপর অবলীলাক্রমে তাকে বহন করে

এগিয়ে গেলো খাতের দিকে। তাকে নিয়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে নিচে-তবু কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে দেবে না।

কালোগনিরা ততক্ষণে একেবারে কাছে এসে পড়েছে। কাঁধে একটি মূর্ছিত দেহ নিয়ে অবসন্ন রাতজাগা ক্লান্ত বিধ্বস্ত মানরো কোথায় পালাবেন?

হঠাৎ প্রায় কুড়ি গজ দূর থেকে ডাক শোনা গেলো : মানরো! মানরো!

ওই-যে রায়পুরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ব্যাঙ্কস, ক্যাপ্টেন হুড, মোক্লের, সার্জেন্ট ম্যাক-নীল, ফক্স আর পারাজার-মানরো দেখলেন। পিছনেই বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ওগরাচ্ছে বেহেমথ—হাওদায় বসে আছে স্টর আর কালু।

স্টীম হাউসের শেষ বগিটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ব্যাঙ্কসরা হাওদায় চেপেই লেক পুটুরিয়া থেকে জব্বলপুরের দিকে রওনা হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ এখান দিয়ে যাবার সময় কামানের বিকট আওয়াজ শুনে তারা থেমে পড়েছে। কী-একটা অলুক্ষুণে ভয়ে পরমুহূর্তে তারা লাফিয়ে নেমেছে এখানে—হুড়মুড় করে এগিয়েছে পাহাড়ি রাস্তায়। তারা যে কী দেখবে বলে প্রত্যাশা করেছিলো, তা-ই তারা স্পষ্ট জানে না। অনেক সময় মানুষের ভিতর থেকে কে যেন নির্দেশ দিয়ে মানুষকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেয়–যার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয় না। তারপর মোড় ঘুরেই তারা সামনে দেখতে পেয়েছে মানরোকে!

লেডি মানরোকে বাঁচাও।

লেডি মানরো!

আর সত্যিকার নানাসাহেবকেও ছেড়ে দেবে না! একেবারে শেষ সঞ্চিত শক্তিটুকু দিয়ে গৌমি এই প্রকাণ্ড মানুষটিকে এখানে বহন করে এনেছে।

তক্ষুনি হুড আর ম্যাক-নীল নানাসাহেবকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললে। কোনো কথা বলার তখন অবসর নেই—সবাই চটপট গিয়ে উঠে পড়লো বেহেমথে। ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে বললে, পুরোদমে চালিয়ে দাও, স্টর! পুরোদমে!

কালোগনিরা ততক্ষণে প্রায় একশো গজ দূরে। তারা এসে পড়ার আগেই যদি জব্বলপুরের সামরিক শিবিরে পৌঁছুনো যায়, আর ভয় নেই। শিবিরটা কাছেই—ঠিক জব্বলপুরে ঢোকার মুখে।

কিন্তু রাস্তা এখানে উবড়োখবড়ো, পর-পর অনেকগুলো তীক্ষ্ণ বাঁক রয়েছে–পুরোদমে বেহেমথকে চালিয়ে নেবারও কোনো উপায় নেই।

কালোগনিরা আরো-কাছে এসে পড়ছে।

গুলি চালাতেই হবে। হুড বন্দুক তুলে ধরলো!

কিন্তু আর মাত্র যে ডজন খানেক টোটা আছে, ফক্স বললে, এলোমেলো গুলি চালালে চলবে না কিছুতেই!

ম্যাক-নীল বসে আছে বন্দী নানাসাহেবকে চেপে ধরে, কালু আর পারাজার কেবল জ্বালানি দিচ্ছে চুল্লিতে, ব্যাঙ্কস, আর স্টর বেহেমথকে চালিয়ে নিতে ব্যস্ত, মানরো বসে আছেন লরার মূর্ছিত দেহ কোলে করে। হুড আর ফক্স বিদ্রোহীদের দিকে মুখ করে বসে টোটাভরা বন্দুক তাগ করে ধরলে।

ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কস সামনে খোলা রাস্তা পেয়ে বেহেমথের গতি যতটা পারে বাড়িয়ে দিয়েছে। মাঝখানে দু-দলের ব্যবধান একেবারে কমে গিয়েছিলো-এখন আবার ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ সামনে একটা সরু বাঁক দেখে ব্যাঙ্কসকে যেই আবার গতি কমাতে হলো অমনি ব্যবধান আবার চট করে কমে গেলো।

হুড আর ফক্সের বন্দুক গর্জে উঠলো একসঙ্গে—আর্তনাদ করে পড়ে গেলো দুটি লোক, হুমড়ি খেয়ে। কিন্তু অন্যেরা তবু এগিয়ে আসছে বন্দুক এরা ভয় পায় না–আরো-কোনো তীব্র বারুদে এই ভারতীয়দের বুকভরা। দেশের জন্যে প্রাণ দিতে তারা পেছ-পা হয় না কখনও, বিশেষ করে যেখানে নানাসাহেবের প্রাণ সংশয়, সেখানে তারা নিজেদের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে ছুটে আসছে। ক-জনকে মারতে পারবে এই শ্বেতাঙ্গ বিদেশীরা? শেষটায় এরা নাগাল ধরে ফেলবেই, আর তখন দেখবে শতাধিক বছর ধরে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের নির্বিরোধী মানুষদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাবার ফল কী! তাছাড়া কালোগনি ভালো করেই জানে যে ক্যাপ্টেন হুডের গোলাবারুদ ফুরিয়ে এসেছে। কতক্ষণ এরা যুঝবে?

আরো কয়েক বার হুড আর ফক্সের বন্দুক গর্জে উঠলো, উত্তরে তাদেরও বন্দুক গর্জালো বেহেমথকে লক্ষ্য করে। আরো কয়েকজন ভারতীয় ছিটকে পড়লো রক্তাপ্লুত দেহে, কিন্তু মরতে-মরতেও তারা রুষ্ট স্বরে ঘৃণাভরে বলে গেলো : বিদেশীরা নিপাত যাক!

আর মাত্র দুটি গুলি রয়েছে ইউ আর ফক্সের। একেবারে শেষ মুহূর্তে খরচ করবে তারা।

ব্যবধান এখন একেবারেই কমে এসেছে।

এতক্ষণ কালোগনি সাবধানে আসছিলো—এবার সে লাফিয়ে এগিয়ে এলো, বন্দুক হাতে, চীৎকার করে।

ওঃ! তুমি? হুড বলে উঠলো, শেষ গুলিটা তাহলে তুমিই নাও। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তাগ করে ঘোড়া টিপলো হুড।

কালোগনির কপালের ঠিক মাঝখানটায় গুলি লাগলো। আকাশ হাড়ালো তার হাতটা একবার, বাতাস আঁকড়ে ধরতে চাইলো যেন, একবার লাফিয়ে এগিয়ে এলো তিন পা, তারপরেই সে একটা প্রকাণ্ড পাক খেয়ে ঘুরে পড়ে গেলো!

কিন্তু বেহেমথ ততক্ষণে একটা খাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে! তার মুখ ফেরাবার কোনো উপায় নেই–পিছনে ভারতীয়রা একেবারে কাছে এসে পড়েছে!

লাফিয়ে নেমে পড়ো সবাই, এক্ষুনি! বললে ব্যাঙ্কস।

মানরো স্ত্রীর মুর্ছিত দেহ কাঁধে করে নেমে পড়লেন। অন্যরাও একটুও দেরি করলে না। কাছেই সেনানিবাসের ছাউনি দেখা যাচ্ছে।

নানাসাহেবের কী হবে? মানরো ছুটতে-ছুটতে জিগেস করলেন।

তার ভার আমি নিয়েছি। ব্যাঙ্কস বললে। হাওদায় নানাসাহেবের দড়ি বাঁধা শরীর পড়ে আছে। এখানেই পড়ে থাক, বলে ব্যাঙ্কসও লাফিয়ে নেমে পড়লো।

বেহেমথ থামলো না। এঞ্জিন চলছে তার, শুঁড় দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, পুরোদমে সে ছুটে চললো সামনে-খাদের দিকে।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেলো।

ছুটতে ছুটতে পিছন ফিরে তাকিয়ে মানরো দেখতে পেলেন বেহেমথের বয়লারটা ফেটে গেলো—নামবার আগে ব্যাঙ্কস পুরোদমে চালিয়ে এসেছিলো বেহেমথকে।

বয়লার ফেটে যেতেই বেহেমথ কী-রকম ঘুরে গেলো একপাক, শুঁড়টা শূন্যে তোলা, ইস্পাতের পাতগুলো ফেটে উড়ে গিয়েছে চারধারে-কেবল হাওদাটা নানাসাহেবকে নিয়ে ছিটকে উড়ে গেলো খাদের দিকে।

বেচারি বেহেমথ! হুড ছুটতে ছুটতে বললে, আমাদের বাঁচাতে গিয়ে মরলি তুই!

সেনানিবাসের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে ব্যাঙ্কস বললে, কে বললে বেহেমথ বেচারি! সে নানাসাহেবকে বধ করে তবে মরেছে!

ক্যাপ্টেন হুডের পঞ্চাশ নম্বর বাঘ

কর্নেল মানরো ও তার দলের আর-কোনো ভয় নেই কিংবদন্তির সেই আগুনজ্বালা মানুষটির কাছ থেকে। সেই মরাঠা বীরের ছিন্ন দেহ নিয়ে বেহেমথ বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছে। ফিরে এসে তিনি আর-কোনোদিন বলবেন না, জব্বলপুরের রাস্তায় যে প্রাণ দিয়েছে সে আমার ভাই বালাজি রাও। কিন্তু তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো আমি, মানরো–ভুলে যেয়ো না!

বিস্ফোরণের শব্দে গোরা সেপাইরা ছাউনি থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো। আর তাদের দেখেই নেতৃত্বহীন ও বিপন্ন ভারতীয় দলটা পালিয়ে গেলো।

পরিচয় দিতেই কর্নেল মানরোদের জব্বলপুরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে খাদ্য, বিশ্রাম ও নিশ্চিন্তি পেলেন তিনি এতদিন পরে।

লরাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা মস্ত হোটেলে। সেখানে মানরোর শুশ্রূষা ও যত্নে সেই পাণ্ডুর চোখে স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরে এলো, আস্তে-আস্তে ফিরে এলো স্মৃতি ও স্বাস্থ্য। আর কিঞ্চিৎ সুস্থ হতেই সবাই ট্রেনে করে বই রওনা হয়ে পড়লেন।

কিন্তু ট্রেনে বসে বারেবারে তাদের মনে পড়তে লাগলো বেহেমথকে—সেই অতিকায়। বাষ্পচালিত শকট, যে কিনা তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো।

বেহেমথের ধ্বংসাবশেষ তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিন্তু নানাসাহেবের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। হয়তো তার অনুচররা তার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গিয়েছে অন্ত্যেষ্টির জন্যে। আর মৃতদেহ পাওয়া গেলো না বলেই মধ্যভারতে রচিত হলো মৃত্যুহীন এক অত্যুজ্জ্বল কিংবদন্তি—যার সারমর্ম হলো নানাসাহেব এখনও মরেননি, এখনও তিনি বেঁচে আছেন, আর তার অশান্ত ও আগুনজ্বালা পৌরুষ এখনও আবার বিদ্রোহের উদ্যোগে লিপ্ত হয়ে আছে। নানাসাহেবের যে মৃত্যু হতে পারে—এটা মধ্যভারত কিছুতেই বিশ্বাস করলে না।

নভেম্বর মাসের শেষ দিকে মানরোরা বম্বাই থেকে কলকাতা ফিরে এলেন। লরা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, তবু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছেন। মানরোর অনুরোধে ব্যাঙ্কস, মানরোর বাংলোতেই ছুটিটা কাটিয়ে যাবেন স্থির করেছেন। ম্যাক-নীল আর গৌমিও এখানেই কাজ করে। মঁসিয় মোক্রেরকে অবিশ্যি ইওরোপ ফিরে যেতে হবে শিগগিরই। আর মোক্লের যেদিন মানরোদের বাংলোয় বিদায় নিতে গেলো, সেদিন হুড আর ফক্সও সেখানে এসেছিলো—বিদায় নিতেই; তাদেরও ছুটি ফুরিয়ে এসেছে-তারা মাদ্রাজে ফিরে যাবে।

অনেক দিন পরে কলকাতার সেই বাংলায় চায়ের আসর জমে উঠলো।

তাহলে, হুড, মানরো বললেন, আমাদের সঙ্গে উত্তর ভারত বেড়াতে তোমার খারাপ লাগেনি তেমন? শুনে ভালো লাগলো। তবে একটা দুঃখ থেকে গেলো আমার : তোমার আর পঞ্চাশ নম্বর বাঘটা মারা হলো না!

কে বললে, মারিনি! হুড প্রতিবাদ করলে, পঞ্চাশ নম্বর বাঘটা ছিলো সবচেয়ে ভীষণ ও মারাত্মক। কেন? আপনাদের চোখের সামনেই তো তাকে গুলি করলাম।

আমাদের চোখের সামনে? কই দেখতে পাইনি তো? কখন? কোনখানে?

কেন—জব্বলপুরের রাস্তায়। হড হিশেব দাখিল করলে, উনপঞ্চশটা বাঘ, আর ...আর কালোগনি? কী—পঞ্চাশ হলো না? কালোগনিকে আপনি ভারতবর্ষের রাজাবাঘ ছাড়া আর কীই-বা বলতে পারেন?